

লাভের জন্য। কিন্তু বিজিত লোকগণ অত 'অলামেজাজের' হইলে তাহাদিগকে শাসন করিয়া কিছু লাভ থাকে না। মোটা মোটা বেতন, সস্তা চাকর বাকর, সস্তা আহারাদি, অসীম প্রভুত্ব, অসীম খোসামোদ-লাভ, বিশ্বহিংসকাৰিতাব বশ, এ সমস্তই দুর্লভ হয়। এই নিমিত্ত অতুল্য সভাতা ও পবাদীনতা এই দুই বিষয় একাধাবে বর্তমান বলিয়া জ্ঞান করিতে আমরা অপারগ। যাহা হউক, একথা কেবল প্রাসঙ্গিক মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই।

প্রকৃত প্রস্তাব হইতেছে এই যে, মানুষ যখন সভ্যতাব কোন বীজ বপন করে নাই, তখন তাহাব শবীরেব গঠন যে প্রকাবের ছিল, অনেক দূর সভাতা পাইবার পূর্বে তাহা এখনও আছে, কি অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে আমরা 'সভা' এই নাম উচ্চারণ কালে ইংরাজ ফরাশী প্রভৃতি দিগকে ধ্যান করিব আর পাটগনিষাব লোক বা হটেনটটদিগকে অপর দিকে ধ্যান করিব। অথবা আমরা স্বচক্ষে যাহা দিগকে দেখিয়াছি, অর্থাৎ আন্দামানী লোক দিগকে ধ্যান করিলেও ক্ষতি নাই।

যদি এই দুই জাতি লোকের ধ্যান এক লক্ষে করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহারা আপনাদিগকে দার্শনিক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহারা সৌন্দর্যের কিছু টিকানা নাই এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা কহেন যে চীনেরা খাদ্য

নাক ও ক্ষুদ্র চক্ষু সুন্দর জ্ঞান করে, আমরা তদ্বিপরীতকে। সুতরাং আমরা যদি বলি যে অসভ্য অবস্থা অপেক্ষা সভ্যতাব অবস্থায় মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যের বৃদ্ধি হয়, তাহা দার্শনিক অভিমানীরা ফুয়ে উড়াইয়া দিবে। তাহারা কহিবেন, সৌন্দর্য কেবল মনের ধর্ম মাত্র, সুন্দর পদার্থ-গত কোন ধর্ম নহে। একই বস্তু বা ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষে সুন্দর বা সুশ্রী বলিয়া প্রত্যয়মান হইয়া থাকে ইত্যাদি। কিন্তু তত্বতঃ বলি যাহা যে কাল রঙ অপেক্ষা ফর্সা রঙের কি অপেক্ষাকৃত রমণীয়তা নাই, শবীরেব চর্মে ক্রমাগত দাগ কড়া আঁচ ও মশা কামড় ইত্যাদি থাকিলে সেই চর্ম দেখিতে সুন্দর হয় কি চর্ম মসৃণ ও চোস্ত ও পরিষ্কার হইলে তাহা হয়? কিন্তু যখন বস্ত্রের মধ্যে দিগন্ত, অথবা সেলাই কবা তরু পল্লব এই প্রকার পোষাকের বন্দোবস্ত, সেই অবস্থায় কি মসৃণ ও পরিষ্কার দেহচর্ম হওয়া সম্ভব? আর এক কথা বলি, যদি উদরটি বিলক্ষণ লম্বমান হয়, তাহা হইলে দেখায ভাল, না ক্ষণকটাক্ষেই সুন্দর উদর দেখিতে সুশ্রী? কিন্তু অসভ্য অবস্থায় খাদ্য দ্রব্য দুর্লভ, শামুক গোড়ি বা বনকল যেদিন জুটিল সে দিন পেট ভরিয়া থাইতে হয়, আবার কবে জুটিবে স্থির নাই, এই নিমিত্ত উদরে এককালে এত বোকাই লইতে হয়, যে উদর সহজেই ফীতাকৃতি ও লম্বমান হইয়া উঠে। অসভ্য মাজেরি এই লক্ষণ, অসভ্য মাজেরি এরূপ ক্ষমতা আছে যে, সে সুদীর্ঘ উপবাস সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ এককালে লক্ষ্য

অতিরিক্ত পরিমাণের আহাৰ দেহ-মধ্যগত করিতে পারে। এই নিমিত্ত বলিতে হইবেক যে লব্ধদরতা যদি কদাকাব হয়, আর উদরের কৃশতা যদি অঙ্গদোষ্টব বলিয়া গণ্য হয়, তবে অসভ্য অপেক্ষা সভ্যের অঙ্গদোষ্টব এ অংশে প্রকৃষ্ট। আরও এক অংশে প্রকৃষ্ট, সর্কাস্ম স্মৃগঠন মূর্তি উপার্জন করিতে হইলে রীতিমত ও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যায়াম অভ্যাস করা চাই। অসভ্যকে সময়ে সময়ে আহারের অনুসন্ধানে ঘোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে করিয়া উহার শরীরের কোন কোন মাংসপেশী বিপুল পরিমাণে ব্যায়াম প্রাপ্ত হইয়া অসম্ভব বৃদ্ধি ও প্রকর্ষলাভ করে বটে, তাহার পায়ের ডিম হয়ত অত্যন্ত মোটা হইয়া উঠে, পায়ের তলা হয়ত বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু কালিদাস যাঁহাকে বলেন চতুরঙ্গ শোভি, অর্থাৎ চৌরঙ্গ, চৌস্ত, যেখানে যে রকমটী চাই সেই রকম, এ প্রকার গঠন সৌষ্ঠব উপার্জন করা অসভ্যের সাধ্যাত্ত নহে। ইহার পক্ষে সে বিষয়ের বিঘ্ন বিস্তর আছে। অসভ্য প্রচুর ও উৎকৃষ্ট আহাৰ প্রাপ্ত হয়, উহার এমন পরিচ্ছদ নাই যে আবশ্যকমত শরীরকে আচ্ছাদন করিতে পারে; শীত, গ্রীষ্ম, বাস্তাপ সমস্ত উহাকে একভাবে সহ্য করিতে হয়, শরীরের এক স্থানে একবার চোট লাগিলে চিরকালের জন্য সেই স্থানে কড়া পড়িয়া যায়, শয়ন-স্থান বা বাসস্থানের সুখস্বচ্ছন্দ যাহাকে বলে, তাহার কিছুই অসভ্যের পক্ষে ঐকান্তিক অপ্রাপ্য। এ অবস্থার কখন শরী-

রের চর্চা হইতে পারে! জাম্বি কালি লোকে মনের চর্চা, মানসিক শক্তিরই অনুশীলনে উন্নতি সাধন এই বিষয়টী বুঝে। কিন্তু শরীরের যে একটা চর্চা ও উন্নতি সাধন আছে, সে বিষয়ে এক্ষণে লোকের মনোযোগ বড় কম হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্যই আক্ষেপের বিষয়। মনের উন্নতি সাধনের ফল চিরস্থায়ী, অর্থাৎ তদ্বারা নূতন নূতন আবিষ্কৃত্য করিয়া আর প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ পূর্বক প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে অধিকতর রূপে আমাদিগের স্বকার্যসাধনোপযোগী করিতে পারি, ইহা সভ্য বটে। কিন্তু শরীরের উন্নতি সাধনের ফলও কি সেইরূপ চিরস্থায়ী নহে? তাহাও কি সম্ভাবন-পরম্পরাক্রমে স্থায়ী হইয়া যায় না? আমরা ছিলাম বনমানুষ, হয়ত লাকুল ধারী, আমাদিগের হস্ত পদ দুইই এক প্রকারের ছিল, অর্থাৎ হাত দিয়া এক্ষণে যেমন ধারণকর্ম সাধন করিয়া থাকি, শাখামুগ অবস্থায় পা দিয়া সেই কার্য করিতাম। আর ঠিক হইয়া বা স্থিরভাবে বা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম না, দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে ডাহিনে বামে হেলিতে হুলিতে হইত। সেই অবস্থা হইতে আমাদিগের কত উন্নতি ও সূত্রীকতা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখ। আমাদিগের সর্কাস্মের লোম প্রায় তিরোহিত হইয়াছে, আমাদিগের দুই পা শরীরের ভার ধারণ করিতে এতদূর সক্ষম হইয়াছে যে আমরা সচ্ছন্দে খাড়া হইয়া দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারি, আমাদিগের অনেক স্থানের মাংসপেশী স্কন্ধর স্কণ্ডল স্মৃগঠন প্রাপ্ত

হইয়াছে, বক্ষস্থল চেটাল হইয়াছে, মস্তিষ্ক অনেকটা সম্মুখদিকে ঠেলিয়া আনিয়াছে, হুই চক্ষু দীর্ঘ ও স্বস্ত্রী হইয়াছে, ললাট প্রশস্ত ও নাসিকা সুগঠন হইয়াছে। এই সমস্ত পরিবর্ত কি একেবারে হইয়াছে, কখনই নহে। প্রকৃতির নিয়মই নয় যে একরূপ বিপুল পরিবর্ত সমস্ত এককালে সমাধা করিবেন। আর শাখামূগ যে আমরা এক কালে ছিলাম, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনতম পূর্বপুরুষেরা ছিলেন, তাহা দ্বারা 'কিন্তু' হওয়া সেইরূপই অসংগত, যেরূপ পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা অস্বীকার করা অসংগত হয়। কিন্তু সেই শাখামূগ একটা আর পাশ্চাত্য ইথ্যোপোপের একটা কোট পেটেলুন আদি-ধারী সভ্য পুরুষ একটা পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিয়া দেখ দেখি এত প্রকাণ্ড অন্তর পরিবর্ত কি একলক্ষে হওয়া সম্ভব?—যদি তাহা না হয়, তবে কি ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে যখন 'মানুষ' বলিয়া একটা জাতি সাধারণ শাখামূগের দল হইতে পৃথক হইয়া গেল, তখন সেই মানুষ, আর এক্ষণকার 'মানুষ' এ দুয়ের আকারগত বিস্তার বৈদ্যদৃশ্য থাকা কি নিতান্তই সম্ভব নহে? ইহাতেই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে সভ্য অবস্থা অপেক্ষা সভ্য অবস্থাতে শারীরিক গঠনের বিষয়ে অনেক অন্যথা হইয়াছে? বিজ্ঞানের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমরা কেবল ন্যায়প্রয়োগ (deductive reasoning) দ্বারাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে নিতান্ত প্রাচীনতম সভ্যতা অবস্থা হইতে আমরা বিস্তাররূপে

অবয়বগত পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কেবল ন্যায় প্রয়োগের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এক্ষণে বিস্তার সভ্যতা জাতি বিদ্যমান আছে, যাহাদিগের সহিত সভ্য জাতির তুলনা দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তই সাবাস্ত হইয়া উঠে। ফলতঃ সভ্যতা কোন জাতির এককালে উদয় হয় নাই, ইহা ধাপে ধাপে গঠন হইয়াছে এবং সেই সমস্ত রূপ কোন কোন পণ্ডিত এইরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। প্রথম একটা রূপ মনে কর আশুন আলিবার ক্ষমতা। আমরা এক্ষণে ইথ্যোপোপীয়দিগের কল্যাণে জ্বলন্ত পাঁচলাখ অগ্নি শলাকা জামার হেবে লইয়া বিচরণ করিতে পারি। কিন্তু এক সময়ে ধরাতলের একরূপ অবস্থা ছিল যে 'একটু আশুন দাও ত গা' এ কথা সম্বোধন করা যায় এমন কেহ ছিল না। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ দ্বারা আশুন বাহির হয় এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই। যতই শীত পড়ুক, লকলই বর্দাস্ত করিয়া লইতে হইত এবং প্রত্যহ শীতকালে শত করা আশী নব্বই লোক মারা পড়িত। এই নিমিত্ত যখন অগ্নি প্রস্তুত করিবার সন্ধান বাহির হইল, তখন একটা মহীয়সী আবিষ্কৃত্য করা হইল বলিতে হইবেক। আমাদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ বনমানুষগণ এ ক্ষমতা উপার্জন করেন নাই। যখন খাড়া হইয়া বেড়াইবার ক্ষমতা কতকটা বৃদ্ধি হইয়াছিল যখন হুই হাত চলনক্রিয়ার সহকারিতা কার্য্য হইতে কতকটা অবসর পাইয়াছিল, তখন বোধ হয়

উহার মধ্যে একটু বেশী চালাক অসভ্য শীতকালে কোন দাবানলের নিকটে কিরূপ আরাম পাওয়া যায় তাহা অনুভব করিতে করিতে হঠাৎ এক দিন দুই ডালের ঘর্ষণে ক্ষুলিত বাহির হইতে দেখিয়া থাকিবে। সে অবশ্যই কিছু বেশী একটু চালাক ছিল, নচেৎ তাহার ঠাহর থাকিত না। এই আবিষ্কৃত্য বোধ হয় মানুষের সভ্যতা আরোহণের প্রথম ধাপ। ইহার গুরুতরতা বাক্যে ব্যক্ত করা অসাধ্য। কলের গাড়ীই বল, কলের জাহাজই বল, ভারের খবরই বল, এই অগ্নি আবিষ্কৃত্যের নিকটে কিছুই লাগে না। এই নিমিত্ত ভুবনমাননীয় কম্টি মহাত্মা মনুস্যসমাজের সর্বসাধারণের জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অগ্নি-আবিষ্কৃত্য-সংক্রান্ত এই একটি উৎসব সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমরাদিগের পূর্বপুরুষদিগের প্রাচীনতম কবিতাতে অর্থাৎ ঋগ্বেদে অগ্নির উপাসনা, ইহার মাহাত্ম্য কীর্তন, ইহার অভূত ক্ষমতা বর্ণন এই সকল রচনার আর ইয়ত্তা নাই। ঋগ্বেদ যখন রচনা হইয়াছিল, তখন যে অগ্নি-আবিষ্কৃত্য অনেক দিন হইয়া গিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ

ঋগ্বেদরচয়িতাদিগকে আমরা এতদূর ঘোর অসভ্যাবস্থাপন্ন জ্ঞান করি না, যেন এইমাত্র তাহারা আগুন জ্বালিতে শিখিয়াছে, যেন ঐ আবিষ্কৃত্যের নবতা তাহাদিগের নিকট তখনও অপনীত হয় নাই, যেন তাহারা নূতন নিধি পাইয়া সেই নিধির গুণগানে কণ্ঠস্বর ছাড়িয়া দিয়াছে। এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসংগত হইবেক। কিন্তু আমরাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অগ্নি-আবিষ্কৃত্যের পরম্পরাগত কিংবদন্তীটী ব্রাহ্মণেরা অতি যত্নে লালন পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা সেই ‘মামুদী’ কাঠে কাঠে ঘর্ষণের আগুনটা ভুলিতে পারেন নাই, যজ্ঞের অগ্নি ঘর্ষণ-জনিতই হওয়া চাই, উহা পুরাতন আগুন হইলে চলিত না। এই বিশ্বাসের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, ঘর্ষণ জন্য তাহারা অগ্নিকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন। আর পবিত্র বলিতে বাহ্য প্রাচীন প্রথাভূগত। ইহাতে বোধ হইতেছে যে অগ্নি-উৎপাদনের আদিম প্রথাটী ব্রাহ্মণেরা কোন মতে হাতছাড়া করিতে রাজী ছিলেন না।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার পরিণাম।

প্রাচীন হিন্দুগণ জরী, দণ্ডনীতি ও যান্ত্রিকভাবে যেকোন উন্নতি লাভ করিয়া-

ছিলেন আত্মকিকীতেও তাহার কোন অংশে হীন ছিলেন না। আত্মকিকী বি-

জ্ঞান শাস্ত্র। কেবল আত্মিকিকী কিসা
বিজ্ঞান বলিলে হয়ত অনেকের বোধগম্য
হইবে না। বিজ্ঞান নানা শাখা প্রশাখায়
বিস্তৃত। বিজ্ঞান বলিলে তর্কশাস্ত্র রসায়ন-
বিদ্যা শিল্পশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি
বুঝায়। এমন এক সময় ছিল যখন হিন্দু-
গণ পৃথিবীস্থ সকল জাতি অপেক্ষা কি
সভ্যতা, কি ঐশ্বর্য্য, কি প্রভাপ, কি জ্ঞান
সকল বিষয়েই উন্নতিশালী ছিলেন। সংসা-
রকে সুখদাম করিবার জন্য যে সকল শিক্ষা
ও উপায়ের প্রয়োজন তাহা তাহারা সম-
স্তই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে
চিকিৎসাশাস্ত্র একটী। সংসারে আগন্তুক
ও অনাগন্তুক ব্যাধি সর্বদাই ঘটিয়া থাকে।
এমন কেহ নাই যে তাহার হস্ত হইতে
পরিভ্রাণ পাইতে পারেন। তাহার দমনের
নিমিত্ত একমাত্র উপায় চিকিৎসাতত্ত্ব
(শাস্ত্র)। হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রের
নাম আয়ুর্বেদ। অনেকের জ্ঞান আছে
সাম খক প্রভৃতির ন্যায় আয়ুর্বেদ বলিয়া
একটী স্বতন্ত্র বেদ আছে। এ জ্ঞানটী ব্রহ-
মূলক। যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য রুগ ব্যক্তির
রোগ শান্তি ও সুস্থ শরীরীর স্বাস্থ্যরক্ষা
এবং যে শাস্ত্রে আয়ুর বিষয় বর্ণিত ও আয়ুর
বর্ধনোপায় প্রদর্শিত আছে তাহাকে আয়ু-
র্বেদ কহে। *

* ইহ খলু আয়ুর্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপ-
শৃষ্ঠানং ব্যাধিপর্য্যমোক্ষঃ স্বস্থ্যসা রক্ষণকঃ।
আয়ুরগ্নিন্ বিদ্যাতে অনেন বা আয়ুর্কিন্দ-
তীত্যায়ুর্বেদঃ। হ্রস্বতঃ স্বত্বস্থান ১ম
অধ্যায়ঃ।

এইটী আয়ুর্বেদের বিশদ ও বিস্তীর্ণ
লক্ষণ নহে। কি রূপ নিয়মে থাকিলে জী-
বন সুখময় হইবে, নিয়ম লঙ্ঘনে কতদূর
ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, জীবনের সুখই
বা কি, দুঃখই বা কি, আয়ুর পরিমাণ কত
এবং আয়ু কাহাকে বলে, এই সমস্ত বিষয়
যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম আয়ু-
র্বেদ। †

পৌরাণিকী বার্তাহুসারে ব্রহ্মা অথর্ব-
বেদের উপাস্তভূত সহস্রাধায়ে বিভক্ত লক্ষ-
শ্লোকী আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করিয়া
তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে সেই আয়ুর্বেদ
অধ্যয়ন করান। প্রজাপতি আবার অ-
শ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন।
ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্বেদ
শিক্ষা করেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে ধৃষ্ণজি
এবং ভরদ্বাজ শিক্ষা লাভ করিয়া প্রথম
শল্যতন্ত্র দ্বিতীয় কার-চিকিৎসা মর্ত্যলোকে
প্রচার করেন। কিন্তু ইহার পূর্বে ব্রহ্মাই
আবার মনুষ্য সকলকে অন্নায়ু ও অন্নমেধ
দেখিয়া সর্বাদ্ধসম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ অধ্যয়নে
এক জনের জীবনে অপারগতা জ্ঞানে
আয়ুর্বেদকে পুনরায় আট অঙ্গে বিভক্ত
করেন। যথা, শল্য, শলোকা, কার-চিকিৎসা,
ভূতবিদ্যা, কৌমার ভূতা, অগদতন্ত্র, রসা-
য়ন-তন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র। বিভক্ত করি-
বার ভাৎপর্ষ্য এই যে এক এক ব্যক্তি এক

† হিতাহিতঃ সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতা-
হিতঃ মানকঃ ভক্ষ্য বজ্রোক্তমায়ুর্বেদঃ স
উচ্যতে। চরক হৃদস্থান প্রথম অধ্যায়ঃ।

এক অঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পারদর্শী হইতে পারিবে।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ইন্ডের নিকট হইতে ধনুস্তরি ও ভরদ্বাজ ঋষি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। ধনুস্তরি দিবোদাস নামে মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হইয়া কাশীর রাজা হইলেন। তিনি বাণপ্রহ্লাদ্রমে অবস্থিত কালে সূক্ষ্মত প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিকুমারকে অন্যান্য অঙ্গের সহিত প্রধানরূপে শল্যতন্ত্র উপদেশ দেন। তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সূক্ষ্মতের গ্রন্থ সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াতে তাহাই আদরণীয় হয়। সূক্ষ্মতের কৃত গ্রন্থের নাম সূক্ষ্মত। এই সূক্ষ্মতে শল্য-ঙ্গের বিষয়ই বাহ্যরূপে বর্ণিত আছে ও অন্যান্য অঙ্গ সংক্ষেপে আছে। আমরা যে সূক্ষ্মত এক্ষণে দেখিতে পাই তাহা আবার নাগার্জুন নামে এক জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং তৎকালের কাশ্মীরধিপতির মন্ত্রী, ইহার প্রতिसংস্কার অর্থাৎ সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টরূপে সংশোধন করেন। নাগার্জুন কোন সময়ের লোক তাহা অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এসিয়াটিক রিসার্চে এক নাগার্জুনের কথা আছে তাঁহার বয়স খৃঃ শকের ১৪১ একশত এক-চল্লিশ বৎসর পূর্বে। যোধ হয় সেই নাগার্জুনই সূক্ষ্মতের প্রতিসংস্কর্তা হইবেন। কারণ এসিয়াটিক রিসার্চে তাহাকে চিকিৎসক বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে।

ভরদ্বাজ ইনি ইন্ডের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া অন্যান্য আয়ুর্বেদ পুনর্কল্প

প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দেন। আয়ুর্বেদ পুনর্কল্প আবার অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণকে উপদেশ দেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রত্যেকে এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে অগ্নিবেশের গ্রন্থই অধিকতর আদরণীয় হয়। এই গ্রন্থে (অগ্নিবেশকৃত) কায়চিকিৎসাই বাহ্যরূপে বর্ণিত আছে। অন্যান্য অঙ্গ অঙ্গ পরিমাণে উল্লেখ আছে মাত্র। কিন্তু সূক্ষ্মতে যেরূপ শল্যঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য তন্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে অগ্নিবেশের গ্রন্থে কায়চিকিৎসা বাতীত অন্যান্য অঙ্গ সেরূপ বাহ্যরূপে বর্ণিত নাই।

অগ্নিবেশের গ্রন্থেই আবার কিছুকাল পরে চরক নামক এক ব্যক্তি প্রতিসংস্কার করেন। চরক কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব। পৌরাণিক বার্তা অনুসারে পৃথিবী এক সময়ে অজ্ঞানচ্ছন্ন হওয়াতে মানব-গণ মানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় হাহাকার করিতেছিল তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে দুর্কিসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান্ বিষ্ণু মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হন এবং চরের ন্যায় গুপ্ত ভাবে নানা স্থানে ভ্রমণ করতঃ অগ্নিবেশের গ্রন্থ উদ্ধার ও তাহার প্রতিসংস্কার করিয়া মানবগণকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন ও পৃথিবীকে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন।

বিষ্ণু রোগশোকাক্ত মানবগণের ক্রেশ্ট শান্তির নিমিত্ত চররূপে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চরক।

সেই চরক দ্বারা প্রতীসংস্কৃত, এই জন্য অগ্নিবেশের গ্রন্থের নাম চরক হইয়াছে।

চরক বিষয় হাতেও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার দিক্‌স্থান আর এক ব্যক্তির কৃত; তাঁহার নাম দৃঢ়বল।

আয়ুর্বেদের অপৌরুষেয় বাক্যতা ও পবিত্রতা দর্শাইবার জন্য উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল না। ইহার প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জন্যই লিখিত হইল। ইহা এক দিনের ও এক সময়ের বস্তু নহে। মুনিগণ ধ্যানস্থ হইয়া দৈববাণী দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মানসপটে মুহূর্ত্ত মধ্যে আয়ুর্বেদ অঙ্কিত দেখেন নাই। ইহা তিল প্রমাণে সংগৃহীত এবং বহুকালের বহুদর্শিতার ফল।

প্রাচীন গ্রন্থত্রয়ের (চরক সূত্রের) অপৌরুষ্য নিৰ্ণয় করা অতিশয় সুকঠিন, তবে উভয় গ্রন্থের আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় যে সূত্রত চরক অপেক্ষা প্রাচীন। স্বাধা হটক এস্থলে আমি সে বিষয়ের তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। সময়ান্তরে)এবিষয়ের কথা উত্থাপন করিব।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এই আয়ুর্বেদ শব্দ প্রভৃতি আট অঙ্কে বিভক্ত। আট অঙ্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নাই। চরক সূত্রতই সমুদায় অঙ্গ ন্যূনাবিক কল্পনায় বর্ণিত আছে। চরক সূত্রতই হিন্দুদিগের প্রাচীন মূল চিকিৎসা গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই—বাগভট প্রভৃতি লগ্নেহীত ও বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও আয়ুর্বেদ উত্তরোত্তর বিস্তীর্ণ

হইয়াছে তথাপি নিদান স্থানের কিছু-মাত্র উন্নতি হয় নাই। প্রাচীন চরক সূত্রতে স্বাধা আছে তাহাতে তিলমাত্রও সংযোগ হয় নাই, তবে চিকিৎসিত স্থানের ক্রমশঃ যথেষ্ট স্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে উদ্ভিচ্ছঘটিত ঔষধি অধিক পরিমাণে ছিল। উদ্ভিচ্ছ কষায়, উদ্ভিচ্ছ বটিকা, উদ্ভিচ্ছাবলেহ, উদ্ভিচ্ছ-মিশ্রিত ঘৃত তৈল প্রভৃতিই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ধাতু ও উপধাতু-ঘটিত ঔষধ অতি অল্প মাত্র ছিল। পারদের একেবারেই ব্যবহার ছিল না। ধাতুর মধ্যে কেবল লোহেরই ভূরিপ্রয়োগ ছিল। স্বর্ণের ব্যবহার অতি অল্পমাত্র ছিল। তবে সকল ধাতুরই গুণ বর্ণিত আছে। ধাতু উপধাতু ও খনিজ দ্রব্য সকলের পরস্পরের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ানির্ণয়, পরস্পরের সংযোগ বিয়োগ করণ, মনুষ্য-শরীরে তাহার পরীক্ষা ইত্যাদি তাত্ত্বিকদিগের সময়েই পরীক্ষিত হইয়াছিল। তাত্ত্বিকগণ পারদ ও গন্ধকে শিব ও শক্তির অংশ ও এই দুই দ্রব্য ব্যবহার করিলে দীর্ঘ জীবন ও যোগাদি সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে বিবেচনা করিতেন। তদন্তুসারে তাহার পারদ ও গন্ধকের সংশোধন জারণ মারণ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হন, এবং পারদ গন্ধক ঘটিত নানা প্রকার রাসায়নিক সংযুক্ত দ্রব্য সৃষ্টি করেন। “রসসিন্দূর” “রসকপূর” “রসমাবিক” এবং হিঙ্গুল সেই সময়ের ফল। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পারদ ও গন্ধকের সহিত জারণ এবং স্বর্ণ মাস্কিক প্রভৃতি উপধাতু

মারণও সেই সময়ে আবিস্কৃত হয়। ফলতঃ যেরূপ মধ্য সময়ের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্পর্শমণির অল্পসন্ধানে রসায়ন বিদ্যার (কেমিস্ট্রী) মূল ভিত্তি স্থাপন করেন; সেইরূপ তাত্ত্বিকগণ দীর্ঘজীবন ও যোগ সাধনার উৎসাহে পারদ ও গন্ধকের আরণ্য মারণের প্রসঙ্গে বিবিধ ধাতুর আরণ্য মারণ ও প্রাণীশরীরে তাহার প্রয়োগের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ঔষধকল্পে ধাতু বিষয়ের বাহ্য উন্নতি হইয়াছিল তাহা সেই তাত্ত্বিকদিগের সময়েই। ধাতু বিষয়ক গ্রন্থ 'রস বদ্ধাকর' রসেন্দ্র চিন্তামণি, ও রসসাগর প্রভৃতি। অনেক তন্ত্রেও ধাতু ও উদ্ভিজ্জ ঘটিত ঔষধের কথা আছে। তাত্ত্বিকদিগের মতে তন্ত্র সকল শিববাণী, এজন্য সাধারণ লোকে শিবকে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে শিবের নামোল্লেখও নাই।

পুরাতন ঔষধগণ পর্ণকুটীরে বাস এবং ফল মূল্যাহার করিয়া বন, উপবন, মহারণ্য, পর্বতগুহা, উপত্যকা প্রভৃতি পরিভ্রমণ ও অল্পসন্ধান করিয়া এবং মনুষ্য, পশু প্রভৃতির শবচ্ছেদ পূর্বক আয়ুর্বেদ রূপ কীর্ত্তি স্তম্ভের স্বরূপাত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধস্তন সন্তানগণেরাও সেই ভিত্তির উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাত্ত্বিক শাক্তবৃন্দও তাহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট আয়ুর্জ্যোতিষীকার করিয়াছেন। উন্নতির কথা অধিক আর কি বলিব কায় চিকিৎসার উন্নতি কখনই নাই; তাহা লইয়া একমুখ্য

অনভিজ্ঞ দেশীয় চিকিৎসকগণও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণের সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। শলাতনেরও এত উন্নতি হইয়াছিল যে অশ্মরী ছেদ এবং মূচ গর্ভের গর্ভবহিকবণের প্রণালী দেখিয়া অনেকানেক পাশ্চাত্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকও বিস্মিত হইয়াছেন।

সেই আয়ুর্বেদের পরিণাম কি হইয়াছে? সে রাম নাই সে অযোধ্যাও নাই। আয়ুর্বেদ এখন সহায়হীন। যতদিন ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাগণের আধিপত্য ছিল ততদিন ইহার আদর ছিল। ভারতবর্ষে যখন হইতে বিজাতীয়গণের হস্তগত হইলেন সেই সময় হইতেই ইহার উন্নতির ধ্বংস হইল। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রেরও উন্নতির পথ রোধ হইল। ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। মুসলমানদের সময় তাহাদের যুনানী চিকিৎসার বহুল প্রচার ছিল। এখন ইংরাজদের সময় এলোপ্যাথি চিকিৎসার বহুল প্রচার। যে বিষয়ে রাজার আদর নাই প্রজাদেরও তাহাতে আদর হয় না। যেমন এলোপ্যাথি চিকিৎসার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ও ঔষধালয় নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে স্থাপিত হইতেছে, সেইরূপ রাজার আদর থাকিলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ঔষধালয়ও স্থাপিত হইত। কিন্তু রাজা বিদেশীয়; তাঁহাদের এদেশীয় চিকিৎসার উপর আদর বা আস্থা কেন হইবে? তাঁহারা এদেশীয় সমুদায় শাস্ত্রই প্রায় জ্ঞানহীন বলিয়া থাকেন, কিন্তু এদেশীয় লোকেরা

যে গড়লিকা প্রবাহের ন্যায় রাজচ্ছন্দ- পদদলিত করিয়া বিনষ্ট করিতেছেন, তাঁহা-
বর্তী হইয়া বহুকালের সঞ্চিত রত্নসকল দেব মনে কি ক্ষোভ বা কষ্ট হইতেছে না ।

শ্রী—ব

শঙ্করমণ্ডন সংবাদ ।

পরদিন প্রাতঃকালে স্বর্ষ্যোদয়ের পর শঙ্কর বিচার করিতে হইবে বলিয়া নিত্য কণ্ঠ সমাধা পূর্বক শশিষা মণ্ডনের গৃহে ঘাইয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন । অনন্তর মণ্ডন পণ্ডিতও স্বীয় পত্নীকে মধ্যস্থ পদে নিয়োগ করিয়া বিচারে সমুৎসুক হইলেন । পতিদেবতা সারদা পতি-কর্তৃক তাঁহাদের বিদ্যার ভারতম্য বিচারে মধ্যস্থ পদে নিযুক্ত হইয়া স্বয়ং সরস্বতীর ন্যায় শোভা পাইলেন ।

যতীন্দ্রও বিচারে মণ্ডনের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া প্রথমে জীবেরের একত্ব রূপ স্বীয় মত বলিয়া প্রকাশ করিলেন । বলিলেন এক মাত্র সচ্চিদমল পরমবস্তু ব্রহ্মই, অজ্ঞানের আবরণে এই প্রপঞ্চ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন । শুদ্ধি যেমন রজতাস্থক না হইয়াও রজত রূপে প্রকাশ পায়, পরমাত্মাও সেইরূপ এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত । জীব ও জীবেরের ঐক্য-জ্ঞান লাভ হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্নের ব্রহ্মতে লয় প্রাপ্ত হয় । এই ঐক্য-জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মতে লয়ের নামই

নির্কীর্ণ ।* নির্কীর্ণ লাভ হইলে আর ফিরিয়া সংসারে আসিতে হয় না, বেদান্ত তাহার প্রমাণ । যদি আমার জয় হয় ভাল, আর আমার যদি পরাজয় হয়, হে মণ্ডন, আমি সম্মান স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইব, এই পাটল বসনের পরিবর্তে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিব ; উভয়-ভারতী, আমাদের জয় পরাজয়ের বিচার করুন” ।

যতীন্দ্র নিজ সম্বন্ধে এই রূপ উদার প্রতিজ্ঞা করিলে পর গৃহি-শ্রেষ্ঠ মণ্ডন স্বপক্ষ স্থাপনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বলিলেন—“পরমাত্মা বিষয়ে বেদান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না অথবা যদিও করা যায়, যেহেতু পরমাত্মা নির্লিপ্ত তাহাতে শক্তিযোগ না হইলে তাহা দ্বারা কোন

* একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনস্তং বিজ্ঞানমানসং ব্রহ্ম, সর্বং খলিদং ব্রহ্ম বাচরন্তনমিকারো নামধেয়ং যুক্তিকৈতবে সত্যং, তরতিশোকমাত্মবিতং । তত্র কোমোহঃ কঃশোকঃ একত্ব মনুপশ্যতঃ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মের ভবতি ন ন পুনরাবর্ততে ইত্যাদি ।

কার্য্য হয় না ; বেদ অপৌরুষেয় অতএব স্বভূতই প্রমাণসিদ্ধ। বেদে কেবল কৰ্ম্মাহুষ্ঠানেরই কথা আছে কথার প্রয়োজন কার্য্যে-তেই পর্য্যবসিত হয়। কেহ যদি বলে ঘট আন, ঘটানয়ন পর্য্যন্তই সেই কথার প্রয়োজন থাকে। ঘট আনিলে পরে সে কথা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার 'ঘট আন' এই কথার দ্বারা ঘট কি পদার্থ তাহার মীমাংসা হয় না, বেদবাক্য দৃষ্টান্তেও অবিকল সেই রূপ ; বৈদিক ক্রিয়াহুষ্ঠান মাত্র তাহার প্রয়োজন। ক্রিয়াহুষ্ঠানেই মুক্তিলভ হয় ইহা বেদের অভিপ্রেত, মানুষ আজীবন তাহাই করিবে।

যদি আমি বিচারে পরাজিত হই আমিও এই শুদ্ধ বসন পরিত্যাগ করিয়া পাটল শাট পরিধান করিব, গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিব। তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ তাহার বিপরীত আমার ঘটিবে। আমাদের উভয়ের সন্মতি ক্রমে আমার জীই মধ্যস্থ হউন”।

পরাজিত ব্যক্তি জেতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর ও বিশ্বরূপ উভয়েই জয় লাভের মানসে বিচার আরম্ভ করিলেন। হয়-ভারতী * বিচারে মধ্যস্থ রহিলেন। নিত্য কৰ্ম্ম সমাপন করিয়াই তাঁহারা বিচার আরম্ভ করেন, এইরূপ দিমের পর দিন যায়, উভয়-ভারতী গৃহকৰ্ম্ম ফেলিয়া সকল সন্ধ্যায় সভাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারেন না, অতএব তিনি প্রতি-

* উভয়-ভারতী, হয়-ভারতী, সারদা ইত্যাদি নামের জীই নাম।

দ্বন্দ্বী পণ্ডিতদ্বয়ের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া বলিলেন যাহার কণ্ঠমালা মলিন ভাব ধারণ করিবে তাহারই পরাজয় জানিবে। এই বলিয়া তিনি মণ্ডনের আহারের এবং যোগীর ভিক্ষার আয়োজন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করেন।

বাস্তবিক পক্ষে অন্তরাত্মার সাক্ষ্যের মতন সাক্ষ্য নাই, কে জ্ঞেতা কে জিত উভয়ের অন্তরাত্মা তাহার প্রধান সাক্ষী। আত্মার সাক্ষ্য মুখচ্ছবিতে প্রতিভাত হয়। কোনরূপেই মুখের উজ্জ্বল অথবা মলিন কান্তি পরিবর্তন করা যায় না। শত চেষ্টার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অলক্ষিত ভাবে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। জড় প্রকৃতি কণ্ঠের হার পর্য্যন্ত যে সহানুভূতিহীন, জয় হইলে আনন্দে উজ্জ্বল, ও পরাজয় হইলে মলিন কান্তি ধারণ করিবে ইহার বিচিত্র কি। তাপমান যন্ত্রে যেমন উত্তাপের তারতম্য স্থির হয় সেইরূপ জয় পরাজয়ে গলার মালায় তাহা প্রকাশ হইবে মণ্ডন পত্নী স্থির করিলেন।

এদিকে তাঁহারা বিবাদ চালাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদিদেবগণ আসিয়া আকাশে নিজ নিজ বাহনে বসিয়া তাঁহাদের বিচার শুনিতেছিলেন। তুমুল বিবাদ হইতে চলিল। সভাস্থ লোকেরা সাধুবাদ করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বেদকে নিজ পক্ষে সাক্ষী করিতে লাগিলেন, দিনে দিনে বিবাদ বৃদ্ধি পাইতে চলিল, দেশদেশান্তর হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। পরস্পর ভিগ্নীয়া ক্রমে বুদ্ধি পাইল, তথাপি একে-অন্যের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব হইল না।

উভয় ভাবভী প্রতিদিন মধ্যাহ্নে যথা সময়ে আসিয়া মণ্ডনকে আহাবের জন্য, যতিকে ভিক্ষার জন্য বলিয়া যাইতেন। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন চলিয়া গেল। তাহারা একাসনে বসিয়া পরস্পরের উক্তব সকল খণ্ডন কবিত্তে লাগিলেন। ঘণ্টে সর্কাস্ত ভাগিয়া যাইতে লাগিল। মুক্তিবাস সময় বা একবার আকাশ পানে তাকান্ এমন অবসব নাই। অনেক বিচারের পব যতিরাজ মণ্ডনের বিচার-নিপুণতায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন “তোমার যাহা বলিবার থাকে বল”। মণ্ডন বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। “হে যতি-রাজ আপনারা যে বলেন জীব এবং ঈশ্বর বস্তুতঃ এক আমরা তাহার কোন প্রমাণ দেখি না।”

শঙ্কর উত্তর করিলেন “এই ত প্রমাণ যে উদালক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গুরুগণ খেত-কেতু জনক প্রভৃতি শিষ্যাদিগকে তুমিই ঈশ্বর, আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া জান এইরূপ বুঝাইতেছেন।

মণ্ডন। “বেদান্তে যেমন হুমফা প্রভৃতি শব্দ কোন বিশেষ অর্থে বলা হয় না কিন্তু জপ করিলে পাপমোচন হয় তত্বমসি শব্দও সেইরূপ”

শঙ্কর। “হুমফা প্রভৃতি শব্দের কোন

অর্থ হয় না বলিয়াই বিজ্ঞেরা সে সকল অপোপযোগী স্থির করিয়াছেন। হে প্রাজ্ঞ, এই সকল বাক্যের যখন স্পষ্ট অর্থ হয় তখন কি করিয়া এ সকলের জপমাত্র প্রয়োজন হইবে।”

এ স্থলে ইহা বিজ্ঞাসা হইতে পারে অর্থ-শূন্য শব্দ জপের প্রয়োজন কি ?

যত কিছু শব্দ সার্থক তাহাদের অর্থ বাহ্য অথবা মানস বৃত্তির গোচর। পরমাত্মা বাহ্য, মানস সকল প্রকাব ইন্দ্রিয়বৃত্তির অ-গোচর। তবে তিনি আছেন কি করিয়া জানা যায় ? যেহেতু তিনি চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ। তাঁহাকে জানিতে হইলে বাহ্য অথবা মানস কোন ইন্দ্রিয়ের চালনা করিতে হয় না। সর্কপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি বোধ করিলেই তাঁহার স্বপ্রকাশ সত্তা উপলব্ধি হয়। যাহা মনে ধাবণা করা যায় না সার্থক শব্দে তাহার নাম দেওয়া যায় না। সেই জন্য কোন শব্দে পরমাত্মার নাম হয় না। যদি হয় তবে অর্থশূন্য শব্দে কিঞ্চিৎ হয় ; এই হয় যে তিনি আছেন ; কিন্তু তাঁহাকে বর্ণনা অসাধ্য। নতুবা সন্ন্যাসীদের মতন অজপা সাধন করিতে হয়।

মণ্ডন পূর্ব্ব কথা ফিরাইয়া বলিলেন “আপাততঃ তত্বমসি প্রভৃতি বাক্য দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন হয় বটে, তথাপি এ কেবল যাজ্ঞকর্তার প্রাশংসাবোধক মাত্র, তাহার স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নাই।”

শঙ্কর। “ক্রিয়াকাণ্ডে যাজ্ঞকর্তৃত্ব বৃণাদিকে অর্থমাদি রূপে প্রাশংসা করিয়াছে বটে, যথা ‘যপ্ আদিত্য স্বরূপাঃ প্রোক্তবঃ’

* “তত্বমসি খেতকেতো” আবার যাজ্ঞ-বল্ক্য জনককে বলিতেছেন “অভয়ঃ বৈ জনকঃ প্রাপ্তোসি তদাত্মানমেব বেদাহঃ জ্ঞানস্বীতি তস্মাৎ সর্কমভবৎ তজ্জকো মোহঃ কণ্ঠশোকঃ একত্বমহুপশ্যতঃ”।

মানস্বরূপ'। সে স্থলে যদি এ সকলের বিধি শেষ করা মাত্র প্রয়োজন হয় হউক। কিন্তু জ্ঞান কাণ্ড স্থিত তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, ইত্যাদি বাক্য কি রূপে বিধিশেষার্থ হইবে?

বিধিশেষ, অথবা অর্থবাদ কথা আমাদের শাস্ত্রে এক প্রকার পতিত পাবন বিশেষ বলিলে হয়। যাহা কিছু শাস্ত্রে অসত্য অথবা অনায়াস বলিয়া বোধ হয় সমস্তই এই নামে পার পাইতে পারে।

মাতা যেমন সন্তানকে ঘুম পাড়াইতে হইলে বলেন 'ঘুম, না হইলে তোকে শিয়ালে লইয়া যাইবে'। ছরস্ত বালক স্থির ভাবে বসিয়া না খাইলে ভয় দেখাইয়া বলেন 'খাইতে বসিয়া যে উঠে সে বিবাহের সময় পিঁড়া হইতে পড়িয়া যায়' খাবার বস্তুতে পিপড়া পড়িলে শিশু না খাইলে প্রলোভন দেখান 'পিপড়া খাইলে সাঁতার শিখে'; ইত্যাদি এইরূপ করাতে যদি মিথ্যা কথনের দোষ হয় তবে পঞ্চতন্ত্র অথবা হিতোপদেশের কাক শৃগালাদির গল্পতেও সেই দোষ না হইবে কেন? শাস্ত্রকারগণও জন সাধারণের মাতা হইয়া এইরূপ অনেক অলীক ফলের কথা বলিয়া গিয়াছেন। শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে তাহার নিকট নিদ্রার উপকারিতা বর্ণন করিয়া নিদ্রাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন যেমন অসম্ভব, সাধারণেরও অনেক কর্তব্য কর্ম আছে যাহার উপকারিতা তাহার স্থূল বুদ্ধির অগম্য। শিয়ালে নেবার কথা যেমন শিশুর বুদ্ধি-গ্রাস্ত বলিয়াই মাতা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রকারগণও সাধারণের স্থূল-বুদ্ধির গোচর কোন কাল্পনিক ফলের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে সেই কার্যে প্রবৃত্ত অথবা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ছিলেন। নিকর্ম স্থানের উপকারিতা

মণ্ডন। হে অর্হন, তবে তত্ত্বমসাদি বাক্য জীবব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক হউক।

সকলের বোধগম্য হয় না। দান না করিলেও আবার মন পশুবৎ সঙ্কীর্ণ হয়। স্বর্গ লাভের আশায় দান করিতে অনেকেই প্রস্তুত, এ জনাই স্বর্গলাভের জন্য দান দক্ষিণা যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। স্বর্গ-কামোষজ্ঞেত। বিধি অর্থাৎ অহুজ্ঞাবাক্যের নিন্দা বা স্তুতিবোধক ফল কথনের নাম বিধিশেষ। বিধি, যথা, "ওদনং পচেৎ" 'অন্ন প্রস্তুত করিবে'; বিধিশেষ যথা, "আম্বুর্কচো বলং স্রুৎ প্রতিভানঞ্চায়ে প্রতিষ্ঠিতং", আম্বু, বাক্য, বল, বুদ্ধি, স্রুৎ, অন্নই সকলের মূল। অনেক স্থলে কথিত ফলসকল বন্ধাপুত্রের ন্যায় বিরুদ্ধ। "সর্বস্যাপ্তে সর্বস্য জিত্যে সর্বমেবৈতেনাপ্রোতি।" অর্থাৎ সকল 'কামনা' সিদ্ধ হয়, সমস্ত জয় হয়, এই যাগ করিলে সমস্ত লাভ হয়।

কবিরাজ খুড়োর! ব্যবস্থায় গুরু হারাইলেও পাওয়া যায়। একেবারে যদি সমস্তই লাভ হইল পরে সে ব্যক্তি করিবে কি? অনেক স্থলে কথিত ফল নিতান্ত ছেলে ভুলানর মতন। যেমন 'জ্যোতি-ষ্টোম না করিয়া যে অন্য যজ্ঞ করে দে একেবারে গর্ভে পড়ে', ইত্যাদি। এইরূপ শাস্ত্রে যতপ্রকার অপ্রত্যক্ষ ফলের কথা বলা হইয়াছে তাহার কোনটি প্রকৃত আর কোনটি বিধিশেষ মাত্র তাহা নির্ধারণ করা নিতান্ত দুঃসহ। হয়ত শাস্ত্রের অপ্রত্যক্ষ ফল মাত্রেরই অলীক কল্পনা, বিধিশেষ মাত্র। এই জন্যই ভগবান্ কৃষ্ণ এই সকল অলীক বৈদিক কর্মফলের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ। বেদবাদ রতাঃ পার্থ নানা দস্তীতি বাদিনঃ"।

এ জনাই ভগবান্ জৈমিনি হত্ন করিতেছেন।

আম্মায়স্য ক্রিয়ার্থবাদানর্থক্যমতদর্থানাং।

কিন্তু তাহা কেবল কৰ্মের উন্নতির জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। যেমন “মনো ব্রহ্মোত্থাপাসীত, অন্নমুপাস, আদিত্যো ব্রহ্মোত্থাদেশঃ বায়ু বাব সশ্বর্গঃ প্রাণো বাব সশ্বর্গ বাক্য ইত্যাদি দ্বারা অত্রকৃত মন অন্ন অর্ক এবং বায়ু পূজাতে প্রবৃতি জন্মাইবার জন্য সে সমস্ত ব্রহ্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবোপাসনায় প্রবৃতি জন্মাইবার জন্য জীবকেই ব্রহ্ম কল্পনা করা হইয়াছে।

শঙ্কর। “মনোব্রহ্মোত্থাপাসীত” মন ব্রহ্ম তাহার উপাসনা করিবে” ইত্যাদি স্থলে লিঙ্ প্রয়োগদ্বারা অথবা ‘করিবে’ পদদ্বারা মনের উপাসনার বিধি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ‘তুমিই ব্রহ্ম’ এই বাক্যে কোন উপাসনা বিধির নির্দেশ করা হয় নাই; অতএব হে মনোবিন্ কী রূপে কল্পনা করা যায় যে জীবোপাসনায় প্রবৃতি জন্মাইবার জন্য অন্নব্রহ্মের ন্যায় জীবব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

মণ্ডন। হে যতিরাজ, মীমাংসা শাস্ত্রে যেমন “প্রতিষ্ঠিত্তিহব্যম এতা রাজ্ঞীরূপয-জ্ঞীতি” ‘যাহারা রাজি নামে সোমযাগ বিশেষের অনুষ্ঠান করে, তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এস্থলে প্রতিষ্ঠা রূপ ফল লাভের উল্লেখ আছে বলিয়া রাজিযাগের বিধি কল্পনা করা যায়, সেইরূপ ‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব-ভবতি’ ‘যে ব্রহ্ম জানে সে ব্রহ্ম হয়’ এস্থলে ব্রহ্ম-লাভ রূপ ফলের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধি কল্পনা করা যায়। যথা ‘বদি

ব্রহ্ম হইতে চাও তবে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ কর।’

শঙ্কর। যদি উপাসনায় প্রবৃতি জন্মাইবার জন্যই ‘জীব ব্রহ্ম’ বলা হইয়া থাকে, এবং মোক্ষ যদি উপাসনা ক্রিয়ার ফল বিশেষ মাত্রই হয়, তবে স্বর্গাদি রূপ অপর ক্রিয়াফলের ন্যায় মোক্ষও নশ্বর হইবে, যেহেতু উপাসনা মনের কার্য বিশেষ, করা না করা মাহুয়ের অধিকার। ‘সন্ধ্যাং ধ্যা-য়েৎ’ ইত্যাদি বিধিবাক্যে ধ্যান করা না করা ধাতার অধীনে, মোক্ষ যদি এইরূপ কোন বিধি অনুষ্ঠানের ফল মাত্র হয় তবে তাহাও অনিত্য হইবে। যদি বল তোমার মতেও ত মোক্ষ অনিত্য’ যেহেতু ‘আমি ব্রহ্ম’ এই জ্ঞানও মনের ক্রিয়া বিশেষ। ইহার উত্তর এই অদ্বৈত জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া বিশেষ হইলেও বস্তু যেরূপ ঠিক তাহারই জ্ঞান বলিয়া জ্ঞান করা না করা আর জ্ঞাতার মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে না। যেমন যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয়া ভয় পাইয়াছে, সে যদি একবার রজ্জু বলিয়া জানিতে পারে, তবে আর সে পুন-রায় সেই রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করিয়া ভয় পায় না।

মণ্ডন। তৎকালে প্রভৃতি বাক্য উপা-সনায় প্রবৃতি জন্মাইবার জন্য নাই বা হইল, কিন্তু জীবাত্মার এবং পরমাত্মার সা-দৃশ্য প্রতিপাদক হউক।

ক্রমঃ ১

ভাউ সাহেবের বখর।

শিন্দে অটক ও কিলেকুশাদ এই দুই তোপ বাহির করিয়া লইলেন। অটকের ঘোড়া তোপ ফুটে নক্ষর মাত্র শিলিম গড়ের কিল্লায় রহিল। অটক তোপের চতুর্দিকে তিন সারি করিয়া তিন শত পঞ্চাশ গরু ঘুড়িয়া লি। দুই হাতি লাগাইল। তত্রাপি তোপ সেস্থান হইতে সরে না। পরে নগর হইতে একজন মাছুষ আনিয়া তোপের উপর বলি দিল। ছাগ, মোরগ, নারিকেল, নেবু প্রভৃতি বলিরত সংখ্যা ছিল না। অতি কষ্টে তোপ লক্ষ্যেতে আনীত হইল। তোপ উজ্জয়িনীতে লইবার প্রস্তাব হইল। তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। শিন্দের মানস যে, “আর একবার নাগুরাতে যাইয়া এই তোপ দ্বারা বিদ্রোহকে আক্রমণ করিব।” তাঁহার মনে এই আশাই অত্যন্ত বলরতী। কিন্তু তোপ লইবার বিষয়ে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইল। জাট পক্ষীয় রূপরাম কটারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার কর হইতে দুই লক্ষ টাকা কমাইলে তিনি তোপ উজ্জয়িনীতে পৌছাইতে সম্মত হইলেন। উক্ত অঙ্গীকারে তোপ তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। তিনি তোপ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এ তোপ কোন কালেই উজ্জয়িনীতে পৌছিল না। শেষে যখন ইষ্টানের বিশাশ কাল উপস্থিত হইল তখন

এই তোপ চমেলীর খালে আচরী ঘাটে পড়িয়াছিল। কিলেকুশাদ সঙ্গে চলিল। গাজুদীখান উজীরের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি দিল্লিতেই রহিলেন। দত্তাজী শিন্দে কুচ করিয়া মজল দর মজল পানিপত হইয়া কুরুক্ষেত্রে আসিলেন। সেখানে আটদিন থাকিয়া চারি তুলাদান করিলেন, পরে মজল দর মজল শতক্র পর্বাৎ গেলেন। লাহোরের সুভা সন্দীপ বেগের পুত্র ও লক্ষ্মীনারায়ন আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। তাঁহার্য্য মন্ত্রণা করিয়া পনের সহস্র সৈন্য সহ সাবাজী শিন্দে ও ত্রাসক বাপুজীকে লাহোর, তান, পঞ্জাব, কাশ্মীর, অটক পর্য্যন্ত কার করিতে পাঠাইলেন। শিন্দে কুচ করিয়া কুজপুরার নিকটে শিবির করিলেন। মনে যোদ্ধনা করিলে জীবখানকে হস্তগত করত তাহা ভাগীরথীর উপর পুল বাধিয়া সাধন করিব।” জনকোজী শি শঙ্কর ও অন্ত্যাজী মানকেশ? মনোভাব এই যে, “শ্রীমন্ত আহ তদন্তযায়ী কার্য্য করা হউক। শাস্তি দেওয়া যাউক।” সক গোবিন্দ পন্ত বুন্দে পরম্পরের সহিত মিজত, খান বলিতে লাগিলেন,

দাওনী, সুভেদার মলহাররাও তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ দস্তাজী শিন্দে সম্মুখে উপস্থিত। আমার গতি কি হইবে?” গোবিন্দ পস্ত অভয়দান করিয়া বলিলেন, “তুমি স্বস্থানে নিশ্চিন্ত থাক। উভয় পক্ষে মধ্যস্থতার ভার আমার।” গোবিন্দ পস্ত দস্তাজী শিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শিন্দে ভাগীরথীর পুল বাঁধা সম্বন্ধে গোবিন্দ পস্তের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, “পাটীল বাবা, নজীবখান বিনা এ কার্য্য হইবার নহে।” ইহাঁর মনে ইহাই ছিল। উনিও সেই প্রস্তাব করিলেন। এ বিষয় ইহাঁর মন সম্পূর্ণ রূপে আদিকার করিল। গোবিন্দ পস্ত বুদ্ধেলকে বলিলেন, “নজীবখানকে অসঙ্কেচে লইয়া আসিবে। তোমার ও আমার বিবেচনায় কর্তব্য তাহাই করা যাইবে।” গোবিন্দ পস্ত বুদ্ধেলে নজীবখানের নিকটে পাঠাইলেন। তিনি তে পূর্ন আকুল হইয়াছিলেন। চারি সহস্র নজীবখান রোহিলা সাক্ষাৎ আসিলেন। দুই ফ্রোশ অন্তরে অন্তরে করিলেন। বুদ্ধেলে দস্তাজী এই সংবাদ শুনাইবামাত্র তিনি যাইবার নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন। জনকোজী, নারো শঙ্কর, মন্সর, জানরাও বাঘলে প্রভৃতি সর্দার একত্রে মিলিত হইয়া করিলেন, “শশক যেমন নজীবখান রোহিলা তদ্রূপ

আদিয়াছে। আজিকার দিন কোন মতেই ইহাকে ছাড়া হইবে না।” তাঁহারা দস্তাজী শিন্দেকে এই কথা বলিতে আসিলেন। তিনি শুনিয়া তাচ্ছল্য প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, “স্বকার্য্য সাধনার্থে বৈরীর সহিত মিত্রতা করা আবশ্যিক। ইহাতে আমি কি ক্ষতি করিতেছি?” জনকোজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, মনে করিলেন, “নাক খাট ভাল তবু বয়স ছোট ভাল না।” কাহারও চেষ্টা সফল হইল না। জীলোকদিগের, বালক বালিকাদে পৰ্য্যন্ত ইচ্ছা নহে যে এবার নজীবখানকে ছাড়া হয়। কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া দস্তাজী শিন্দে অগ্রসর হইয়া নজীবখানকে লইয়া আসিলেন। নজীবখানকে বলিলেন, “আমার নিমিত্ত ভাগীরথীর পুল বাঁধিয়া দেও। তোমাকে সর্কাগ্রে পাঠাইতেছি। পরে যে ধন লাভ করিব তাহার দশমাংশ দিব। আর যে দেশ হস্তগত হইবে তাহারও দশমাংশ দিব। তুমি আমি এক প্রভুর ডুতা, একনিষ্ঠ হইয়া সেবা করা উচিত।” নজীবখান তাহা মান্য করিলেন। দস্তাজী শিন্দে নজীবখানকে বিলুপত্র হরিজী দিয়া বাকদস্ত হইলেন। নজীবখান তাঁহাকে সাজকরোটা দিলেন। দুই জনে অভেদাভ্য হইলেন। দশপনের দিন একত্রে রহিলেন। ভাগীরথীর পরপার অধোধ্যাতে সুজাউদৌলা ছিলেন। নজীবখান শুণ্ডরূপে চেতরাম উকীল দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “দস্তাজী শিন্দে স্থির প্রতিজ্ঞ। তোমার প্রতিই যাত্রা করিবে। আমি

একবার মন্ত্রণা করিয়া অবতুল অজ্ঞীকে আনাইয়াছিলাম। চতুর্দিক হইতে তোমরা সকলে সাহায্য করিলে না। সে মন্ত্রণার ফল এইরূপ দাঁড়াইল। আমিই সকলের শত্রু হইলাম। এক্ষণে আর একবার সব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই কথা বলিয়া বলিয়া পাঠাইলাম। ইহার উত্তর যাহা হয় দিবে। অল্পসহরের অহমদখান নংগড়া পাঠান আরই কেবল বামা-দের উপর মমতা অর্থাৎ স্থির কর বলিয়া পাঠাইয়া দিয়া। সুজাউদ্দৌলা উক্ত পি-তার উজিরী গে স্থানে আসিয়া কোন কালক্ষেপ করিতেছি, এখানেও সন্তুষ্ট থাকিতে দিবে না। মরণাপেক্ষা অপমান অধম। এখন আমার অন্য উপায় নাই। নজীবখানকে বলিবে, আমি সর্বতোভাবে তার আয়ত্তা-ধীন। পঞ্চাশ সহস্র ফৌজ ও তিন শত তোপ তাহাকে সমর্পণ করিতেছি, আর যদি পাঁচ কোটি টাকাও খরচ লাগে তাহাও যোগাইব। কিন্তু শত্রুকে নদীপার হইতে দিবে না।” উকীলকে সাজক রোটি দিয়া বিদায় করিলেন।

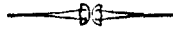
এ দিকে অবতুল আলির সঙ্গে বরাবর একটা মন্ত্রণা চলিয়াছে। এর মধ্যে আবার সুজাউদ্দৌলার সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত হইলে

রোহিলা নজীবখাঁ দত্তাজী সিন্ধের শিবিরে গিয়া বলিল—“সাহেব, তুমি গড়মুজেশ্বরীতে গিয়া তীর্থ বিধি কর, আমাকে আজ্ঞা দেও মীরসুরের নিকটে গুরুতাল আছে সেখানে গিয়া ভাগীরথীর পুল বান্ধিয়া ঠিক করিয়া রাখিব। ইচ্ছা হয় ত এক মাসের পূর্বে আপনি আসিবেন”।

নজীবখাঁ এক মাস ১৫ দিন থাকিয়া খোশামোদ করিয়া অকপট ভাব দেখাইয়া ছিল সিন্ধে তাই তাহার কথা সব সত্য মনে করিলেন। হাতি ঘোড়া জহর বস্ত্র বহু মান দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। এ সময় জনকোজী সিন্ধে ও আর আর সকলে বলিলেন “ইহাকে শাসন করা উচিত ছিল তাহা করিলেন না। এখন ইহাকে কাছে রাখিয়া ইহার দ্বারা কার্য্য করিয়া লওয়া হোক—ইহাকে হাতছাড়া না করা হয়।” ইহাতে দত্তাজী সিন্ধে উত্তর দিলেন “তোমরা সবাই খুব কাজের লোক আর আমিই কেবল কিছু বুঝি। নজীবখাঁ একজন খাঁটি লোক আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। সেই জন্য আমি তাহাকে বিদায় দিলাম।” এ উত্তরে আর কে কি বলিবে। সকলে ভাবিল—পিপড়ার পাখা হইলে বাহা হয় তাই হইয়াছে”—উপায় নাই স্তবরাং সকলেই চুপ চাপ করিয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।



সঙ্গীত সংগ্রহ। (বাউলের গাঁথা)।
 দ্বিতীয় খণ্ড। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমা-
 লোচনা কালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শি-
 ক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সঙ্গীত
 দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া-
 ছিলাম! তদুপলক্ষে সংগ্রহকার বলিতে-
 ছেন, “যখন আধুনিক অশিক্ষিত বাউ-
 লের ও বৈষ্ণবের গান সংগ্রহ করিব—
 কারণ আধুনিক ও প্রাচীন গান প্রভেদ
 করিবার বড় কোন উপায় নাই—তখন
 অশিক্ষিত সুভাবুক লোকের সুন্দর সুন্দর
 সুভাবপূর্ণ সঙ্গীত কেন সংগ্রহ করিব না
 আমি বুঝিতে পারি না। এই সংগ্রহের
 লক্ষ্য ও ভাবের বিরোধী না হইলেই আমি
 যথেষ্ট মনে করি।” এ সম্বন্ধে আমাদের
 বাহা বক্তব্য আছে নিবেদন করি। প্রথ-
 মতঃ গ্রন্থের নাম হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য
 বুঝা যায়। এ গ্রন্থের নাম শুনিয়া মনে
 হয়, বাউল সম্প্রদায় রচিত গান অথবা বাউ-
 লদিগের অনুকরণে রচিত গান সংগ্রহই
 ইহার লক্ষ্য। তবে কেন ইহাতে শঙ্করাচার্য্য-
 রচিত “মুড় অহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং” ইত্যাদি
 লংকৃত গান নিবিষ্ট হইল? মুজী আলাল
 উদ্দিন রচিত “আহে বন্দে খোদা, ঘুরা
 ছুজা কারো” ইত্যাদি হুর্কোথ উর্দু গান
 ইহার মধ্যে দেখা যায় কেন! গ্রন্থের

উদ্দেশ্যবহির্ভূত গান আরও অনেক এই
 গ্রন্থে দেখা যায়। একটাত নিয়ম রক্ষা,
 একটাত গভী থাকা আবশ্যক। নহিলে,
 বিবেচিত গান আছে সকলেই এই গ্রন্থের
 মধ্যে উপস্থিত জন্য নালিশ উপস্থিত
 করি। কথা—আমরা কেন
 যে লোকের রচিত
 সঙ্গীত সহকারে দেখিতে
 চাই তাহার কা। আধুনিক শি-
 ক্ষিত লোকদিগের ত পরস্পরের সহিত
 প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষা
 লাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায়
 এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত
 আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের
 হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন
 চমৎকৃত হই না। কিন্তু, প্রাচীন সাহিত্যের
 মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের গানের
 একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের
 কি বিস্ময়, কি আনন্দ! আনন্দ কেন হয়?
 তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিহ্বা-
 লোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল
 স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ভূমি আমরা দেখিতে
 পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই,
 মগ্নতরী হস্তভাগের ন্যায় আমাদের এই
 হৃদয় অগণনীয় যুগবিশেষের অভ্যাস ও
 শিক্ষা নামক ধরপ্রোতে ভাসমান বিচ্ছিন্ন

কাঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াই-
তেছে না। অসীম মানবহৃদয়ের মধ্যে
ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের হৃদয়ের
উপরে ততই আমাদের বিশ্বাস জন্মে, স্র-
তরাং ততই আমরা বললাভ করিতে থাকি।
আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থন-
সূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের
পানীয়, একি আমার নিজের হৃদয়স্থিত
সঙ্কীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উথিত, না অভ্র-
ভেদী মানবহৃদয়ের গল্লোত্তীর্ণিতঃসৃত
সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের
মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্ব সাধারণের সেব-
নীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোন সুযোগে
জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে
হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার
মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে
পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ
করে। অতীত কালের প্রবাহধারা যে
হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায়, সে হৃদয় কি
মরুভূমি!

ওরে বংশীবট, অক্ষয় কোথারে তমাল
বন!

ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি
কারণ!

ওরে শ্যামকুঞ্জ, রাধা কুঞ্জ, কোথা গিরি
গোবর্দ্ধন!

এহু হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিয়া
আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি।

ঐ বৃক্সি এসেছি বৃন্দাবন।

আমার বলে দেহে নিতাই ধন।

ওরে বৃন্দাবনের পশু পাখীর রব শুনি না কি
কারণ!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে
সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্তমানের সহিত
অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে ব-
লিয়া! তা' যদি না হইত, আজ যদি সেই
কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত,
তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন
বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতে পাই-
তাম! আমাদের হৃদয়ের কত তৃপ্তি হইত!

শ্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন।

—কালীকঙ্কের কোন পণ্ডিত শ্রীশিক্ষা
সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করায়
কালীকঙ্ক সার্বজনিক সভাস্তম্ভগত শ্রীশিক্ষা
বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী গুণময়ী—সেই
আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত
পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয় যে আটটি আপত্তি
উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার দারুণ গুরুত্ব
পাঠকদিগকে অনুভব করাইবার জন্য আ-
মরা নিম্নে সমস্ত গুলিই উঠাইয়া দিলাম।

আপত্তি।

১। জীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আব-
শ্যক কি? শিখিলে উপকার কি?

২। জীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অর্থ
হয়।

৩। জীলোকে লেখাপড়া শিখিলে
বিধবা হয়।

৪। শ্রীলোকের, লেখাপড়া শিখিলে, সন্তান হয় না।

৫। শ্রীলোক শিক্ষিত হইলে, অবি-নীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্মণ্য হয়।

৬। লেখাপড়া করিয়া কি মেয়েরা চাকুরী করিবে না জমীদারী মহাজনী করিবে?

৭। মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে কি ক্ষতি আছে।

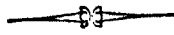
৮। বিদ্যাশিক্ষায় নারীগণের চরিত্র দোষ জন্মে?

আপত্তিগুলির অধিকাংশই এমনতর যে একজন বালিকার মুখেও শোভা পায় না,— পণ্ডিতের মুখে যে কিরূপ সাজে তাহা সকলেই বুঝিবেন। শ্রীমতী গুণময়ী যে আপত্তিগুলি অতি সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইহার পর বলা বাহুল্য।

ভাষাশিক্ষা — গ্রন্থকারের নাম নাই

গ্রন্থকর্তা নিজেই লিখিয়াছেন যে এই পুস্তক খানি ইংরাঙ্গি প্রণালী অনুসারে লিখিত, বাস্তবিকই তাহা সত্য। আজ কাল “A Higher English Grammar, by Bain,” “Studies in English” by W. Mc. Mordie, Translation and Retranslation by Gangadhor Bannrajee, প্রভৃতি যে সকল পুস্তক এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী বালক মাত্রেরই পড়িয়া থাকেন, বলা বাহুল্য যে এই পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। পুস্তক খানি পাঠে, লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সূত্রটি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার সহিত আমাদের অনেক গুলি মতের ঐক্য হইয়াছে, এবং সে মতগুলি সূত্রটি সঙ্গত জ্ঞান করি। আমাদের বিখ্যাস যে পুস্তক খানি পাঠে ব্যাকরণজ্ঞ বালকদিগের উপকার জন্মিতে পারে।

বর্তমান শিক্ষা ।



কিসের অন্বেষণ মানুষ অহনির্নিশ যুরিয়া বেড়াইতেছে? মানুষ কি চায়? সুখ। সুখ পাইবার জন্যই মানুষ সর্বদা ব্যস্ত। আমরা লেখাপড়া করি, আমরা ধন উপার্জন করি, আমরা ঈশ্বরারাধনা করি, আমরা যাহা করি তাহার শেষ লক্ষ্য সুখ। এমন কি সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হইয়া যাইতেছেন তিনি যে সুখ তাচ্ছল্য কবিত্তে পারিষাছেন তাহা নহে, সংসারে তিনি সুখ পাইলেন না, নুতন ক্ষেত্রে সুখ অন্বেষণই বহির্গত হইলেন। এই সুখের জন্যই মানুষের সুখ নাই। সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া দিন নাই রাত্র নাই মানুষ হাহা করিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কয়জনের প্রতি সুখ প্রসন্ন! এই প্রশ্ন পণ আরাধনায় কয় জনের নিকট সুখ দেবী আবির্ভাব হইয়াছেন? এ সংসারে ভক্তের প্রতি বাম কে! কায়মনো চিত্তে অড়কে আরাধনা কর তাহাকেও আগাইতে পারিবে—দেবতার কি কথা!

সংসারের গতিই এমন নহে যে স্বার্থ প্রেম স্বার্থ ভক্তি উপেক্ষিত হইবে। তবে কি সুখের সম্বন্ধে পৃথিবীর গতি উজান বহিয়া চলিতেছে? নহিলে সুখদেবী ভক্তের প্রতি এতই বিরূপ কেন? না সুখের সঙ্গে, আমরা প্রকৃত পক্ষে সুখ খুঁজি-

তেছি না, আমরা সুখের অন্বেষণে যে পথে চলিতেছি তাহা বিপথ। দূর হইতে সুখ দেবী আমাদের ভ্রম দেখিয়া ব্যথিত পরাণে নিশ্বাস কেলিতেছেন, ভক্তের মন-স্কামনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু কি করিবেন তিনিও প্রকৃতির অধীন। বিপাক ভ্রমণকারী ভক্ত-দিগকে দেখা য়ে

আমরা, —

বর্ষণ ১০ এতদর আর উপায় নাই। সুখের প্রকৃত পথ নীতি। প্রকৃতির অতি-মুখী গতিব নামই নীতি। প্রকৃতির গতির সঙ্গে সঙ্গে চলিলে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না—আমি প্রকৃতির গতির বিপক্ষে চল, প্রতিপদে তোমার নিশ্চয় পতন পড়িয়া রহিয়া য়। নৈতিক পথ দিয়া চলিলে নিঃসন্দেহ আমরা সুখে ধরিতে পারিব।

প্রকৃতির বিমুখে চলিতে প্রকৃত পক্ষে কাতারো সাধ্য নাই। মানুষ দুর্বল, প্রকৃতি মহাবল, তাহার বিপক্ষে লড়িয়া কি তুমি জয়ী হইবে? এ সংগ্রামে বল প্রয়োগ মাত্রই তোমার সার। প্রকৃতির বিপক্ষে এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে তোমার পতন হইবে এবং পতনের আঘাত ব্যতী তোমার সেই চেঁচান পুরস্কার। বেলায় বনের সহিত তুমি বিমুখে বাইতে

করিবে সেইরূপ সবলে প্রকৃতি তোমাকে ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিবে, সেই পরিমাণে তোমার যত্ননা সহিতে হইবে। সূক্ষ্মদর্শী আ-
র্থাগণ প্রকৃতির এই অদম্য অতি সূক্ষ্ম নিয়ম দেখিয়া মানুষের পূর্ব জন্মের সহিত পর জন্মের কর্ম সূত্রের বন্ধন অনিবার্য্য মনে করিয়া গিয়াছেন।

পুনর্জন্ম থাক আর নাই থাক, পূর্ব-
জন্মের কর্মফল পরজন্মে বর্তাক্ আর নাই
বর্তাক্, কর্মফল যে অখণ্ডনীয় তাহা আমরা
এই জীবনেই প্রতিপাদ দেখিতে পাইতেছি।
প্রকৃতির পথ লঙ্ঘন করিতে গেলে প্রকৃতি
তোমাকে ক্ষমা করিবে না—প্রকৃতি বড়
কঠিন বিচারক। যাইবামাত্র
প্রতিপদে তোমাৎ জোর করিয়া ধরিয়া
লোজপাথে ফিরাইতে চেষ্টা করিবে, আর
প্রকৃতির অভিমুখে চল—সুখে চলিয়া যা-
ইতে পারিবে। এ কথা সকলেই জানে—
ইহা একটি অতি সামান্য সত্য, ইহা কাহা-
কেও বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিবার আব-
শ্যক নাই। অথচ সেই জনাই বা ইহা
সকলে গত ভুলিয়া যায়, এই সামান্য সত্যকে
মনে করিয়া কাজ করা লোকে আবশ্যকই
মনে করে না,—যেন ইহা আপনা হইতেই
সাধিত হইবে। দেশের উন্নতির দিকে
অর্ধাৎ দেশের লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা
বর্ধনের দিকে সকলেই লক্ষ্য পড়িয়াছে।
বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য গ্রামে
গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, গ্রামিক
গ্রামবাসিন্দার প্রতি লোকের মনোযোগ
পড়িতেছে—অথচ দেশে বাহ্যিক এই সকল

শিক্ষার প্রকৃত ফল জন্মিতে পারে—তাহার
জন্য যে বিশেষ যত্ন হইতেছে এরূপ দেখা
যায় না। বালক বালিকার নীতিশিক্ষা
যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা হৃদয়ঙ্গম
করিয়া ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে
সকলে যথোপযুক্ত উদ্যোগ করিতেছেন
না। মানুষ বিদ্যা বুদ্ধিতে সম্যক যশস্বী
হইলেও যতক্ষণ তিনি নীতিনন্দন না
হয়ন—ততক্ষণ তিনি যথার্থ পক্ষে মানু-
ষের পদবীতে উঠেন না, সমাজের আদর্শ
হইয়া, সমাজের যথার্থ উপকার সাধন ক-
রিতে পারেন না। মানুষ হইতে গেলে
এক দিকে বুদ্ধির মার্জনা যেমন আব-
শ্যক, আর এক দিকে নীতির অজুহা
হওয়া, তাহা হইতে যদি অধিকতর না হয় ত
সমান আবশ্যক; নীতিই মানুষ হৃদয়ে
মহুয্যত স্থাপন করে, নীতিই মানু-
ষকে সংসারের দুঃস্বপ্ন পথ দিয়াও সহজে
গম্যালিকে লইয়া যায়। যদি বাঙ্গালী
জাতিকে মানুষ করিতে হয় তবে অন্য
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাদিগকে
প্রকৃতরূপে নীতি শিক্ষা দেওয়া অতি বিশেষ
আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষা
দাও সেই শিক্ষা মনে অতি দৃঢ় হইয়া বসে,
বালক বালিকাদের কোমল মন ধারণ
হাঁচে ঢাল—সেইরূপ আদর্শ প্রাপ্ত হয়।
বাল্যকাল হইতে যতদিন পর্যন্ত আজকাল
বিদ্যাশিক্ষা চলে, সেই সমস্ত সময় যদি
বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা
দান। মনোবোধ্য বিষয় শক্তির সম্যক
কৃতি বর্ধন করা যায়—তবে পরে এর

ভাব কখনোই জন্ম হয় নাই—সহজে চলিয়া যাইবার নয় ।

পুরাতন আখ্যাগণ নীতিই সভ্যতার মূল বলিয়া জানিতেন । তখন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া সকলেরই যে শিক্ষাতে সময় অতিবাহিত করিতে হইত—সে শিক্ষা কেবল বিদ্যা শিক্ষা নহে । আখ্যাগণের বিদ্যা, জ্ঞান সমস্তই নীতির সহিত এমন দৃঢ় রূপে জড়িত ছিল যে একটি ছাড়িয়া আর একটি লাভ করা যাইত না । সেই জন্যই আখ্যাগণ অসাধারণ দ্রুতি হইয়াছিলেন ।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে পূর্বে নামের যোগ্য করিতে যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে তবে এখনকার অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর নূতন সংস্কার অবশ্যই করিতে হইবে । এখন সাধারণতঃ কিরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে ? বালকদিগকে স্কুলে দিতে পারিলেই সাধারণতঃ পিতার কর্তব্য কৰ্ম পালন হইল । (আমরা এখানে নকল পিতার কথা বলিতেছি না ।) তাহার পর মাঝে মাঝে যদি পিতা, পুত্রকে পাঠ্য পুস্তক হইতে একবার পরীক্ষা করিলেন—একবার পড়া বলিয়া দিলেন, পড়া না পারিলে গাড়া ঘোড়া চড়িতে পারিবে না বলিয়া ছুটা উপদেশ দিলেন ত খেতে । পুত্রের স্বভাব গঠনের দিকে বাল্যকাল হইতে দৃষ্টি রাখা, স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, কথায় বার্তায় দৃষ্টান্তে উপদেশে পুত্রের স্বাভাবিক সুশিক্ষা বিধান করা—এ কৰ্ম্ম জন পিতা করিয়া থাকেন ? আমাদের বিদ্যাবৈরাগ্য এরূপ শিক্ষা রাসকে

কি পায় ? মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতির নিকট হইতে বংশাবলীর গল্প, উপকথা, বিবাহ ইত্যাদি সাংসারিক কথা যাহা শোনে তাহার মধ্যে যদিও বালকদের উপযুক্ত চরিত্র গঠনোপযোগী অনেক উপকরণ থাকে—কিন্তু তুংগের বিষয় এই, এই গল্পের ছলে মহিলাগণ যে উপদেশের কথা কহেন—সে উপদেশ তাঁহাদের নিকট হইতে ছুই পা না সরিতেই বালকেরা ভুলিয়া যায় । বালক জন্মেও উপদেশ বদ্ধমূল করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, ইহাতেও প্রচুর নিপুণতা ও অধ্যবসায় চাই ।

উপদেশ দাতার জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাহার উপদেশ বালক বালিকাদের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উদ্ভূত করিতে পারিবে কেন ? কিন্তু এখনকার কয়জন মহিলা সেইরূপ সুশিক্ষিত হইতে পারিয়াছেন যাহাতে সে কথা তাঁহাদের সম্মানগণ অবশ্য পালনীয় বলিয়া তাহাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিবে ।

প্রকৃত পক্ষে ইহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাওয়া যায় । বালকগণ কিছুদিন স্কুলে পড়িয়া যে জ্ঞান উপার্জন করে তাহার আত্মীয় মহিলাদের ভিতর ততটুকু জ্ঞানেরও অভাব দেখিতে পায়—এবং ক্রমে ক্রমীলোকদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যতই তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে ততই তাঁহাদের উপদেশের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমিয়া যায় । কেবল সাংসারিক বিষয়ে যাহা ক্রীলোকদের কথা শোভনীয় করে

তাহাদের এই বিবেচনা জন্মে। এইরূপ অবস্থায় স্কুলের ও তাহার চারি পাশের জল বায়ু হইতেই উপযোগী উপাদান টানিয়া লইয়া বালকগণ মাত্ৰ হইতে থাকে। প্রকৃত যুবা না হইতে হইতে কলেজ ছাড়িতে না ছাড়িতে খ্যাতনামা ইয়োরপীয় পণ্ডিতদিগের মতগুলি ইহাদিগের কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে মিল, স্পেনসারই এখনকার নবা সম্প্রদায়ের বিশেষরূপ পূজ্য দেবতা। কিছুদিন পূর্বে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে ফরাসী দার্শনিক কমটি একরূপ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতাপ এখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—আজ কলি মিল, স্পেনসারেরই প্রাচুর্য কাল।) কিন্তু একরূপ অপরিপক্ব বয়সে ওরূপ পণ্ডিতদিগের কথার গভীর মর্ম তলাইয়া বুঝা বড় সহজ নহে। তাহা কণ্ঠস্থ হওয়া মাত্র অনেকের সার হয়, গলাধঃকরণ হইতে পায় না। তাহাদের কোন একটি কথার মর্ম বুঝিতে হইলে তাহাদের প্রণীত সমুদয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডুবিয়া তবে তাহা বুঝিতে হয়। এক জন হয়ত তাহার এক পুস্তকে এক বিষয় সম্বন্ধে এক কথা বলিলেন অন্য পুস্তকে সে বিষয়ের আর এক কথা বলিলেন, এই দুইটি কথা না মিলাইয়া দেখিলে সে বিষয় সম্বন্ধে তাহার বথার্থ মত কি তাহা জানিতে পারা গেল না—কিন্তু একরূপ তলাইয়া পড়িতে কয় জন বুদ্ধ লোক অবকাশ পাইয়া আসিয়াছেন যে যুবা বালকেরা তাহার রাবি রাশি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে, তাহা করিতে সমর্থ হইবে? হই এক খান

পুস্তকের মাঝে মাঝে চোখ বুলাইয়া পণ্ডিত মাষ্টার এবং আলাপী বড় লোকের নিকট তাহাদের পুস্তক সম্বন্ধে হই চারিটি কথা অনিয়াই সাধারণতঃ যুবকগণ ইয়োরপীয় পণ্ডিতদিগের মতামত মারিয়া লইয়া থাকেন। এ অবস্থায় যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়া থাকে। সেই পণ্ডিতেরা যাহা বলেন নাই, অনেক সময় তাহা বলিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয়। হয়ত বা যাহার বিপরীত বলিয়াছেন তাহাই তাহাদের মত বলিয়া গৃহীত হয় এবং তাহাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া সেই মত অবলম্বনে জীবনের গতি নির্ণীত হইয়া থাকে। এইরূপে কেহ নাস্তিক হইয়া নির্দোষ আন্তিকদিগের কুপাচক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন কেহ বা ইউটিলিটেরিয়ন অর্থাৎ ফলবাদী হইয়া তাহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া সমস্ত নীতির ভিত্তি উলটাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন।

হৃদয়ের জন্যই হৃদয়কে তাহার স্বপ্ন করেন না—তাহাদের কাছে হৃদয়ের অন্যরূপ আদর্শ হইয়া পড়ে, এবং ইহাতে ক্রমে ভারতবর্ষীয় জাতিগত নৈতিক বাধুনি তাহাদের হৃদয় হইতে শিথিল মূল হইতে থাকে। যুবা বয়সে যখন মনের ক্ষুধা, উদ্যম, উৎসাহ সত্ত্ব থাকে, তখন মাত্ৰ তাহার জীবনের প্রকৃত পথে চলিতে পারিলে কেবল আপনার কাজ নয় দেশেরও বথার্থ কাজ করিতে পারে। কিন্তু সেই যুবা বয়সে যদি মন বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহা হইলে

সেই যৌবন স্মৃতি উদ্যমের আশাহরূপ ফল কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে যখন বৃদ্ধি পরিপক্ব হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, নানা প্রকারে বহুদর্শীতা লাভ হইয়া মনের স্মৃতি অবস্থা ফিরিয়া আসে, তখন নিজের পূর্বকৃত ভ্রম নিজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন সময় চলিয়া গিয়াছে—আর সে উদ্যম নাই, আর সে উৎসাহ নাই, চারিদিকের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নূতন জ্ঞান অস্থানারে কাঁচিয়া নূতন ক্ষেত্রে কাজ করিতে তখন আর পারিয়া উঠা যায় না, হয়ত বা পারিলেও তখন আর অবসর পাওয়া যায় না—হয়ত বা অবসর পাইলেও তাহাতে তেমন কাজ হয় না।

নব্য সম্প্রদায়দিগের এই মানসিক বিকার অবস্থা দেখিয়া অনেকে দুঃখ করেন—অথচ প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করেন না। তাঁহাদিগের ইহাতে দোষী করিয়া থাকেন অথচ দোষের মূল উৎপাতন করেন না। বাস্তবিক পক্ষে দোষ তাঁহাদের নহে, দোষশিক্ষার। মানুষ অবস্থার দাঁস, বালক-কাল হইতে সমাজ বালকদিগকে যে অবস্থায় ফেলিয়া যে ছাঁচে গঠিত হইতে পাঠাইতেছে সেইরূপই তাঁহারা হইয়া আসিতেছে, ইহাতে সমাজ আবার কোন বিবেচনায় তাঁহাদিগকেই দোষী করিতে চায়।

এইত গেল পুরুষদিগের কথা। বঙ্গ মহিলাদিগের অবস্থা ইহা হইতে ভিন্ন। বাল্য-রহস্য অতিক্রম করিতে না করিতে সাধারণতঃ বিবাহালায়ে বিবাহিত হইল, শতাব্দীর গিয়া

গৃহাদি কার্যে বাপুত হইল, অনেকগুলি পুরাতন ভাল ভাব প্রাচীনা মহিলাদিগের নিকট শিক্ষা পাইতে লাগিল। পতিই রমণীর গতি, পিতা মাতা শত্রু, স্বাণ্ডি, গুরু-জন, ইহারা দেবতুল্য, ইত্যাদি রমণী প্রতিপাল্য অবস্থা কর্তব্য কতকগুলি উচ্চ কার্যের ভাব তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইল—অল্প বাঙ্গালা বাহা শিখিয়াছে তাহাতে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া এই সকল শিক্ষা আরো মনে দৃঢ় হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু বিপরীত শিক্ষা (পাশ্চাত্য) হইল না যাহাতে তাঁহাদের এ সকল ভাব মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায়। এইরূপে এক হিসাবে ধরিতে গেলে বিদ্যা শিক্ষা না করিয়াও পুরুষ অপেক্ষা কলকামিনীগণ যথার্থ কতকটা সুশিক্ষা পাইয়া থাকেন—কিন্তু এইখানে একটি কথা, রীতিমত পাশ্চাত্য শিক্ষা না পাইলেও কালের গতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাব কতকটা যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সবেও উপরোক্ত কারণে তাহারও ততটা কুফল হইতেছে না, পুরাতন নীতিভাবের আদর্শ তাঁহারা একেবারে হারািয়া ফেলিতেছেন না। কিন্তু এই নীতি শিক্ষা হইতে যত দূর সফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির অস্থূলনা না থাকায় তাহা দেখা যাইতেছে না।

কোমলতা নম্রতা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা দয়া ময়া ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা এই সকল গুণের গুণ যজ্ঞবাল্যর আত্মীয় সম্পত্তি। এই

সকল গুণ লইয়াই বঙ্গবাল্য জন্মগ্রহণ করে। কোন রূপ শিক্ষার (যাহাকে সচরাচর শিক্ষা বলে) আবরণ ইহার উপর নাই। স্বাভাবিক খাঁটি সরল সৌন্দর্য্য যদি দেখিতে চাও ত বঙ্গবাল্যের হৃদয়ে দেখিতে পাইবে। ইহাতে শিক্ষার (কুশিক্ষার) কৃত্রিমতা নাই, সভ্যতার (পাশ্চাত্য) মৌখিকতা নাই। ইহার বাহিরে এক ভিতরে এক নাই। বঙ্গবাল্যের হৃদয়ের অশিক্ষিত সৌন্দর্য্য অতি সরল মধুময়। যাহারা কৃত্রিম চাকচিক্য দেখিয়া মোহিত হন এ সৌন্দর্য্য তাঁহার জন্য নহে, যাহারা প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য্য চাহেন—ইহার রমণীয়তা তাঁহারা ই বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গ মহিলাদিগের এই স্বাভাবিক গুণসকল যদি সুশিক্ষার দ্বারা মার্জিত করা যায় তবে ইহাদের সৌন্দর্য্য আরো কত ফুটিয়া উঠিবে—রূপ আরো কত খুলিয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া বঙ্গ মহিলাদের সবই কি গুণ দোষ কি কিছুই নাই? আছে। মানব মাত্রেই অসম্পূর্ণ। সুশিক্ষার দ্বারা ইহাদের স্বাভাবিক গুণ সকল যেমন ফুটিতেছে না তেমনি দোষ সকলও নির্মূল হইতেছে না। ইহাদের দোষ গুলিও শিক্ষার অভাবে তেমনি বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। তবে গুণের তুলনায় দোষের ভাগ ইহাদের অল্প। গুরুতর দোষ, যুগ্ম প্রবৃত্তি বঙ্গ বাল্যের স্বভাবে সাধারণতঃ বিরল, বুদ্ধি বিবেচনার অভাবই ইহাদের সাধারণ দোষ—বুদ্ধি বুদ্ধির অল্পশীলন নাই বলিয়াই একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গ পরিবারের

মধ্যে সচরাচর এইরূপ দোষ দেখা যায়— একজন দাসী আসিয়া বড় বৌকে বলিল “দেখ মা ছোট বৌএর ছেলে আর আমার দের গোকা বাবুতে মারামারি করেছে, আহা ছেলেকে ত এমন মারেনি—ছোট বৌ গেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছে—বলব কি মা—ছেলেকে ছাড়িয়ে নেবে তা না— আমি ছাড়িয়ে দিয়ে বলুম—যে ছোটগিন্নি দাঁড়িয়ে দেখছে তা ছেলেকে কিছু কি বলতে নেই—তাতে বলে কি ছেলের ছেলের মারামারি করবে তা আমি আর কি বলব” বড়বৌ শুনিয়া পর্য্যস্ত ছোটবৌএর সহিত কথা বন্ধ করিলেন, বাস্তবিক কি হইয়াছে একবার যাচাই করিলেন না, দাসীর কথা কত দূর সত্য মিথ্যা একবার বিবেচনা করিলেন না—হয়ত সেই দিন হইতে ছোটবৌতে তাতে মুণ দেখা দেখি রাহিল না—এবং শেষে এই এক ক্ষুদ্র কারণ হইতে হয়ত অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইল। জ্ঞান বুদ্ধির অল্পশীলন দ্বারা যদি বিবেচনা শক্তির ক্ষুণ্ণি লাভ করা যায়—তাহা হইলে একরূপ ঘটিতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি অতুলনীর হৃদয় লাভ করিয়াও বুদ্ধি বিবেচনার চর্চ্চার অভাব হেতু বঙ্গ রমণী এখনো অবোধ অবলা নামের বাচ্য। অতঃপর ইহারা স্বামী পুত্র পরিবারকে হৃদয় দিয়া স্থগী করিতে পারেন কিন্তু জ্ঞান দিয়া সন্তানদিগের মনের স্বার্থ শিক্ষা বিধান করিতে অপারক—বাহিরের হানিজনক আকর্ষণ হইতে নিজ বুদ্ধি বলে সন্তানদিগকে স্বপথে টানিয়া রাখিতে অপারক।

আজ কাল এই অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় অনেকে নিজ নিজ স্ত্রী কন্যাদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ শিক্ষিত মহিলাদিগের মধ্যে অনেক সময় যেরূপ শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যথার্থ শিক্ষা নহে শিক্ষার ভাণ মাত্র।

একটু ইংরাজি ভাষা শিখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃত্রিমতা, বাহিরের চাকচিক্য অসার ভাব গ্রহণ করাইতে অনেক সময় এ শিক্ষার পরিণাম হইয়া দাঁড়ায়। আর বাস্তবিক পক্ষে যদি ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে সে শিক্ষা শিক্ষা বলা যাইতে পারে না তাহা কুশিক্ষা। এ শিক্ষায় দেশীয় মহিলাদের বোমলতা নম্রতা প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাব গিয়া অনেক সময় কেমন বিদেশীয় খট খটে ভাব আসিয়া স্ত্রীলোকের বিশেষ সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। বঙ্গ রমণীগণ তাঁহাদের সুন্দর হৃদয় বিকৃত শিক্ষার ফলে যে হাটাইয়া ফেলিবেন—কৃত্রিম সভ্যতা আশ্রিয়া তাঁহাদের সরল ও প্রাণ যে কৃত্রিম করিয়া ফেলিবে, ইহা কখনোই বাঙালীয় নহে। আমরা দেশের একজন অশিক্ষিত রমণীর (পাশ্চাত্য শিক্ষারূপাঙ্গীগণ—যাহাকে অশিক্ষিত বলিবেন) সহিত কথা কহিয়া তাঁহার প্রাণ খোলা কথায় বার্তায় প্রাণে কতখানি আশ্লাদ চালিয়া দিবে আর লভ্যতার সেই মৌখিক হু এক কথা কাহার প্রাণ স্পর্শ করিবে? সেরূপ কথা সেরূপ আলাপ পাশ্চাত্য সভ্য সমাজেই আদরণীয়, পাশ্চাত্য সমাজেই উপযোগী—কেন না সেখানে স্ত্রীপুরুষ মিশিতে হয়। এখানে

স্ত্রীপুরুষে মিশিবার স্থলে হয়ত সেইরূপ সভ্যতার আলাপ আবশ্যক হইয়া পড়িবে—কিন্তু স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ওরূপ ভাব এখনো আমাদের কাছে বড়ই কেমন কেমন ঠেকে।

একজন বাঙ্গালীর মেয়েব আর একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর মেয়েব সহিত দেখা হউক সে তাহার সহিত বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিবে—সে তাহাকে ভগিনী ভাবিয়া কথা বার্তা কহিবে, তাহার সহিত খোলা প্রাণে খোলা ভাবে গল্প করিবে, তাহার দুখে সুখে বাস্তবিকই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিবে—সে তাহাকে আপনার করিয়া লইবে। বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালির মেয়েকে পরভাষিতে জ্ঞানেনা, ভগিনী ভাব তাহাদের হৃদয়ে স্বতঃ উদ্ভাসিত—এ ভাব তাহাদের শিক্ষা দিতে হয় না। এই ভাবের আধিক্য হেতু এবং বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাব চালিত না হওয়ায়, অনেক সময় বরঞ্চ হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। বড় ভয় হয় গোছে শিক্ষায় ইংরাজ প্রাণের এই সরলতা টুহ হারাইয়া ফেলেন, আর তেমন উদার ভাবে অন্য ভগিনীদের আলিঙ্গন করিতে না পাবেন শিক্ষায় তাঁহাদের প্রাণ পাছে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আর যদি শিক্ষার ইহাই ফল হয় তবে সে শিক্ষা হইতে অশিক্ষাই ভাল।

যে শিক্ষায় শুধু সকল কুটিয়া উঠিবে, দোষ নিমূল হইয়া যাইবে, প্রাণকে উদার করিবে, হৃদয়কে মহান করিবে—তাহাই বখার্ব শিক্ষা। বখার্ব শিক্ষা হইলে আত্ম-

নার ক্ষুদ্র প্রতিপদে বুঝা যায়, আর অল্প শিক্ষাতেই হৃদয় গর্কিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণে অহঙ্কার হৃদয়ে থাকিতে পাবে না—জ্ঞান দেখাইয়া দেয়—দেখ তুমি কিছুই জান না, কিছুই বোঝ না, কেন না যাহা জান তাহা কি সামান্য, যাহা জান না তাহা অসীম। আমাদের দেশে বহু শাস্ত্র বিশারদ একজন মাননীয় পণ্ডিত সেদিন একজন বালককে বলিয়াছিলেন—আমি তোমার চেয়ে জ্ঞানী কিসে? তুমি খানা বেশী বই পড়িয়াছি বলিয়াই কি আমি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী হইলাম?

একথা কত মহান শিক্ষার ফল—কত উদার হৃদয়ের কথা? যথার্থ জ্ঞানী লোকেই ইহা বুঝিতে পারেন ইহা বলিতে পারেন।

অগভীর অল্প শিক্ষার অপকারিতা স্ত্রী পুরুষ উভয়েতেই বর্তায়। তবে পুরুষগণের কার্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, নানা লোকের সহিত মিশিয়া কথা কহিয়া ঠেকিয়া তাহাদের প্রথম শিক্ষার কুফল কালে অনেক ঘুচিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মন একে কোমল বাহা তাহাদের শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই মনে বিশেষ করিয়া আঁটিয়া বসে তাহার পর তেমন অবস্থাতে পড়িতে হয় না বাহাতে পরে সেই শিক্ষার দোষ বুঝিয়া নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। যদি স্কুলরীণ গর্কিত হইয়া না উঠেন—ত আরো একটি কথা এই যে, যে দ্রব্য যত অধিক স্কুলের তাহাতে অল্প মাত্র কল-কলই অধিক অশোভনীয়। সুতরাং পুরুষ-দিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে দোষ-

হীন দেখিতে সকলেরই বেশী ইচ্ছা হয়। এই জন্য যদি মহিলাদের শিক্ষা দিতে হয় ত যথার্থ এমন সুশিক্ষা দাও যাহাতে হৃদয়ের গুণের সহিত জ্ঞান বুদ্ধি সকলেবই মার্জনা হইতে পারে। নহিলে কুশিক্ষার ফলে ইচ্ছা বৃদ্ধির বাব হইতে পারেন। যে উৎকৃষ্ট হৃদয়ের জন্য ইচ্ছা সকলের ভক্তিজাজন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে সে হৃদয় হারাইবার সম্ভাবনা—তার ওরূপ শিক্ষায় জ্ঞান বুদ্ধির যে বিশেষ উৎকর্ষ সাবিত হইবে সে আশাও নাই। এ অবস্থায় না হৃদয় দিয়া—না বুদ্ধি বিবেচনায় তাহার পরিবর্তনের ও নিজের উপকারে আঁসিতে পারিবেন।

স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার প্রতি দেশে যে একেবারে লক্ষ্য দেখা যায় না তাহা নহে। ~~এক~~ মহিলাগণ পুরুষদিগের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লইতে আগ্রহ করিয়াছেন। ইহা দেশেব কম গৌড়াগোর কম গোরবেব বিষয় নহে। অতি অল্প দিনমাত্র সুসভ্য ইয়োরপীয় মহিলাগণ এই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী হইয়াছেন।

কিন্তু এই আহ্লাদে মত্ত হইয়া আমরা যেন ইহার আর একদিক দেখিতে না ভুলি। ইহা উচ্চ শিক্ষা হইলেও ইহাকে বে সম্পূর্ণ সুশিক্ষা বলা যায় না তাহা আগেই বলা হইয়াছে। পুরুষ দিগের শিক্ষা প্রণালী ও ইহাদের শিক্ষা প্রণালী একই, সুতরাং সে শিক্ষার যে অভাব রহিয়াছে সেই অভাব সেই অতাব রহিয়াছে। সেই অ সম্পূর্ণ শিক্ষার গুণে দু'দিকের মনে-বুদ্ধির বিকল।

অবস্থা ঘটে—যুবতীদেরও তাহা ঘটিতে পারে। আর তাহা হইলে কত অধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা ভাবিয়া দেখিলে নীতি শিক্ষার বিশেষ উপায় করা যে কত প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারিব।

যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে মানুষ্য করিতে হয়—তবে বালক বালিকাদিগের শিক্ষাদিকে দৃষ্টিপাত কর, যাহারা এখন

বালক বালিকা তাহারাই ভাবীবংশের পিতা মাতা।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়া বালক বালিকাদের বুদ্ধিরূপিত ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে যখন ফুটিয়া উঠিবে, আমাদের বংশ এক সঙ্গে যখন বুদ্ধিশীল ও নীতিশীল হইতে পারিবে—তখনই দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে—ভারত-বর্ষ প্রকৃত সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবে।

—:—

জনফ্র্যাটমিল।

মিল পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে একজন সংকুলোদ্ভবা, রূপলাবণ্যসম্পন্ন প্রয়োবিশ্ববয়সী মহীয়সী গুণবতী রমণীর সহিত বন্ধুবন্ধুরে আবদ্ধ হইলেন। এই বন্ধুত্ব ইহার জীবনের ও হৃদয়ের উন্নতির মূলভূত কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। এষ্ট অসীমগুণ সম্পন্ন রমণী মিষ্টর টেলরের ভাৰ্জা ছিলেন। যিনিই এই রমণীকে দেখিতেন, তিনিই ইহার বুদ্ধি বৃত্তির প্রাচুর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতেন ও ইহার মধুর আলাপে প্রীতি লাভ করিতেন। ইহার স্বামী মিষ্টর টেলর একজন উদার স্বভাব বিশিষ্ট, মাননীয় ও সংপ্রকৃতিপন্ন লোক ছিলেন, ও নিজ সহ-প্রাণীকে অভিশয় ভালবাসিতেন, ইহার সহিত ইহার প্রাণীমুগ্ধতা অমুরাগিনী ছিলেন। মিল এই বালিকার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আনন্দ হইয়া অবধি ইহার শতমুখে

প্রশংসা করিয়াছেন, ইহার সম্পর্কে মিলের হইয়াছে একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম।

“Her fiery and tender soul and her vigorous eloquence would certainly have made her a great orator, and her profound knowledge of human nature and discernment and sagacity in practical life, would, in the time when such a career was open to women, have made her eminent among the rulers of mankind. &c.”

মিল বলিতেছেন যতদিন এই রমণী স্বামীর অধীনে ছিলেন, ততদিন ইনি ইহার প্রথম ও উদার ধীশক্তির সম্যকরূপ পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়া নাই, কারণ, যদি তাহার স্বামী উদার প্রকৃতির লোক হিত

তদ্রূপ বিদ্যার উন্নতি ও রচনা বিষয়ে যে রূপ উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল, সেক্ষেপ উৎসাহ ও স্বাধীনতা দেন নাই। মিল কর্তৃক এই রমণীর ধীশক্তির ক্ষমতা সমাক্রমে অনুভূত হইয়াছিল, এবং পরস্পরে সত্ততই অবকাশক্রমে আপনাদিগের মতামত ব্যক্ত করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির চাণন্যদ্বারা উভয়েই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

এই মহতী বালিকার হৃদয় কোন প্রকার কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না, ইহার হৃদয় স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতাগুণে সত্ততই অলঙ্কৃত, ও ইহার হৃদয়ের ওদার্য্য সর্বত্র সর্বদা সময়ে সমভাবে প্রকাশ পাইত।

উপরি উক্ত গুণসম্পন্ন রমণীর সহিত বন্ধুত্ব পুত্রে আবদ্ধ হইয়া মিল যে কত সুখী ও উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য, মিল বলিতেছেন, "What I owe, even intellectually, to her, is in its detail, almost infinite." সে যাহা হউক এখন আমরা মিলের কার্য্য বিষয়ে মনোযোগী হইব, পশ্চাৎ ইহার বিবাহ সম্বন্ধে যথা সময়ে আলোচনা করা যাইবে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি "Considerations on Representative Government," "Essays on unsettled Questions in political Economy," "Papers on corporation and church property and the currency Juggle," "Thoughts on poetry," "Analysis of Platonic Dialogues"

যদিও এই কয়টি ও অপরাপর বহুলংঘ্যক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মিল "টকেভিলের "Democracy in America" নামক গ্রন্থখানি পাঠ ও তাহার একটি উপযুক্ত সমালোচনা করেন।

কিয়দিবসের মধ্যেই তাঁহার পিতার "Fragment on Mackintosh" নামক পুস্তকখানি বাহির হয়, মিল গ্রন্থখানির কিয়দংশের যথেষ্ট প্রশংসা করেন বটে কিন্তু সমস্ত পুস্তকখানি তাঁহাকে স্মৃতি করিতে পারে নাই, মিল বলিতেছেন "Although I greatly admired some parts of it, I read as a whole with more pain than pleasure"। মিল এই সময়ে "Civilisation" নামক একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহার পিতা এই প্রবন্ধটি পাঠে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন ও পত্রকে যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান করেন।

কিন্তু - হায় মিলকে আর অধিকদিবস পিতার সহিত অলাপ করিতে হয় নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে আরম্ভ হয় ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে তেইশে তারিখে এই মহাশয় ৩১ মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার সেই উদার ধীশক্তির কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি আপনাকে অগতের উপকারক জ্ঞান করিয়া পূর্ণ শান্তিতে অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন হইলেন, তাঁহার আক্ষেপ এই যে আরে ! কিছু কাল জীবিত থাকিলে অগতের অধিকতর উপকার সাধনে সক্ষম হইতেন, তাহা আশা পারিলেন না।

এতদিন পরে নির্দেশ প্রদানে একটি প্রবন্ধ

তর আঘাত লাগিল, আচ্ছ তিনি এই পৃথিবী হইতে তাঁহার একমাত্র বন্ধুকে হারাইলেন, স্বার্থভরা, হিংসক মানববেষ্টিত এই পৃথিবী খণ্ডে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে আর কেহই রহিল না, এখন তিনি এই সুদীর্ঘ জীবনপথ অতিক্রম করিতে একেলাই রহিলেন, এজগতে যাহাকে হারাইলেন আর তাঁহাকে কোথাও পাইবেন না ।

এই সময়ে মিল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইটালি যাত্রা করিলেন, পরে ইহার একত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পুনর্বার তিনি তাঁহার “লজিক” নামক গ্রন্থখানি পরিবর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করেন ও অবকাশ ক্রমে তৎকালীন বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহ পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন । এই সময়েই তিনি ফরাশিশ দার্শনিক “কম্টিয়” “কুর্ ডে ফিলসফি পসিটিভ” নামক গ্রন্থখানি বিশেষ যত্ন সহকায়ে পাঠ করেন । এই গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ অংশ যদিও তাঁহার মতের সহিত ঐক্য হয় নাই, তথাচ ইহা দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন, ও গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করেন । এখন হইতে তিনি “কম্টিয়” অতিশয় ভক্ত হইলেন ও তাঁহার সহিত পত্রাদি লেখা আরম্ভ করিলেন । যে পর্য্যন্ত না তাঁহা-দিগের পরস্পরের মতের বিশেষ অনৈক্য উপস্থিত হয় সে পর্য্যন্ত এইরূপ পত্রলেখা-লোপিত চলে, তৎপরে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়, মিল লিখিতছেন I was the first to slacken correspondence ; he was the first to drop it” এই সম-

য়েই তিনি “কারলাইলের” ফরাশিশ বি-দ্রোহ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির সমালোচনা করেন ও কোলরিজের রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন । মিল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার “লজিক” গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ড সমাধা করেন, ও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের “এপ্রিল” মাস হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত “লজিক” খানির আদ্যোপান্ত যথোপযুক্ত শোধন ও পরিবর্তন করেন । এই ধারা অবলম্বনে মিল গ্রন্থরচনা করিতেন । কোন একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইলে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিবেন তাহা ভাবিয়া লইতেন ও তৎপরে সেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিতেন । দ্বিতীয়বার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া যে কথাটি সেখানে বসানো উচিত ছিল সে কথাটি সেইখানে বসাইতেন, কতকগুলি কথা বা উঠাইয়া দিতেন ও তৎপরিবর্তে আর কতকগুলি পরিষ্কাররূপে ভাবব্যক্ত করী কথা সন্নিবেশিত করিতেন, এইরূপে একটি প্রবন্ধ লইয়া অনেকবার না দেখিয়া সহগাই মুদ্রিত করিতে দিতেন না, ইহা দ্বারা রচনা সম্পর্কে ইহার যথেষ্টই উপকার হইয়াছিল । ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষে “লজিক” নামক গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়া মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত “মিষ্টার জন মরেকে” পাঠাইয়া দেন, “মরে” পুস্তকখানি মুদ্রিত না করিয়া কিছু দিন পরে মিলের নিকট ফিরাইয়া পাঠাইলেন, ইহাতে মিল কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েন নাই, পরে তিনি মিষ্টার “পার্করের” নিকট পুস্তকখানি পাঠাইলেন, ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করেন ।

কিয়দ্বিস গত হইলে মিল গুটিকতক বিশেষ পরিচিত, বিদ্বান, ও বুদ্ধিমান মিত্রকে লইয়া একটি ছোটখাট সমিতি স্থাপনা করিলেন, ইহা দ্বারা সকলেই বিশেষ উপকৃত হয়।

একণে মিলের জীবনের তৃতীয় অঙ্ক আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, প্রথম অঙ্কে আমরা মিলকে পিতার অধীনে অতি-শয় যত্ন ও আগ্রহ সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়নে সত্তত নিবিষ্টমনা দেখিয়া আসিয়াছি, সে সময়ে পিতাই তাঁহার বন্ধ, হিতকারী, ও শৈশবজীবনের একমাত্র উন্নতিকর্তা ছিলেন, তৎপরে আমাদিগের সম্মুখে আর এক অঙ্ক উদ্ঘাটিত হয়, যখন মিসেস টেলরের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়, এবং তাঁহার উদার বুদ্ধিবৃত্তির জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে “লজ্জিক” গ্রন্থে বিভাসিত হয়, অবশেষে তাঁহার প্রধান মিত্র, শিক্ষক ও গুরুদেব পিতা মানবলীলা সংবরণ করেন। সে যাহা হউক এখন আমরা বর্তমান সময়ের কথা বলিতে আরম্ভ করি এই সময়ে মিসেস টেলর আপনাব শিশুকন্যাটিকে লইয়া একেলা গ্রামে বাস করিতেন, কখন কখন স্বামীসঙ্গিধানে নগর বাসও হইত, যেখানেই বাস হউক না কেন, মিল তাঁহার সহিত লাক্ষ্য করিতেন ও উভয়ে মিলিয়া শাস্ত্রা-লোচনা দ্বারা বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, মিলের হৃদয়ের জ্বলন্ত স্বরূপিনী, আনন্দ-দায়িনী, প্রিয়বন্ধু মিসেস টেলর মিলের সহিত বিজ্ঞান ভ্রমণে বা আলাপনে কখনও ক্ষুণ্ণিতা হইতেন নাই, কারণ এই বুদ্ধিমতী

নারী পবিত্র হৃদয়াবশিষ্টা ছিলেন এবং মিলও তদনুযায়ী তেজস্বী ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। এমন কি ইহাদিগের চরিত্র বিষয়ে পরদোষাত্মক সন্দেহী কুটবুদ্ধি কাপুরুষ মনুষ্যদিগেরও মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই।

আজন্মকাল হইতে উভয়ের হৃদয়ই যেন জগতের উপকার সাধন ত্রিতে দীক্ষিত হইয়াছিল, মিল জগতে একেলা যাহা করিতেন, এখন তাঁহার এমন একটি বন্ধু হওয়াতে, তিনি রিণ্ডগতর কার্য সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে নিঃস্বার্থপর বন্ধু পাওয়া বড়ই কঠিন, প্রথমতঃ সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না, যদিও আমরা কখন কখন এমন সহৃদয় হৃৎকটী লোক দেখিতেও পাই, কিন্তু হায় তাঁহারা বৃত্তিতে পারেন যে একজগৎ তাহাদের উপযুক্ত বাসস্থান নহে, ও শীঘ্রই এ স্থান হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন। বহুভ্রমে বিষকুণ্ড পয়োমুখী ছদ্মবেশী নীচাশয়দিগের মিত্রতা সূত্রে বন্ধ হইয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের মনের নীচতা ও সন্ধীর্ণতা দর্শনে আমাদিগের হৃদয়ে অহুতাপের ও স্বপ্নার উদয় হয়, ও জগৎ সংসার হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মিল যে একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কারণ এরূপ বন্ধু লাভ করা বহু তপস্যার ফল। মিলের পিতা শৈশব কালে মিলের হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আচ্ছ মিসেস টেলর সেই স্থান অধিকার করিয়া

আছেন, ও বিস্তৃত জ্যোতি দ্বারা মিলের শবিত্ত হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত এই কিস্কিদ্ধিক ছুই বৎসরকালের মধ্যে মিল তাঁহার বিখ্যাত “political Economy” নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন, এই গ্রন্থখানিতে মিলের একেলার অধিকার ছিল না, কারণ মিসেস টেলর এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন, বলিতে গেলে মিলের অধিকাংশ লেখাই এই হৃদয়কার প্রথর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির একীভূত সমষ্টি। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের পর বহুদিবসাবধি যদিও তিনি এবশ্চকার কোন বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই তথাচ তিনি ছুর্ভিক্ষ প্রণীড়িত আয়লও বাসীদিগের বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লেখেন ও সংবাদপত্র সমূহের তদীয় রচনাগুলি একত্রিত করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয় সে প্রায় আর সন্দেহ নাই।

মিল ১৮৪৮কালই সমাজস্থিত সমস্ত ব্যক্তির মানসিক গতির পরিবর্তন করিতে যত্নবান হয়েন, এবং ইহাও নিশ্চিত, তৎকালীন অনেকানেক অশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মনের উপর তিনি নিজ রাজ্য স্থাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এখন অনেকেই পুরাতন ধর্মোপদেশ বা পুরাতন মত সমূহকে অন্ধ হইয়া পূজা করিতেন না, বিশেষ বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্বক ঐ মত সকলের পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিষ্টার টেলরের মৃত্যু

হয়, এই মৃত্যুতে তাঁহার ভাষা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, মিলও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রাণপণে তাঁহাকে সান্তনা করিতে যত্নবান হইলেন। জগতের খেলা কে বুঝিতে পারে, কিছুদিন পরে মিসেস টেলরের শোক কিছু শমিত হইলে মিল তাঁহার হস্ত-প্রার্থনা করিলেন। সচরাচর প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় এপর্য্যন্ত সেরূপ ভাল-বাসা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, তিনি স্বপ্নেও কখনো মুহূর্ত্তের জন্য এরূপ আশা, এরূপ বাসনাকে মনে ঠাঁই দেন নাই, এরূপ প্রণয়ের ভাব অতিদূর কল্পনাতেও মনে কিয়া তাঁহার বিস্তৃত বুদ্ধি ভাব কলঙ্কিত করেন নাই—কেবল মাত্র একটি উদার বহুভাবে তাঁহার হৃদয় এতদিন পূর্ণ ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি সেই জন্য ঘোর নীচমনা ব্যক্তিও তাঁহার বিরুদ্ধে কখনো কানাকানি পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। এত দিন পরে সেই বহুভা প্রেমের আকার ধারণ করিল। তাঁহার যৌবনের সখীর সহিত চির জঁপ্তন একত্রে কাটাইবার একটি ইচ্ছা প্রাণের মধ্যে আসিয়া পড়িল। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বহুত্ন স্নেহে সখী হইয়া সেই যৌবনের চির সঙ্গিনীর সহিত এখন মিল বিবাহ স্ত্রে বন্ধ হইলেন, ও জী স্নেহে সখী হইয়া বিমল আনন্দে জীবন অতি বাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটা স্নেহের নব-রাজ্য উদঘাটিত হইল, আপনি যাহা লিখিতেন জীকে পড়িয়া শুনাই তেন, তাঁহার অধিতীয়া বুদ্ধিমতী জীও নিজ মতগুলি স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিতেন ও

মিল সেই গুলিকে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া স্থায়ী হইতেন। মিল বলিতেন পুস্তকখানি যিনিই লিখুন না কেন, গ্রন্থস্থিত মত সমুহের যিনি অধিকারী গ্রন্থখানি তাঁহারই বলিতে হইবে। এই নিমিত্তই আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে মিলের অনেকগুলি গ্রন্থে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সমান অধিকার আছে। মিলের হৃদয়ে এতদিন যে সমস্ত ভাব ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, এই সময় হইতে তাঁহার পত্নী দ্বারা সেই সব ভাবের স্ফূর্তি হইতে লাগিল। দুইটি হৃদয় এক হইয়া একই ব্রত সমাধা করিতে কৃতব্রত ও সক্ষম হইয়াছিল। ~~এ~~প অর্থ সচরাচর সর্কে ভাগ্যে ঘটে না, মিল যেরূপ স্বামী তিনি তদনুরূপই পত্নী পাইয়াছিলেন। কিন্তু জুংথের বিষয় তাঁহাকে অধিককাল বিবাহ অর্থে স্থায়ী হইতে হয় নাই, সবে মাত্র সার্ক-সাতবৎসর কাল বিবাহের পরেই তাঁহার প্রিয়তমা অসীম গুণবতী ভার্যার মৃত্যু হয়। মিল অতিশয় কাতর হইয়াই বলিয়াছেন, "For Seven and a half years that blessing was Mine, for seven and a half only! I can say nothing which could describe even in the faintest manner, what that loss was and is. Her memory is to me a religion, and her approbation the standard by which, summing up as it does all worthiness, I endeavour to regulate my life."

এ কথাগুলি আমরা কতবারই পড়িয়াছি,

তথাচ এখনও যেন আমরা স্পষ্ট গুলিতে পাইতেছি "For seven and a half years that blessing was mine, for seven and a half only!" জীবনের মধ্যে মিলের হৃদয়ে দুইবার আঘাত লাগিল, প্রথম পিতৃবিয়োগে, দ্বিতীয় প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে। এখন তিনি যাহা লিখিতেন তাহা নিজেই পড়িতেন ও নিজেই সংশোধন বা পরিবর্তন করিতেন, কেহ নাই যে সে গুলিকে স্নেহের চক্ষে দেখে, প্রাণের সহিত মমতা করে।

শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে দমন করিতে মিলের মত অদ্বিতীয় লোক আর দেখা যায় না, ইনিই পুরাতন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মত সমুহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, চিরকালই ইঁহাকে খৃষ্টীয় মুক্তিদাতা-গণ কৃতান্তের ন্যায় ভয় করিয়া থাকেন। মিলের বিবাহ হইতে জ্ঞার মৃত্যু পর্যন্ত একটি বিশেষ ঘটনা ঘটয়াছিলই। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়া হাউসের বন্ধুজ্ঞসপণ্ডেন্দ" বিভাগে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠান করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে মিল পনের বৎসর বয়ঃক্রম কালে উক্ত কোম্পানীর অধীনে একটি কেরানিগিরি কর্ম পান, এখন তিনি সেই কর্ম স্থলেই সর্বোচ্চ আসন গ্রহণে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর অধিক কাল এ কর্ম করিতে হয় নাই, কারণ উক্ত কোম্পানি দুই বৎসরের মধ্যেই উত্তর ভার ও রাণী "ভিক্টোরিয়া" বহুতর রাণ্যভার গ্রহণ করেন। মিল ও তাঁহার পত্নী উভয়ে মিলিয়া বিখ্যাত "লিবার্টি" নামক

গ্রন্থখানি রচনা করেন, এই গ্রন্থখানি দুই-
মুঠে উপর্যুপরি পাঠ ও যথোপযুক্ত সংশো-
ধনাদি করেন, অবশেষে তাঁহাদিগের মনে
এই আশা ছিল যে যখন তাঁহারা ১৮৫৮-৫৯
খৃষ্টাব্দের শীতকালে ইউরোপ খণ্ডের
দক্ষিণ ভাগে অবস্থিতি করিবেন তৎকালে
আরেকবার এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত
দেখিবেন, কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার জীবন
বিয়োগের সহিত সে আশারও অবসান হই-
য়াছিল । মিল বলেন যে তিনি ভারতবর্ষের
হিতকামনায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বা-

য়িত্ব বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন,
কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইয়া নাই ।
উক্ত কোম্পানি উঠিয়া যাইলে পর লর্ড-
ষ্টানলে ভারতবর্ষীয় সভার আসন গ্রহণে
তাঁহাকে অস্বরোধ করাতে তিনি ঐ প্রস্তাবে
সম্মত হইয়া নাই । কিয়দ্বিবস অতীত
হইলে তিনি “Thoughts on Parlia-
mentary Reform” নামক একখানি
দুদ্রাবয়ব গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ইহার জীবন
পূর্বে একবার এ গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত
দেখিয়া দিয়াছিলেন ।

ক্রমশঃ ।

বিজন চিত্তা ।

ওই হোথা আকাশের অনন্ত সীমায়
প্রাণ মোর দেহ ছেড়ে বিরাম লভিতে চায়,
জগতের কোলাহল বহেনাক অবিরল,
কি প্রশান্ত চারিধার কি মধুর বহে বায় ।

২

জগৎ আমার নয়, আমি জগতের নয়,
জগতের কোন কথা পশেনা শ্রবণে ;
জগতের হাহাকার, জগতের ব্যভিচার,
চিরকাল এ জগতে থাক্ সংগোপনে ।

৩

জীবনের নাহি মূল, সব হ'য়ে গেছে ভুল,
এ জগতে কেহ কান্দে নহেরে আগুন ;

প্রেম-মোহে ভুলে ভুলে, চলিয়াছ কুতূহলে,
জাননায়ে একদিন ভাঙিবে স্বপন !

৪

এসেছি হৃদয় তরে, আবার হৃদয় পরে,
জীবনের সব কথা হবে অবসান ;
কেন এত হাহাকার, আসিতেছে অনিবার,
পায়িনা সহিতে আর কাতর পরাণ !

৫

ওই আকাশের কোলে যেখায় তারাটি দোলে,
ওই খানে প্রাণ মোর প্রতিদিন যায় ।

জগতের কোলাহল বহেনাক অবিরল,
কি প্রশান্ত চারিধার কি মধুর বহে বায় ।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী

সন্ন্যাসীর জীবন।

কনক নেপালি ভাষায় সংগীত আরম্ভ করিলেন, “আমার গুফামে নিরঞ্জন যোগী বনমে বালা কাঁহা টুরো হাঁ হাঁহা জী।” ক্রমান্বয়ে ৩৪ টি ভক্তিরস যুক্ত মোক্ষ তত্ত্ব-বিষয়ক গান গাহিলেন। আমি ঐ সংগীতের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারায় তিনি আমাকে সরল হিন্দি ভাষাতে উহার অর্থ অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমি লিগিতেছি। “আমার দুই ভ্রমর মধ্য স্থলে গহ্বর দেশে যে নিরঞ্জন পর ব্রহ্ম সর্বদা অবস্থিতি করিয়া প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখার ন্যায় জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন, হে মুঢ় মন তুমি ভ্রাস্তচিত্ত হইয়া সশরীরে তাঁহাকে দৃষ্টি না করিয়া নির্দোষের ন্যায় তিনি কোথায় তিনি কোথায় বলিয়া ভ্রমণ করিতেছ। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিলে ও গঙ্গাদি স্নান করিলে তাঁহাকে পাইবে না, দেহরূপ ঘটেই গঙ্গা, দেহরূপ ঘটেই যমুনা, দেহরূপ ঘটেই কাশী, প্রয়াগ। ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে অতি স্বক্সতর সুসুন্না নাড়ী আছে তাহাতেই সমুদায় তীর্থ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা জানিয়া তীর্থ যাত্রা পরি-ভাগ পূর্বক নির্জন স্থানে স্থির চিত্তে বসিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হও। এই পঞ্চ ভৌতিক অনিত্য দেহ নিশ্চয় পঞ্চভূতে

মিলিয়া যাইবে, কামক্রোধ আদি রিপু সকল দেহের সহিত বিলীন হইবে, বন্ধু বান্ধবেরা স্পন্দহীন শরীর দৃষ্টে বিলাপ করিয়া অবশেষে মৃত্যুকাতে প্রোথিত কিম্বা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবে। হে ভ্রাস্ত চিত্ত-মল মূঢ় যুক্ত দেহ ভাঙকে নখর জানিয়া ধন জন ঘোবনাদির গর্ব পরিভাগ করিয়া, অহিংসা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি দ্বাবতীয় গুণ যুক্তহইয়া বিশ্বপতি মহেশ্বরকে আশ্রয় কর। সুখ দুঃখ মানাপমান নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি সমভাবজ্ঞান করিয়া ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া ক্ষণস্থায়ী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। হে মন তোমাকে বিশেষ মিনতি করিতেছি তুমি পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া মন্দেরের ন্যায় স্থির হইয়া সর্বদা ব্রহ্মনামাস্মৃত সুধাপান কর, পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইও না।” এই সকল বাক্যে তিনি সংগীতের অর্থ শেষ করিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি “কি নিমিত্ত ঐ সকল উচ্চ সাধনা পরিভাগ করিয়া তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়াছ?” তিনি আমার বাক্যের উত্তরে বলিলেন “যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান নহে তাবৎকাল চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গাস্নান ও তীর্থ দর্শন ও মূর্তি পূজাদি করিবার বিধি আছে। যদি

উহাতে চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই, তজ্জাত অন্তঃকরণ বিধূয় না করিতে পারিলে কোন কার্য্যই ফলবতী হয় না। বিশেষ ঐ সকল কর্মে স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির কথাও কোন কোন শাস্ত্রে আছে, যদি ঐ সকল মিথ্যাও হয় তাহা হইলে ভ্রমণ ও সংসার জনিত যে জ্ঞান তাহা নিশ্চয়ই উপার্জিত হয়। একথও অগ্নিস্কুলিঙ্গ যেমন রাশি বাশি তৃণকে ভস্মীভূত কবে তদ্রূপ জ্ঞানগ্নি নিখিল কর্ম রাশিকে ভস্মীভূত কবে তাহা আমি জ্ঞাত আছি। তজ্জাত চঞ্চল চিত্ত বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত নানাবিষয়ে প্রধাবিত হইয়া চিত্তক্ষেদে, মহাসমুদ্রের ভীষণতরঙ্গের ন্যায় তবঙ্গ উখিত করিয়া বিশ্বপতির অচিন্ত্য-কর্কটনীর জ্ঞান শক্তির ধ্যান হইতে অন্তঃকরণকে সর্বদা অন্য পথে লইয়া যায়। এজন্য সর্বদা ইচ্ছা হয় কোন ব্রহ্মনিষ্ঠগুরু শরণাপন্ন হইয়া শনৈঃ শনৈঃ ব্রহ্ম বিদ্যালাত করত এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহের চরিতার্থতা সম্পাদন করি। কিন্তু আমার পক্ষে উহা আকাশ কুসুম স্বরূপ হইয়াছে। এই কালে বিভাপহারক অসদ্গুণযুক্ত গুরুই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তাপহারক সদ্গুরু পাওয়া অতি দুষ্কর। অথচ গুরু বিনা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না।” ইহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম তুমিতো পড়িতে জ্ঞান, যোগশাস্ত্র দেখিয়া ভূষণযুক্ত কার্য্য করিতে পার।” তিনি বসিগমন, “যেমন তরণী বর্তমান নদীতে কর্মধার বিনা নদী পার হইয়া যায় না, তদ্রূপ জনিত শাস্ত্রাদি

বর্তমান থাকিলেও যোগসিদ্ধি লাভ কিবা এই ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। সুবিস্তীর্ণ সংসারে বহুশাস্ত্র বর্তমান রহিয়াছে যাহা সহস্র বর্ষ অধ্যয়ন করিলেও শেষ করা যায় না, তাহা এই স্বমস্তাবী জীবনে কিরূপে শেষ হইবে। পূর্বে পিতাবমুখে শুনিয়া ছিলাম গোপ যেকূপ দুগ্ধ হইতে তাহার সার ভাগ নবনীত গ্রহণ করিয়া খোল ভাগ পবিত্রাগ করে তদ্রূপ ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা অসীম ধর্ম গ্রহণ হইতে তাহার সারভাগরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রাদিতে পশ্চাৎ পবিত্রাগ কবেন। মুক্তির নিমিত্ত এক ব্রহ্মজ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর বাহ্য পূজা যে অধমসাধন তাহা কেবল মাত্র শ্রবণাধারেই শ্রবণ কবিয়াছি, এ পর্য্যন্ত ঐক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলাম না, এমতাবস্থায় অন্তঃকরণ সময় সময় অত্যন্ত খেদাবিত হয়।” তাঁহার ঐ সকল বাক্য অস্ত হইলে অপরদিকে ভদ্দেশবাদী থাকালি জ্ঞাতির গীতধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল তখন আমি তাহাদিগের নিকটে যাইলাম। তথায় গিয়া দেখি তাহারা (সরলকাষ্ঠ) জ্ঞানানিকাষ্ঠ প্রজ্জলিত করিয়া সকলে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সংগীত আরম্ভ করিয়া ক্রমে তথা হইতে স্থানান্তরে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি তাঁহাদের ঐ সংগীতের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এক ব্যক্তিকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন উহারা ভগবান বৃন্দদেবের ভজনা করিতেছে। উহা শ্রবণান্তে ঐ জ্ঞাতির পূর্বাবস্থায় শুনিবার

নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ঐ জাতি সম্বন্ধে যাঁহা কহিয়াছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি। থাকালি, মগর প্রভৃতি কয়েকটি জাতি পূর্বে সম্পূর্ণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, এক্ষণ থাকালি জাতি সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। ইহারা ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে গুরু করিয়া দেব দেবীর প্রতিমূর্তি পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মাদিগের প্রমুখ্যে ভগবান বুদ্ধদেব বিষ্ণু অবতার ঋত হইয়া পিতৃ পিতামহের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ অনায়াসে বোধে অদ্যাবধি বুদ্ধদেবের মূর্তিকে নারায়ণের মূর্তি বোধে পূজা ও মহাত্মা লামা গুরুদিগকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মহাত্মাদিগের ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। অবশেষে তদ্দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে কিছু শুনলাম। উক্ত দেশে কোর কার্য ও বস্ত্রাদি ধোত করিবার নিমিত্ত কোন জাতি কিম্বা কোন লোক নিয়মিত নাই। তাহারা স্ব স্ব কুর্খ্য স্রীয় হস্তে কিম্বা চাকরের দ্বারা করাই। থাকে, এজন্য ঐ সকল দেশে ঘর ঘর রজক ঘর ঘর নাপিত বলিয়া কথিত হয়। পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে একটা গ্রামে এক জন থাকালি জাতির বাটাতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে অতিশয় যত্ন পূর্বক বিশ্রাম স্থান ও আহারীয় দ্রব্য দিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি, গৃহ কর্তার নিকট আমার জন্ম স্থানের পরিচয় দিলে, তিনি অভ্যন্ত আশ্চর্যিত হইয়া আমাকে কহিলেন “এক্ষণে

আপনাকে দেখিলে আর বাঙ্গালি বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর হইল আমি জগন্নাথ ধাম দর্শন ও কলিকাতা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। কলিকাতা ভারী সহর, অমন সহর বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই, বাঙ্গালি জাতি বড় স্মৃগী, সকলেই ধনী, অতিশয় বুদ্ধিমান, বিদ্বান, দয়া, শ্রদ্ধা ভক্তিভে অদ্বিতীয়। আজ আমার বড় ভাগ্য গৃহে বসিয়া মহাশয়ের দর্শন পাইলাম, মহাশয়ের পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমিও কৃতার্থ হইলাম। আমি অতি অধম আপনার যথাবিধি সম্মানরক্ষা করিতে পারি ঈশ্বর আমাকে এমত ধন দেন নাই, নিজ গুণে আশ্রিতের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া এই যৎকিঞ্চিৎ পত্র পুষ্প (সুখাদ্য দ্রব্য) গ্রহণ করুন।” তাঁহার ঐ মিনতি যুক্ত বাক্যের উত্তরে কহিলাম, আমি তোমার বাক্যে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমার মঙ্গল করুন। “পর দিবস সন্ধ্যার পূর্বে কালী নদীর তীরবর্তী (কালীর অপর নাম সরযু নদী) একটা বৃহদাকার বাটা দৃষ্টে তথায় যামিনী যাপনের ইচ্ছুক হইয়া প্রাসাদাভ্যন্তরে গমনোন্মুখ হইলাম। পুর প্রবেশ মাত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ যুগল যুগলের ন্যায় দুই দ্বার রক্ষক প্রভৃতি কুকুর দৃষ্ট হইল। আমাদিগের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ হইবা মাত্রই তাহারা অশনিপাতের ন্যায় গগণভেদী রব করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ আরম্ভ করিল। তৎপ্রবণে গৃহ যামিনী

বহির্গত হইয়া হিন্দি ভাষায় আমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনারা কি চান?”
তৎপরে সঙ্গী একজন নেপালিভাষায় কহি-
লেন “আমরা অন্য রাত্রি এই স্থানে বিশ্রাম
করিবার ইচ্ছা করি।” গৃহকর্ত্তী আমা-
দের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া কুকুরদিগকে
নিরস্ত হইবার সঙ্কেত করিলেন, তাহার।
প্রতিপালনকারী প্রভুপত্নীর আদেশ তৎ-
ক্ষণে পালন করিল। আমরা যে বাটীতে
আশ্রয় লইয়াছিলাম উহা একজন ভূটীয়া
জাতির গৃহ, তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থান-
বাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকে সচরাচর ভূটীয়া
কহে, কিন্তু মান্যার্থে গৃহস্থদিগকেও লামা
‘মহাশয় বা মাহাত্ম্য’ শব্দ ব্যবহার করিয়া
থাকে, ভূটীয়া বলিয়া সম্বোধন করিলে
তাহারা দুঃখিত ও রাগান্বিত হয়। সন্ধ্যার
পর লামাপত্নী, কন্যা ও পুত্রবধূদি পরি-
বৃত্তা হইয়া আমাদিগের বিশ্রাম কক্ষে
প্রবেশ করত অভিবাদনাগ্লে উপবেশন
করিল। পরে তাহাদিগের মুখে ক্ষত হই-
লাম গৃহাধক্ষ পুত্র সকলের সহিত স্থানা-
ন্তরে গমন করিয়াছেন এজন্য বাটীতে
সামান্য ২১ জন ভৃত্য ভিন্ন অন্য কোন
পুরুষ নাই। প্রেমদাগণ আমাদিগের গান
শুনিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলে
কনক মোক্ষ তত্ত্ববিষয়ের একটি গান গাহি-
লেন, কিন্তু তৎপ্রবেশে তাহাদের মনোরঞ্জন
হইল না। তখন তাহারা তাঁহাকে প্রেম-
গীত গাহিতে অনুরোধ করিল, তিনি
তাহাদিগের বহু স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া কর-
আলি প্রদান পূর্বক গাহিতে লাগিলেন

“বেণুবাজে সবি মধুবন মে।” ইহা শ্রবণে
তাহারা অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া
তালে তালে তালি দিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী
ও বস্তুবিন্যয়ে দৃষ্টিপাত করত নৃত্য করিতে
আরম্ভ করিল। উত্তরা কস্মিনকালে দ্বান
কিছু গাত্রবস্ত্র পরিষ্কার করে নী এজন্য
সতত উহাদিগের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির
হয়, পরন্তু উহারা সুন্দরী, সতীত্বাদি গুণ-
সম্পন্ন। কিছুক্ষণ পরে কনক তাহাদিগকে
কহিলেন আমি তো তোমাদিগকে ৪৫ টা
গান শুনাইলাম এখন তোমরা ২৪ টা আমা-
দিগকে শুনাও, তৎব্যাক্য শ্রবণে উহারা
২টী সঙ্গীত করিল। আমি উহার অর্থ
হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহার অর্থ
জিজ্ঞাসা করিলাম, উহাদিগের মধ্যে সর্ব-
শ্রেষ্ঠ এক রসিকা রমণী চতুরতা পূর্বক অর্থ
শুনাইল। হে মহারাজ আজ আমাদের
ধনা ভাগ্য, যোগী ধর্মিগণ যাহার সাক্ষাত
চলিত বিবেচনা করেন, আমরা গৃহে তাঁহার
দর্শন পাইলাম। আপনার অনুরূপ মোহন
মূর্ত্তি ও চন্দ্রাপেক্ষা উজ্জ্বলতর মুখকান্তি
সুবিচ্ছলে বক্ষস্থল দৃষ্টে আমাদের মন প্রাণ
সুশীতল হইল। আপনার কমল আ-
খিতে আঁখি পতিত হইলে আর উহাকে
অস্তর করিবার ইচ্ছা হয় না, মনে হয় চিত্র
পুঙ্ক্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন হইলেই ভাল
হইত। হে নাগরীরঞ্জন, ভক্তবৎসল ভো-
মাক আমরা বার বার নমস্কার করি।”

সেই হলনা বাক্যে প্রথমতঃ নির্বাক হই-
লাম পরে তাহার যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে
পারিলাম। যখন ভগবান হিমালয়রাজের

গৃহে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তৎসময় বাসর
গৃহেনারী বৃন্দ মহাদেবকে ঐরূপ কথা বলি-
য়াছিলেন এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐচ্ছাভিরা
স্বীয় ভাষায় ঐরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে ।
আদি ঐ চাতুর্য্য জালের অর্থ বুঝিতে
পারিয়া স্থান্য করিতে লাগিলাম ।
রাত্রি অধিক হওয়া প্রযুক্ত কিছুক্ষণ পরেই
তাহারা নিরস্ত হইয়া আমাদিগকে বহুবিধ
স্তুতি ও অভিবাদন করিয়া আশীর্ব্বাদ
এবং স্তোত্র শ্রবণ কক্ষে চলিয়াগেল ।
ক্ষণকাল পরে সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে
আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, বিশ্বপতি
বিধাতা এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে মত্ত মাতঙ্গ
সদৃশ পুরুষ জাতিকে গৃহস্থশ্রমরূপ শৃঙ্খলে
বদ্ধ করিবার নিমিত্তই স্ত্রী জাতির সৃজন
করিয়াছেন । বিশেষ মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকরগণ
স্ত্রীকে গৃহের লক্ষী, জীবনের শক্তি, ভাৰ্য্যা-
হীন ব্যক্তিই ত্রিহীন, শক্তিহীন ইত্যাদি

নিখিয়া গৃহস্থশ্রমের পরম পোষকতা করিয়া
গিয়াছেন । যে মহাবীর ভীষণ সমুখ সমরে
শত সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া স্বীয়
বাহুবলে জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন তিনিও
দুর্কলা অবলার কর কমলের নিকট পরা-
ভূত হইয়া তাহার শ্রীচরণের দাস হইয়া-
ছেন । যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভারতবাসী সমস্ত
হিন্দু জাতি নারায়ণ বলিয়া পূজা করিয়া
থাকেন তিনিও কুঞ্জবনে শ্রীরাধিকার মান-
ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহার পদ ধারণ করিয়া-
ছিলেন । হে লোকনাথ, তোমার ইচ্ছায়
এই বিশ্ব-সংসার চলিতেছে পুরুষ-প্রকৃতি-
রূপা নরনারী-তোমার উচ্চতর উদ্দেশ্য
সাধন করিতেছে, আমি তোমাকে নমস্কার
করি । ইত্যাদি প্রকার বহু চিন্তা করিয়া
নিদ্রাভিভূত হইলাম ।

ক্লমশঃ ।

উদাসীন ।

ঘাটের কথা ।

পার্বাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত, তবে
কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে
সোপানে পড়িতে পাইতে । পুরাতন কথা
যদি তুলিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে
বসি ; মনোযোগ দিয়া জলকন্ডোলে কান
পাতিয়া থাক, বহুদিনকার কত বিশ্বত কথা
তুলিতে পাইবে ।

আমার আরেকদিনের কথা মনে পড়ি-

তেছে । সেও ঠিক এইরূপ দিন । আশ্বিন
মাস পড়িতে আর দুই চারি দিন বাকী
আছে । ভোরের বেলায় অতি দীর্ঘ মধুর
নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোথিতের দেহে
নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে । তরুপঞ্জব
অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে ।
ভরা গঙ্গা । আমার চারটিমাত্র ধাপ জলের
উপরে ভাগিয়া আছে । জলের সঙ্গে স্থলের

সঙ্গে যেন গলাগলি। ভীরে আত্ম কান-
নের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সে-
খান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর
ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের
পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া
রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি
ডাঙ্গার বাব্লাগ ছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা
ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে
ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুবন্ত-
যৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহা-
দের দুই পাশে ছল্‌ছল্‌ আঘাত করিতেছে,
তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া
দিয়া যাইতেছে। ভরা গঙ্গার উপরে শরৎ
প্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁটা
সোনার মত রং, টাঁপা ফুলের মত রং। রৌ-
দ্রের এমন রং আর কোন সময়েত দেখা
যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে
রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশকুল সব ফুটে
নাই, ফুটে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝীরা নৌকা খুলিয়া
দিল। পাখীরা যেমন আলোতে পাখা
মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে
ছোট ছোট নৌকাগুলি তেমনি ছোট ছোট
পাল ফুলাইয়া সূর্য্যাকিরণে বাহির হইয়াছে।
তাহাদের পাখী বলিয়া মনে হয়; তাহারা
রাজহাসের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আ-
নন্দে পাখাতুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।
ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কো-
শাকুনি লইয়া মান করিতে আসিয়াছেন।
মেয়েরা দুই একজন করিয়া জল লইতে
ক্সিয়াছে।

সে বড় বেশী দিনের কথা নহে।
তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে
পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই
সে দিনের কথা! আমার দিনগুলি না কি
গঙ্গার স্রোতের উপবে খেলাইতে খেলাইতে
ভাসিয়া যায় বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে
তাহাই দেখিতেছি—এই জন্য সময় বড়
দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের
আলো রাতের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উ-
পরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর
হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের
ছবি রাখিয়া যায় না। সেই জন্য, যদিও
আমাকে বৃদ্ধের মত দেখিতে হইয়াছে,
আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের
স্মৃতির শৈবালের ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আমার
সূর্য্যাকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা
ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লা-
গিয়া থাকে আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়।
তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে
পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায়
না, সেখানে আমার হিঙ্গ্রে হিঙ্গ্রে যে লতা
গুল্ম শৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার
পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে
স্নেহপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাহার পুরা-
তনকে শামল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছে;
তাহারা পুরাতনকে চিরদিন নূতন করিয়া
রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ
হইতে এক এক পা সরিয়া যাইতেছেন, আ-
মিও ততই এক এক ধাপ করিয়া পুরাতন
হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ঐ যে বৃদ্ধা দ্বার

করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা অপিতে অপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাই-
তেছেন উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে, তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা স্নাতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মত ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া ঝাঁড়াইয়া তাগাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ভাগুর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের এক টি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিত, সে মেয়েও আবার বড় হইল, বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন তখন আমার সেই স্নাতকুমারীর নৌকা ভাসান মনে পড়িত ও বড় কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই স্নাতকুমারীর নৌকাগুলির মত পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাটুকুরই মত সে অতি ছোট, তাহাতে বেশী কিছু নাই, খুঁটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে

ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কে-
বল মাত্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গৌসাইদের গোয়াল ঘরের বেড়া দেখিতেছ, ঐখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় লপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গৌসাইরা এখানে বসতি করে নাই যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ঐখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র। এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহ প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিগুলির ন্যায় শিকড় গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষণ প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র, কচি কচি পাতা গুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিল্‌বিল্‌ করিত মাত্র। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত। যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিঁধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মত বাকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মত সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিখের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে লশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে

দুইখানি ইটের অভাব ছিল, সেই গত্তটির মধ্যে একটা ফিল্ডে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উস্খুস্খ করিয়া জাগিয়া উঠিত মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার ঘোড়াপুচ্ছ দুই চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিব দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোট ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি। সে ছায়াটি যদি আমার পাশে রাখিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাশের উপরে পাই ফেলিত, ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবাল গুলুগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশী খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসি-ভাসা করিত, তাহা নহে, তথাপি, আশ্চর্য্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারো নয়। যত দ্রুত মেয়েদের তাহাকে নহিলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসুম, কেহ তাহাকে বলিত খুসুম, কেহ তাহাকে বলিত রাক্ষুসুম। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসুমি। যখন তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কি মিল ছিল। সে জল ভরি ডাল খাসিত।

কিছুদিন পরে আর কুসুমকে দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম নাকি তাহাদের কুনী-খুনীরা কুনীকে স্বস্তরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে না কি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কাঁরা সব নুতন লোক, নুতন ঘরবাড়ি নুতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙ্গায় রোপন করিতে লইয়া গেছে।

ক্রমে কুসুমের কথা এক রকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড় করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ের আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের আর সে সঙ্গীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্রে অহুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যা-বেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষম শুনাইতে লাগিল, আত্মবনের মধ্যে পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হাহা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরী করিত দুই একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাতই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধবোর সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিন্দুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড় কেহ নাই । ভুবন স্বর্ণ অমলা স্বস্তর ঘর করিতে গিয়াছে । কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহা-
য়ন মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে । কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে । কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউ গুলি সবাই মিলিয়া হাত ভুলিয়া তাহাকে কুসুমসূত্রাকুসুমী বলিয়া ডাকাডাকি করিত ।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তে-
মনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্য্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল । কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চখে পড়িত না । কুসুম যে বড় হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না । আমি ত পাইতাম না । আমি কুসুমকে সেই প্রাণি-
কাটির চেয়ে বড় কখন দেখি নাই । তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম । এমন করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেও পারিল না ।

এই আশ্রম যেমন দেখিতেছি, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাংশেই আমি এক দিন আসিয়াছিলাম । তোমাদের প্রপিতামহীরা যে দিন সকালে উঠিয়া এমনিভর মধুর স্ব-

র্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন । তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী ভুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভা-
তের আলো আরো আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচু-
নিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে ক-
রিতে চলিয়া আসিতেন, তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের একপাশে উ-
দিত হইত না । তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্য সত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াই-
তেন, আজিকার দিন যেমন সত্য যেমন জীবন্ত সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মত তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মত টলমল করিয়া ছলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারাহীন, তাঁহাদের সুখ দুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি তাঁহা-
দের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল ।

সেই দিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-
আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল । আমার পা-
ষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়া ছিল । সেই দিন সকালে কোথা হইতে গোরতর সোম্যউজ্জলমুখচ্ছবি, দীর্ঘ-
কায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখে ঐ শিব মন্দিরে আশ্রয় লইলেন । সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা প্রাণে হাই হইয়া

পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠা-
কুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া
ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে
সন্ন্যাসী, তাহাতে অল্পপম রূপ, তাহাতে
তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না;
ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননী-
দিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।
নারী সমাজে অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার অ-
ত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও
বিস্তর আসিত। কোন দিন ভাগবত পাঠ
করিতেন কোন দিন ভগবদ্গীতার বাখ্যা
করিতেন, কোন দিন মন্দিরে বসিয়া নানা
শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার
নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ
মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ
জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া
বলাবলি করিত,—আহা, কি রূপ! মনে
হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে
আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্য্যো-
দয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া
আবক্ষ গঙ্গার জলে নিমগ্ন করিয়া ধীর গভীর
স্বরে সঙ্খ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি
জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁ-
হার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন
গঙ্গার পূর্বে উপকূলের শিররের আকাশ রক্ত-
বর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ
রক্তের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশো-
দ্ভূত কুঁড়ির আবরণ-পুটের মত কাটিয়া
চারিদিকে নামিয়া পড়িত, ও আকাশ স-

রোবরে উষা-কুসুমের লাল আভা অল্প অল্প
করিয়া বাহির হইতে থাকিত। ক্রমে
গাছের প্রান্তগুলি আকাশে ফুটিতে থাকিত,
বাতাস ভাগিত, আকাশের বর্ণ শুভ্র হইয়া
আসিত, অবশেষে নেপথ্য হইতে বৃক্ষশ্রেণীর
অস্তরাল হইতে প্রাতঃস্নাত বিমল সূর্য্য
ধীরে ধীরে সোপানে সোপানে আকাশে
উত্থান করিতে থাকিত। আমার মনে হইত
যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া
পূর্ব্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ
করেন তাহারই এক একটি করিয়া শব্দ উ-
চ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক
ভাঙ্গিয়া যায়, চন্দ্র তারা পশ্চিমে নামিয়া
যায়, সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগ-
তের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে
মায়াবী! স্বান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোম-
শিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতন্তু
লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজুট
হইতে জল করিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্য্য-
কিরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিকলিত
হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল।
চৈত্র মাসে সূর্য্য গ্রহণের সময় বিস্তর লোক
গঙ্গানানে আসিল। বাবলাতলায় মন্ত
হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে
দেখিবার জন্যও লোক সমাগম হইল।
যে গ্রামে কুসুমের খণ্ডরবাড়ি সেখান হই-
তেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল।
সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ
করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা
একজন মেয়ে আরেক জনের পা টিপিয়া

বলিয়া উঠিল—“ওলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী !” আরেকজন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, তাইত গা, এ যে আমাদের চাটুষ্যেদের বাড়ির ছোট দাদাবাবু !” আরেক জন ঘোমটার বড় ঘটা কবিত না, সে কহিল—“আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ !” আর একজন সন্যাসীরদিকে মনোযোগ না কবিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলমীদিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, “আহা, সে কি আর আছে ! সে কি আর আসবে ! কুসুমের কি তেমনি কপাল !” তখন কেহ কহিল “তার এত দাড়ি ছিল না !” কেহ বলিল “সে এমন একহারা ছিল না !” কেহ কহিল—“সে যেন এতটা লম্বা ছিল না !” এইরূপে এ কথাটার এক-রূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না ।

আমের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই । অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল । একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমাতিথিতে পূর্ব-দিকে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুকি আমাদের পুরাতন সখন্ধ তাহার মনে পড়িল । তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না । কিঁ কিঁ পোকা কিঁ কিঁ করিতেছিল । মন্দিরের কাঁশর খণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল—তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ কীথ-তর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেনীর মধ্যে ছায়ার মত মিলাইয়া গেছে । পরি-

পূর্ণ জ্যোৎস্না । জোয়ারের জল ছলছল করিতেছে । আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে । বাতাস বড় ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ । কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অব্যবহিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশেপাশে কোপে কাপে গাছে পালার, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙ্গা-ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে । ছাতিমগাছেব শাখায় বাজুড় কুলিতেছে । মন্দিরের চুড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে । লোকালয়েব কাছে শৃগালের উর্দ্ধচীৎকার দ্রুনি উঠিল ও থামিয়া গেল । সন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন । ঘাটে আসিয়া দুই এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন,—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল । তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল । উর্দ্ধমুখ হুটমুহুর উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপরে তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল । সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ের দেখা হইল । যেন চেনাশোনা হইল । মনে হইল যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল । মনে হইল যেন বহুদিন পরে পূর্ব পরিচিত কোন্ দুই জন কীর্ণালোকে বহুদূর ব্যবধানে থাকিয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইল—হৃৎকণ্ঠে হৃৎকণ্ঠে চিনিতে পারিল, ভবু চিনিতে পারিল না । মুহূর্ত্তের অন্য উভয়ের চিহ্ন-পিতের মত ভাষা শেখিয়া, আমার উপরে

স্নোংমালোকে উভয়ের যে ছায়া পড়িয়াছিল সেই ছায়ায় ছায়ায় ক্ষণেকের জন্য স্থিরভাবে একত্রে মিলন দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হইল—ইহা আমার কল্পনাও হইতে পারে। আমার মনে হইল—প্রথম দৃষ্টিতেই যদি ইহাদের চেনাশোনা না হয়, ইহাদের পূর্বজন্মের সম্পর্ক সহসা মনে না পড়ে তবে আর চেনাশোনা হইবে না, আর মনে পড়িবে না। মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শেষে সচকিত হইয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘বৎসে, তোমার নাম কি?’ কুসুম কহিল—‘আমার নাম কুসুম।’ সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল। কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বুঝিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে

পারিত! কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চূপ করিয়া বসিয়া শুনিত—সে বুঝিতে চেষ্টা করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন, সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আসন্ন্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার বেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল হৃদয় উন্মোচিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি স্নান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। শিশির-ধৌত পুষ্পার ফুলের মত তাহাকে পবিত্র দেখাইতে লাগিল—এমন কি, সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত ফুলের মতই দেখাইত। একটি সুবিস্ময় প্রদুর্লভ তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। আকাশে হিমের ভার একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্নোতে নৌকা ভাঙাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া

শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখীরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে। বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষণ হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নব যৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুলিগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছু দিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কি হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছু কাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল। কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল “প্রভু, আমাকে কি ডাকিতে পাঠাইয়াছেন!” “হাঁ, বৎসে; তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? আজ কাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন!” কুসুম চুপ করিয়া রহিল। “বৎসে আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বল।” কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল—“প্রভু, আমি পাণ্ডিত্যবান সেই জনাই এ অবহেলা!” সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।” কুসুম একটু যেন চমকিয়া উঠিল—সে হতম হইতে বসে করিল,

সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন! তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভারিয়া আসিল—সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ে কাছ বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী কিছু দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, “বৎসে, তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত বক্ত করিয়া বল, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।” কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—“আপনি আদেশ করেন ত অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভাল করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে শকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি এক জনকে, আমার গুরুজনকে, দেবতার মত ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এক দিন রাজ্যে স্বপ্ন দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুল বনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিল না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখিলাম, আর পূর্ব্বের মত দেখিলাম না। পাপ মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম—কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয়

না—আমার সমস্ত অঙ্ককার হইয়া গেছে।”
 যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথা
 গুলি বলিতেছিল, তখন আমি অলুভব
 করিতেছিলাম সন্ন্যাসীর সৰ্ব্ব শরীর যেন
 কাঁপিতেছিল, সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ
 পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়াছিলেন।
 কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন,
 “যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ, সে কে বলিতে
 হইবে!” কুসুম যোড়হাতে কহিল, “তাহা
 বলিতে পারিব না।” সন্ন্যাসী কহিলেন
 “তোমার মঙ্গলের জন্য দ্বিজ্ঞাসা করিতেছি,
 সে কে স্পষ্ট করিয়া বল।” কুসুম সবলে
 নিজের কোমল হাত দুটী পীড়ন করিয়া হাত
 যোড় করিয়া বলিল, “সে কি না বলিলেই
 নয়! সে কি নিতান্ত বলিতেই হইবে।”
 সন্ন্যাসী কহিলেন “হাঁ বলিতেই হইবে।”
 কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “প্রভু, সে
 তুমি!” যেমনি তাহার নিজের কথা তাহার
 নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে
 মুচ্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া
 গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মত দাঁড়া-
 ইয়া রহিলেন। যখন মুচ্ছা ভাঙ্গিয়া কুসুম
 উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহি-
 লেন—“বৎসে, তুমি আমার সকল কথাই
 পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব

পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান
 হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা
 না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে।
 বল, এই সাধনা করিবে।” কুসুম উঠিয়া
 দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া
 ধীরে ধীরে কহিল “প্রভু তাহাই হইবে।”
 সন্ন্যাসী কহিলেন—“তবে আমি চলিলাম।”
 কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম
 করিল, তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া
 লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কুসুম
 কহিল “তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁ-
 হাকে ভুলিতে হইবে।” বলিয়া ধীরে ধীরে
 গঙ্গার জলে নামিল। এতটুকু বেলা হইতে
 সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে শ্রান্তির
 সময়ে এ জল যদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া
 কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে
 লইবে! চাঁদ অন্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধ-
 কার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম,
 আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকারে
 বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে কিছু
 দেখা যায় বলিয়া সে যেন হুঁ দিয়া আকাশের
 তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়। আমার
 কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার
 পেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে
 কোথায় সরিয়া গেল জানিতে পারিলাম না।

কৈটো।

১। মুখবন্ধ।

কৈটো সংস্কৃত ‘কিকিলিক’ বা ‘কিক-
 মুক’ কথার অপভ্রংশ; যে কিং অর্থাৎ কিকিং

কিকিং চলে। ইহার অপর নাম ‘মহী-
 লতা’। এই তিনটির কোন একটি নাম

দিলে অনেকের কাছে কৈচো সম্ভবতঃ মান সম্মম পাইত, অন্ততঃ তত হেয় বলিয়া বোধ হইত না। 'কিকিলিক,' 'কিঞ্চলুক,' বা 'মহী-লতা' অনেকের কাণে শুনিতেও ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কানে চির পরিচিত কৈচো নামটীই ভাল শুনায়; অন্য কোন নামে ইহাকে ডাকিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে, লিখিতে কলম সরে না। পাঠক বলিতে পারেন, আমার রুচির দোষ। বলেন, বলুন। বালাকালাবধি যে নামটী শুনিয়া আনিয়াছি, ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার বড় প্রিয়, ছাড়িতে মায়া হয়। কৈচোকে যে একটি বড় নাম দিয়া ডাকি লেই তাহার গৌরব বাস্তবিক বাড়িবে, আমার এরূপ বিশ্বাসও নয়। তাহার কার্য্য মহতই তাহার গৌরব। নামে কি করে?

আমরা মাছ ধরিবার জন্য কত কৈচো খুঁড়িয়া তুলি, টুকরা টুকরা করিয়া বঁড়লীতে বিধি। কৈচো মাছের উৎকৃষ্ট টোপ। গর্কিত মাহুস মনে করে, "পরমেশ্বর আমাদের আহ্বারের জন্য জলে মাছ সৃষ্ট করিয়াছেন; তাহাকে ধরিবার জন্য ভূমিতে কৈচো দিয়াছেন; আশা কি অপূর্ণ কোশল।" মাছ ধরা বাতীত প্রকৃতির রাজ্যে কৈচোর অন্য কোন কাজ আছে কি না, ক'জন তাহার অহুসন্ধান করে? তাহার প্রাণ আছে সে টুক বুঝিতে পারি, কারণ তাহাকে তুলিবার সময়, নখ দিয়া কাটিবার সময়, হিল্‌বিল্‌ করিয়া নড়ে। কিন্তু কৈচো নিকৃষ্ট প্রাণী; অনেক তাহাকে ছুঁইতে স্পর্শবোধ করেন; সে কি বড় কাজ করিতে

পারে? তাহার বিষয় আমরা কি লিখিব? তাহার ইতিহাসে আমরা কি লিখিব?

কৈচো প্রকৃতির কৃষক—যখন মনুষ্য জন্মে নাই, তখন জমি চাষিয়া দিত; আর এখনও বন জঙ্গলে, যেখানে মাহুসের লা-জল চলে না, সেখানকার জমি চাষিয়া দেয়। কেবল তা নয়; এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কীট জমির একজন প্রধান সৃষ্টি কারক, এবং উর্ধ্বরতা সাধক। আবার আমাদের যে অমিশ্র উপকার করে তা নয়, অনেক হানিও করিয়া থাকে। তাহার উৎপাতে বাড়ীর রক বসিয়া যাইতে দেখা যায়; অনভীর ভিত্তি কম-জোর হইয়া কালে নিম্নগামী হয়; প্রাচীন, পতিত গৃহের মেজে তাহার পরিত্যক্ত মূষ্টি-কাবৃত হয়। কৈচোর এসব কাজ কিরূপে নাশিত হয় বুঝিবার আগে, তাহার শরীর-তত্ত্ব অহুসন্ধান করা যাউক। তার জন্য যতটুকু সময় ও মনোযোগ দরকার, পাঠক, তুমি তাহা দিতে কি কুণ্ঠিত? নিকৃষ্ট জীবের পর্যালোচনার আমরা কত মহৎ সত্য লিখি। মাহুসাদি উচ্চ জীবকে বুঝিবার একমাত্র উপায় কীটাদি নীচ জীবের আলোচনা করা। সংসারে ছোট বড় বত প্রাণী আছে সকলেই আমাদের আলোচ্য, বিজ্ঞানের চোখে সকলেই সমান। জীবের ক্রমোন্নতি প্রাণীবিদ্যার একটি দৃঢ় মূলভূত সত্য। ইহা কি চমৎকার!

২। বাসস্থান।

কৈচো ভিজে স্যাৎসেতে দ্বারগায় থাকিতে ভাল বাসে। বর্ষাকালে ইহাকে জমির অন্তর্গত পান্ডুরায় বসে, কিন্তু ভাষ্য

বিবর কখনও কখনও ২।৩ হাত গভীর হইয়া থাকে। বাসস্থান খুঁড়িবার সময় কৈচো কতক মাটি ঠেলিয়া ফেলে, কতক উদরস্থ করে, এবং ইহার পায়ু দ্বারা মৃত্তিকা নির্গত হইতে থাকে। আমি একটি টবে মাটি পুরিয়া ওটাকত কৈচো ছাড়িয়া দিলাম, ৩৪ মিনিটের মধ্যেই তাহার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ মাটি খুব চাপিয়া, শক্ত করিয়া একটিকে রাখিলাম; সে তাহা খুঁড়িতে একেবারেই যেন অক্ষম, মনে হইল, এদিক ওদিক নরম মাটি খুঁড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আর একটিকে তাহার সাহায্যার্থে দিলাম ও গায় গায় জড়াইয়া একত্রে, এঃ বাড়াইয়া খুঁড়িতে লাগিল

আর একজন আর একটু, অপরূপ ও একটু করিয়া পন ঘণ্টার মধ্যে তাহার অন্তর্হিত হইল। কৈচোর বিবর সোজা নয়, বক্রাকৃতি; কখনও কখনও তাহার মুখ পাতা ইট পাটকেলের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, বাহাতে শত্রু না আসিতে পারে। তাহার বল্লীক পায়ু পরিত্যক্ত মল মাংস। একজাতীয় কৈচোর (বাহাকে ঘাসাচ্ছাদিত মাঠ ময়দানে সচরাচর পাওয়া যায়) বল্লীক, শুভের ন্যায়। এই শুভ এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি, বা ততোধিক উচ্চ হইতে পারে। আর একজাতীয় কৈচো আছে তাহার টিবি ছোট ছোট, পৃথক পৃথক, গভীর রাখিয়া। জলের মধ্যে কৈচো অধিকক্ষণ বাঁচিতে পারে না, আমি কতকগুলিকে বিকালে একটি জলপূর্ণ পাত্রে

রাখিয়া, তার পরদিন সকালে দেখিলাম তাহার মৃতবৎ; পরে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া গেল। তজ্জনাই বোধ হয় বর্ষার পর অনেক মরা কৈচো দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। খাদ্য, পাক-প্রণালী।

কৈচো রাজিকালে আহাৰাশেষে বাহির হয়। দিনের বেলা অনেক শত্রু পাখী, পিপড়া ইত্যাদি। অতএব তখন প্রায়ই লুকাইয়া থাকে। কেবল নিসেক (fertilisation) কার্যের সময় মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কৈচোর প্রধান খাদ্য মৃত্তিকা এবং পাতা, কিন্তু অন্যান্য বহুতর জিনিস খাইয়া থাকে, এমন কি চর্কি, মাংস পণ্যস্তও ছাড়ে না। খাইবার সময় মুখ এবং তাহার নিম্নস্থিত ক্ষীত গলদেশ (pharynx), বাহির করে। কৈচোর দাঁত

১ ইহা দেখিবার জন্য একটি মোটা গোছের কৈচো লইয়া তাহাকে ক্লোরাভর্ম দ্বারা বা মদের ভিতর ডুবাইয়া মারিয়া ফেল। পরে তাহার পৃষ্ঠভাগে (যে ভাগ অপেক্ষাকৃত কাল) মাঝামাঝি মুখ হইতে গাত্রের চৰ্ম্ম খুব ছোট ধারাল কাঁচির দ্বারা সতর্কতার সহিত ব্যবচ্ছেদ কর। পরে pie dish এর ন্যায় পাত্রে জলের নীচে কর্কে বা কোন নরম কাঠ খণ্ডে ব্যবহিত চৰ্ম্ম দুই পাশে আলপিন দ্বারা বিদ্ধ কর। উপরে পাক প্রণালী, এবং তাহার নীচে শালা হুতার ন্যায় মাংস প্রণালী দেখিতে পাইবে। কর্কে জলে ডুবাইবার জন্য তাহার নিম্নভাগে দিয়া কি অন্য কোন ভারি পদার্থের পতর মারিতে কিবা কর্কের নিম্নভাগ ও পার্শ্বভাগ দুই দ্বারা মোড়াইতে হয়।

নাই; তাহার খাওয়া চিবান নয় এক রকম চোষা। আমি উপরে যে টবের কথা বলিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি শুক পেয়ারার পাতা রাখিয়াছিলাম; তাহার শির-গুলি ছাড়িয়া ছাল চুসিয়া লইয়াছে, এবং পাতা কয়টি জালের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত মাটি কিম্বা তাহার অঙ্গাণু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার ভিতর অনেক অতি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড দৃষ্ট হইবে। এ সব নিশ্চয়ই সে খাইয়াছিল। কি কিন্তু জনা? মাটি বা পাতাতে শরীর পুষ্টিকারক জীবন পদার্থ (organic substance) বেশ আছে, কিন্তু ইটে নাই। তবে ইচ্ছা করিয়া এত ইটের টুকরা খাইয়া থাকে কেন?

এস্থলে কঁচোর পাকযন্ত্র সম্বন্ধে ছুট কথা বলা আবশ্যিক। ইহার গঠন কৌশল অতি চমৎকার।

‘গল’ শব্দ গল্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ‘গল্‌’ ভোজন করা। যে রাস্তা দিয়া ভুক্তবস্তু মুখ হইতে অঁঠরে যায়, তাহার মুখের দিকের অংশকে গলদেশ বলা হইল। গলদেশের নিম্নে গলনালী। প্রচলিত ভাষায় ‘গলা’ দ্বারা আ



মরা যাহা বৃদ্ধি ‘গল’ এবং কষ্ট হইতে ভিন্ন বৃদ্ধিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ মুখ, মুখের পর পূর্বোল্লিখিত অত্যন্ত ক্ষীণ গলদেশ তার নীচে লম্বা গলনালী। গলনালীর নিম্নভাগ ক্ষীণ। এই ক্ষীণতাংশের আবরণ অত্যন্ত স্থূল ও কঠিন, ইহাকে

ইংরাজীতে ক্রুপ বলে। ইহার নীচে অঁঠর, পরে অভ্যন্ত লম্বা অঙ্গাণু। ক্রুপের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় স্নাতিশয় বলবান মাংশপেশী আছে। আহারের সময় এই সকল মাংশপেশী সঙ্কোচে চালিত হয়, এবং ক্রুপের ভিতর ইষ্টক খণ্ড সমূহের সাহায্যে পত্রাদি খাদ্য চূর্ণীকৃত হয়। কঁচোর দাঁত নাই পূর্বেই বলা হইয়াছে ইটের টুকরা দাঁতের কাষ করে।

৩। স্নায়ুপ্রণালী, ইন্দ্রিয়, মান-সিঃ বৃত্তি ইত্যাদি :

স্নায়ুপ্রণালী স্ত্রের নায়, মধ্যে শ, আংগাদের মত পাকপ্রণালীর -নিম্নভাগে। কিন্তু ইহার

ত সংযুক্ত, গলদেশের উপর, একটি বিশেষ স্ত্রলাংশ (ganglion) দেখিতে পাওয়া যায়। কঁচোর চোখ নাই। গাত্র দ্বারা আলোক প্রবিষ্ট হইয়া এই স্ত্রলাংশতে লাগে, তাহাতেই সে আলোক অন্ধকার বৃত্তিতে পারে, রাত্রি দিন চিনিতে পারে, দিনের বেলায় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। যদি তাহার অগ্রভাগ ঢাকিয়া, কেবল পশ্চাভাগ আলোকিত করা যায় তাহা হইলে আলোক-রশ্মি গলার উপরস্থিত স্নায়বাংশে প্রবেশ করিতে পারে না, কাজে কাজেই সকল অবস্থায় কঁচোরও আলোক বোধ জন্মে না। তাহার কাণ নাই। ঢাক ঢোল বাজাও শুনিতে পাইবে না, নির্ভয়ে চরিবে। কিন্তু যে পাত্রে সে থাকে তাহা যদি কোন মতে স্বল্প পরিমাণেও চালিত হয়, তাহা হইলে

ভয় পায়, এবং দ্রুতগতি বিবরে প্রবেশ করে। এস্থলেও শব্দ হিল্লোল, সম্ভবতঃ যে স্নায়ুর কথা এই মাত্র বলা হইল তাহা দ্বারা কাজ হবে। কেঁচোর স্পর্শ শক্তি খুব প্রবল। বিবর হইতে বাহির হইবার সময় মুখ বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়া চারিদিকের খবর লয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে আমার টবস্থিত একটা কেঁচো বিবর খুঁড়িবার সময় শরীরেব অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া ক্রমপে নরম মাটি খুঁজিতে লাগিল। কেঁচোর আশ্বাদেন্দ্রিয় বেশ আছে, খাদ্য দ্রব্যের ভাল মন্দের ভারতম্য বোধ বিলক্ষণ প্রদর্শন করে। প্রাণীতত্ত্বসম্বন্ধীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, সে কোন কোন গাছের পাতা খুব ভাল বাসে, কোন কোন গাছের পাতা আদৌ স্পর্শ কবে না। তাহার স্রাণেন্দ্রিয় তত প্রবল নয়; চোনা, ছকার জল প্রভৃতি দুর্গন্ধময় পদার্থ তাহার বাসস্থানের উপর চালিয়া দিলে শুনিয়াছি সে বাহির হয়; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের গন্ধের দরুণ কি ভগ্নিশ্রিত হানিজনক পলাণের দরুণ এরূপ ব্যবহার করে তাহার মীমাংসা আবশ্যক। কিস্কিলিকের বংশ বর্দ্ধন স্পৃহা এত বলবতী যে দিনের বেলাও যখন ভরে বিবরের বাহির হয় না—তুই জনে সংযুক্ত হইয়া কখনও কখনও বাহিরে পড়িয়া থাকে।

পূর্বে দেখা গিয়াছে ক্রমপে তুইটী কেঁচো গায় গায় ঝড়াজড়ি করিয়া একত্রে কঠিন মাটি খুঁড়িয়া বাসস্থান নির্মাণ করিল। এই কারণে কি তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? পর্যটক, জুদি, হস্ত বলিবে,

“কেঁচো আবার জন্তু তার আবার বুদ্ধি।” বাসস্থান নির্মাণ করা, রাজিতে চরা, দিনে লুকাইয়া থাকা, এ সব অভ্যাস কাজ, ছোট বড় সব কেঁচোই করিয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধির দরকাব নাই। কিন্তু আমি যে স্থান হইতে উপরোক্ত কেঁচোদ্বয়কে লইয়াছিলাম, সেখানকাব জমি খুব নরম, তুই জনে মিলিয়া যে শক্ত মাটি অপেক্ষাকৃত সহজে খণন কবিতে পারিবে, তাহা তাহাদের অভ্যাস হইবার কোন সুবিধা ছিল না, তবু সে তাহারা একত্রে কাজ কবিতে আরম্ভ করিল, তাহা কতকটা বুদ্ধির পরিচয় নথ ত আর কি বলিব? প্রাণীতত্ত্ববিৎ মহা পণ্ডিত মৃত ডারউইন কেঁচো কেমন বুদ্ধি খাটাইয়া, যে পাতার যে দিক ধরিয়া লইয়া গেলে তাহার বিববেব মুখ উৎকৃষ্টরূপে বন্ধ হইবে, ঠিক সেই দিক ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, দেখিবা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমরা যখন বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া কোন বিষয় ভাবি, তখন বাহাজ্ঞান শূন্য হই। কেঁচোও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে; সে যখন চরে বা অন্য কোন কাজ ব্যাপৃত থাকে তখন আলোক-রশ্মি বা শব্দহিল্লোল তাহাকে তত উত্তেজিত করিতে পারে না। মন না থাকিলে মনোনিবেশ করা হয় না; অতএব কেঁচোরও মন আছে এরূপ সাব্যস্ত করা যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

কেঁচোর শরীর বহু সংখ্যক ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত

সুচারুরূপে দেখা যায় না, কিন্তু আঙ্গুল চালাইলে, তাহাতে বাধে, খরখর করে। চলিবার সময় কৈচোর পৃষ্ঠভাগে রক্তবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ, সঙ্কোচশীল একটা লম্বা নল দেখা যায়। ইহার গঠন ও কার্য্য অত্যন্ত জটিল এখানে তাহার বর্ণনা করিব না। এই মাত্র বলিয়া রাখি, উহাতে রক্তের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কৈচোকে, কাটিলে, বাহা নির্গত হয়, তাহা রক্ত নয়। যে জলীয় পদার্থ কৈচোর বাস্তবিক রক্তের কাজ করে তাহা শাদা, রক্তের মত আদৌ দেখিতে নয়। কৈচোর নিকট সম্বন্ধীয় জলবাসী অনেক কীটের খাস প্রাণীদের জন্য কানকা (Gills) আছে; তাহার নিজের সেরূপ কোন যন্ত্র নাই। তাহার খাস প্রাণস কাৰ্য্য ছিদ্র-বহুল গাত্র দ্বারা সমাধা হয়।

কৈচোর পুরুষ—এবং নারী অঙ্গ দুই একজে প্রত্যেকে বিদ্যমান। কিন্তু তাহাদের পরস্পর সংযোগে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কৈচোর দেহাভ্যন্তরস্থিত পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায়; তাহাদের বিবাহ, ভিন্ন কৈচোর নারী ও পুরুষের সহিত হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটা কৈচো পরস্পর সম্মিলিত না হইলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না।

৫। কৃষি কার্য্য।

কৈচো আপন বাসস্থানের জন্য বিবর খুঁড়িয়া, মাটি উল্টিয়া পাণ্টিয়া দিয়া বৃষ্টি ধারার প্রবেশের ও চালনার সুবিধা করিয়া দেয়। যেখানে তাহারা অনেক থাকে সে-

খানে এইরূপ শত শত বিবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিবরের দরুণ জমি নিঃসন্দেহ অনেকটা সিক্ত থাকে, এবং কৃষি কার্য্যের সুবিধা হয়। কৈচো ইট পাটকেলের ন্যায় বহুতর বীজ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ বীজ পরিভ্যক্ত মলের সহিত বহির্গত হয়; তাহার উৎপাদিকা শক্তি কখনও কখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ বজায় থাকে, কালে উহা অকুরিত হয়।

কৈচো জমি প্রস্তুত করিতে, এবং তাহাকে সারবান্ করিতে বড় পটু। কোন স্থলে ইটপাটকেল কাকরাদি ছড়াইয়া রাখিলে, সে নিম্নস্থ মাটি উঠাইয়া ক্রমশঃ উহাকে আবৃত করে। এই উত্তোলিত মৃত্তিকা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়; কালে ইহা দ্বারা উর্বর শয্যাংপাদক জমি তৈয়ার হইতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে কৈচো কিরূপে এবং কি জন্য জমির সহিত মিশ্রিত ছোট ছোট ইষ্টক খণ্ডাদি উদরস্ত করে। গাছপালার শিকড়ের নিকট হইতে এই সকল হানিজনক জিনিস এক একটা করিয়া বাহিরে সরাইয়া সে নিশ্চয়ই তাহাদের বৃদ্ধির বিশেষ আত্মকূল্য করে। বিবরের মুখ বুজাইবার জন্য যে সকল পাতা জমির নীচে লইয়া যায় তাহা কালে পচিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়। আবার, পাতা কৈচোর একটা প্রধান খাদ্য। উদরস্থ পাতার টুকরা সকল হইতে শরীরের পোষণোপ-যোগী পদার্থ গৃহীত হইলে, অবশিষ্টাংশ মলের সহিত নির্গত হয়, ক্রমে মাটির সহিত মিশিয়া যায়, এবং তাহার উর্বরতার বৃদ্ধি

করে। একটা টবে একজন কেঁচোতজ্জ্বল-সন্ধারী পণ্ডিত বালি পুরিয়া তাহাতে পাতা ও কতকগুলি কেঁচো রাখিয়াছিলেন, দিন-কতকের মধ্যেই ঐ বালি উত্তম সারজমি হইয়া দাঁড়াইল।

৬। রক্ষাকার্য্য।

ইটপাটকেলাদির ন্যায় অন্যান্য অনেক জ্বিনিস কেঁচোব মাটিতে আবৃত হইতে পারে। এইরূপে বহুতর প্রাচীন পদার্থ যাহা এককালে জমিব উপর পড়িয়াছিল, কেঁচোর দৌলতে জমিব নীচে সূচাক্রমে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন অট্টালিকা মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশিষ্ট অংশাদি তাহাদের নীচে হইতে মাটি তোলার জন্য দমিয়া যায়, এবং ঐ স্তূপীকৃত কীটোত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া সংরক্ষিত হয়। এজন্য পুৰাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের কাছে কেঁচো অবশ্যই ধন্যবাদার্থ।

৭। ক্ষয়কার্য্য।

পৃথিবীর উপরিভাগ (ভূপৃষ্ঠ) বাতাস, বৃষ্টি, বরষা তাপ প্রভৃতিব কার্য্যে বৎসরের পর বৎসর একটু একটু করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। কেঁচো এই ক্ষয়কার্য্যের সহায়তা করে। তাহার বিবর দ্বারা বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া কেবল যে জমিব উপকার কবে তাহা নয়, অপকাবও করিয়া থাকে—জমি কমজোর হইয়া ধসিতে পাবে, ধসিলে তাহাকে ধুইয়া লইয়া যাটবাব বিশেষ সুবিধা হয়। কেঁচোর ভক্ষিত মাটি, ইটপাটকেল, কঙ্কবাদি অনেকটা তাহাব বিবরের মুখে জমিব উপর পরিত্যক্ত হয়। উহা, বিশেষতঃ, বেলে জমির কাঁটেব গুটির ন্যায় মল। বর্ষাকালে সহজে ধৌত হইয়া যায়, বৃষ্টিব জল মিশ্রিত বালির বুদ্ধি সাধন কবে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে, যে ঐ বালি নালা, খাল দ্বাবা নদীতে গৃহীত হয়, এবং নদী দ্বারা সমুদ্রে বাহিত হয়।

ত্রিপ্রমথনাথ বসু।

ভক্ষ্যদ্রব্য কয় প্রকার।

—:—

আমাদের দেশে আহারীয় দ্রব্য সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ মাক্ষিক বা বর্জক। অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা চারি শ্রেণীতে সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যকে বিভক্ত করিয়া থাকেন যথা ১। সত্বকারী (Protoide)। ২। তৈল বা চর্বিযুক্ত (Lipoids)। ৩। বেষ্টনীয়। (amyloids)। ৪। খাদ্য।

১। সত্বকারী অর্থাৎ প্রাণকাবী পদার্থে সচরাচর চারিট মৌলিক বা ভৌতিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—কার্বন, অক্সিজেন, জলজান ও অক্সিজেন। কখন কখন গন্ধক ও ফস্ফোরস্ও পাওয়া যায়। ময়দার, ডিম্বের, মাংসের ও ছন্ধের সারাংশ এই জাতীয় পদার্থ।

২। চর্বি। ইহাতে তিনটি ভৌতিক

পদার্থ পাওয়া যায় যথা;—অঙ্গারজানি জলজান ও অন্নজান। সকল প্রকার চর্কি-ও তৈল এই জাতীয় পদার্থ।

৩। শ্বেতসার (starch) ইহাতেও তিনটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় যথা;—অঙ্গারজান, জলজান ও অন্নজান, কিন্তু চর্কি-জাতীয় পদার্থে জলজানের ভাগ অধিক। গম্ভ, শর্করা, আবারুট ইত্যাদি এই জাতীয় পদার্থ। আমরাদিগের প্রায় সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতসার অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তণুল, ময়দা, আলু ইত্যাদিতে অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতসার আছে।

৪। ধাতব পদার্থ ও জল। এই দুই পদার্থ সকল ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যেই নূন্যাদিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত চারি বিভাগের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য অধিক কাল পর্যন্ত আহাৰ করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত জীবন ধারণোপযোগী আহাৰে এই চারি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু কোন সঙ্গকারী পদার্থ যদি সহজে জীর্ণ হয় তাহা হইলে অন্য জাতীয় পদার্থের সাহায্য ব্যতীত ইহা জীবন ধারণোপযোগী হইতে পারে। মনুষ্য দেহে সঙ্গকারী পদার্থ অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, এই জন্য এই জাতীয় পদার্থ ব্যতীত কখনই প্রাণ ধারণ হইতে পারে না, সঙ্গকারী পদার্থের সহিত ধাতব-পদার্থও নিত্য আবশ্যকীয়। কিন্তু শ্বেতসার ও চর্কিজাতীয় পদার্থ প্রাণ ধারণ জন্য

নিত্য আবশ্যক নহে। সঙ্গকারী পদার্থ যে আমরাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রকৃত মনুষ্যদেহেই আমরাদিগের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং ঐ ক্ষতি পূরণের জন্য নূতন মাল মশলার প্রয়োজন হইতেছে। প্রস্রাব, ঘন ও অন্যান্য নিস্রবণ দ্বারা অহর্নিশ এক প্রকার ক্ষয়জাতীয় (worn) পদার্থ নির্গত হইতেছে। আহাৰ কর আর না কব ইহা (urica) নির্গমনের বিরাম নাই। এই নিস্রবণ শরীরভা-ত্তরিক সঙ্গকারী পদার্থের রূপান্তর মাত্র। এই কারণে সঙ্গকারী পদার্থ প্রধান ভক্ষ্য-দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

সঙ্গকারী পদার্থে চারিটি মৌলিক পদার্থ দেখা যায়। ঐ চারিটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা মনুষ্য দেহে গঠিত হইয়াছে—(এতদ্ব্যতীত ধাতব পদার্থ ও জল পাওয়া যায়।) সঙ্গকারী পদার্থ রাসায়নিক বিচ্ছেদ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে জলজান, অন্নজান, ক্ষারজান ও অঙ্গারজান এই চারিটি মৌলিক পদার্থে গঠিত। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে মনুষ্যদেহ ও সঙ্গকারী পদার্থের রাসায়নিক ঘটন একই। এই কারণে সঙ্গকারী ও ধাতব পদার্থ জীবন ধারণোপযোগী হইয়া থাকে। অঙ্গারাস carbonic acid ও জল যাহা সর্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর-জাত দ্রব্য মধ্যে পাওয়া যায় তাহাও সঙ্গকারী পদার্থের অঙ্গজান ও অঙ্গারজান হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

যদিও সঙ্গকারী পদার্থ চারি প্রকার ভক্ষ্য-দ্রব্যের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং কোন কোন

অবস্থায় অন্য শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত প্রাণ-
ধারণোপযোগী হইতে পারে কিন্তু ইহা
অসুবিধা জনক ও অপরিমিত খাদ্য। আমি
ইহা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা
করিব। ডিম্বসার (albumen) এক প্রকার
প্রধান সহকারী পদার্থ। ইহার শতভাগের
মধ্যে ৫৩ ভাগ অঙ্গারজেন ও ১৫ ভাগ
ক্ষারজান পাওয়া যায়। যদি কোন
ব্যক্তিকে কেবল ডিম্বের শ্বেতভাগ আহার
দেওয়া যায় তাহা হইলে মোটামুটি ধরিতে
গেলে সে ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষারজান ভাগের
সহিত সার্কি তিন ভাগ অঙ্গারজান আহার
করিবে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে
একজন সুস্থকায় পুষ্টি মনুষ্য যে নিজ ভা-
র ও স্ভাবিক উত্তাপ রক্ষণের উপযুক্ত ও
মধ্যমিত রকম ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহার
দেহ হইতে চারি সহস্র গ্রেন অঙ্গার ও তিন
শত গ্রেন ক্ষারজান নির্গত হয় অর্থাৎ ক্ষার-
জানের তেরগুণ অঙ্গার নির্গত হয়। অতএব
যদি কোন ডিম্বসার . ত তাহাকে ৪০০০
সহস্র গ্রেন অঙ্গার লইবে হয় তাহা হইলে
ঐ পদার্থ ৭৫৪৭ গ্রেন আহার করিতে হয়।
কিন্তু ৭৫৪৭ গ্রেন ডিম্বসারে ১১৩২ গ্রেন
ক্ষারজান আছে অর্থাৎ যত ক্ষারজানের
আবশ্যক তাহার প্রায় চারিগুণ অনর্থক আ-
হার করিতে হয়। যে ৩০০ গ্রেন ক্ষারজেন
আমাদিগের শরীর রক্ষার্থ আবশ্যক তাহা
আমরা অর্কসের মাংস হইতে পাইতে পারি,
কিন্তু যদি কেবল সহকারী পদার্থই আহার
করা যায় তাহা হইলে ৪০০০ গ্রেন অঙ্গার
জান জন্য ২ সের চর্কিবিধিষ্ট মাংস আহার

করা আবশ্যক। অতএব যদি কেবল সহ-
কারী পদার্থই আহার করা যায় তাহা হইলে
শরীর রক্ষার্থে ইহা অনর্থক অধিক পরিমাণে
আহার করিতে হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার একটি প্রধান নিয়ম এই যে
আহার বলবর্দ্ধক ও শরীর রক্ষার্থ উপযোগী
হইবে অগচ পরিমাণে অধিক হইবে না।
কিন্তু সহকারী পদার্থ দ্বারা যদি জীবন
সাধন করিতে হয় তাহা হইলে এই নিয়ম
রক্ষা হয় না এবং তজ্জন্য অল্প সময়ের
মধ্যেই স্বাস্থ্য ভয়া হইয়া শরীর দুর্বল হইয়া
পড়ে। এই বিশেষ কারণে মিশ্র আহার
অর্থাৎ সহকারী ও তৈল বা শ্বেতসার জা-
তীয় পদার্থ মিশ্রিত আহার মনুষ্যের পক্ষে
বিশেষ উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। প্রথম তিন
শ্রেণীর খাদ্য অর্থাৎ সহকারী, চর্কি ও
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ প্রধান, অর্থাৎ প্রাণ-
ধারণক খাদ্যমধ্যে পরিগণিত। উক্ত তিন
প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেই জল ও ধাতব
পদার্থ পাওয়া যায়। শরীরের পুষ্টির জন্য
যাহা আবশ্যক তাহা কেবল মিশ্র আহারেই
পাওয়া যায়।

শরীর তত্ত্ববিদেরা খাদ্যদ্রব্যকে দুই
শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা; ১। উত্তাপ
উৎপাদক খাদ্য, (fuel food) এবং ২। গ্রন্থি
উৎপাদক বা শরীর নিষ্কাশক খাদ্য (tissue-
food)।

১। উত্তাপ উৎপাদক খাদ্য। শ্বেতসার
ও তৈল জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত।
যদিও চর্কি ব্যতীত এই দুই জাতীয় খাদ্য
অন্য কোন পদার্থের গঠনের সাহায্য করে

না, কিন্তু উত্তাপ উৎপাদন করিয়া শরীর-
ভাস্করিক চর্চিকে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে দেয়
না । এই কারণে উত্তাপ উৎপাদক খাদ্যও
প্রাণধারক খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত ।
যেমন কলের গাড়ির এঞ্জিন চালিত হই-
বার জন্য পাথুরিয়া কয়লা বা জ্বালানি
কাঠের আবশ্যক সেইরূপ উত্তাপ উৎপাদক
খাদ্যও আমাদের দেহের উত্তাপ কার্যের
জন্য অত্যাৱশ্যকীয় ।

২। গ্রন্থি উৎপাদক বা শরীর নির্মাণক
খাদ্য । এই শ্রেণীর খাদ্য দুই প্রকার কার্য
করিয়া থাকে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অ-
হর্নিশি প্রতি মুহূর্ত্তেই শরীরের ক্ষয় হইতেছে
এবং এই ক্ষতিপূরণের জন্য এই শ্রেণীর খাদ্য
নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই কার্য বাতীত
নুতন গ্রন্থি নির্মাণের জন্যও এই শ্রেণীর
খাদ্য নিত্যন্ত আবশ্যকীয় । অতএব শরীর
গঠন ও ক্ষতিপূরণ এই উভয় কার্যের জন্যই
এই খাদ্যের প্রয়োজন হয় । পূর্বে বলা
হইয়াছে যে এই খাদ্য উত্তাপ ও উৎপাদন

করিতে পারে । কিন্তু যদি উত্তাপ উৎপাদন
ও শরীর নির্মাণ উভয় কার্যের জন্য এ
খাদ্য আহার করিতে হয় তাহা হইলে অবশ্য
অধিক পরিমাণে আহার আবশ্যক । স্বভা-
বের রীতি এই যে যখন মনুষ্যদেহে কোন
শ্রেণীর আহার অধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট
করান যায়, তখন যতটুকু আবশ্যক ততটুকু
ব্যবহৃত হইয়া বাকিটুকু শরীর নির্গমের পথ
দ্বারা নির্গত হইয়া যাইবে । এই স্বাভা-
বিক নিয়ম জন্য অধিক জল পান করিলে
প্রস্রাব হইয়া নির্গত হয় ও অন্যান্য খাদ্যও
প্রস্রাব ও মলদ্বারা নির্গত হইয়া যায় ।
কিন্তু অধিককাল পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম
ভঙ্গ করিলে স্বভাব আপন রীতানুসারে
কার্য করিতে অক্ষম হয়, সুতরাং অনাবশ্য-
কীয় দ্রব্য শরীরভাঙ্গুরে থাকিয়া দেহকে
পাণ্ডিত ও দূষিত করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন করিয়া
দেয় । এই কারণে মিশ্র আহারই কেবল যথা
নিয়মে পুষ্টিসাধন ও উত্তাপ রক্ষণ করিয়া
শরীরকে সুস্থ পালন করিতে পারে ।
শ্রী ৩। যথা বন্দোপাধ্যায় ।

শঙ্কর মণ্ডন ।

মণ্ডন । তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য উপাস-
নায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য নাই বা হইল—
কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাদৃশ্য প্রতি-
পাদক হউক ।

শঙ্কর । যদি সাদৃশ্য বোধক হয় তবে
কি কেবল চৈতন্য সঙ্ঘে সাদৃশ্য বলা হইল
অথবা সার্কজ্য, সার্কজ্য, সার্ক শক্তি প্রভৃতি

সঙ্ঘ সঙ্ঘে ? চৈতন্য সাম্য সকলেরই বি-
দিত তাহার উপদেশের কোথা প্রয়োজন
নাই । আর যদি সার্কজ্যাদি সাম্য হয় তবে
তোমার নিজের সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধ হয়,
কারণ অভেদ ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে
পারে না ।

মণ্ডন । পরমাত্মার ন্যায় জীবও নিত্য

চিদানন্দময়, কিন্তু অবিদ্যাবৃত। “তত্ত্ব-
মস্যাদি” বাক্য নিত্য চিদানন্দ স্বরূপের
সাম্যবোধক হইলেইত পূর্বোক্ত কোন
দোষ ঘটিবে না।

শঙ্কর। হে বিদ্বন্ যদি জীবকে অবি-
দ্যাবৃত নিত্য চিদানন্দ স্বরূপই বলিতে হইল
তবে তত্ত্বমস্যাদিবাক্য জীবব্রহ্মের ঐক্য
বোধক হইতে কোন আপত্তি দেখা যায়
না, যেহেতু অজ্ঞান দশায় নিত্য চিদানন্দ
স্বরূপের ন্যায় জীবব্রহ্মের ঐক্যেরও প্রকাশ
না হইতে পারে।

মণ্ডন। হে ষ্টিবর জীবব্রহ্মের চৈ-
তন্য বিষয়ে সাম্যই বলা বাউক, যেহেতু
জগৎ চিৎস্বরূপ হইতে উৎপন্ন। তদ্বারা
চার্কারের পরমাণুবাদ এবং সাংখ্যমতের
প্রধানবাদ নিরস্ত করা হইয়াছে।

শঙ্কর। হে মণ্ডন, তাহা হইলে “তৎ
ত্বমসৃশ মস্তি” তাহা তোমারই ন্যায় এই
রূপ প্রয়োগ হইত, “তত্ত্বমসি” “তুমিই তাহা”
এইরূপ হইত না। আর “তৈত্বেত” তিনি
দেখিলেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জড়বাদ
পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে, পুনরুক্তির কোন
প্রয়োজন নাই।

মণ্ডন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য যদিও সাদৃশ্য
বোধক না হউক তথাপি তাহাদের প্রতি-
পাদ্য অভিন্ন প্রত্যক্ষরূপ জ্যেষ্ঠ প্রমাণের
বিরোধী, অতএব অসঙ্গত। তবে ‘সাধ্যায়
অধ্যয়ন করিবে’ এই বিধি অবলম্বন ক-
রিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ও জপ করিতে
[হয় মাত্র।

শঙ্কর। অক্ষি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যদি

ভেদ জ্ঞান লাভ হইত তবে শ্রুতান্ত্র অ-
ভেদ বাক্যের বাধা হইত। কিন্তু ভেদ
জ্ঞান অভাবায়ক, অক্ষির সহিত তাহার
সন্নির্কর্ষ অসম্ভব। *

* কাগজ হইতে কলম ভিন্ন, কাগজ
কাগজের মধ্যে কলমের অভাব এবং
কলমের মধ্যে কাগজের অভাব। কিন্তু
এস্থলে যে কাগজ ও কলমের অন্যান্য-
ভাব পদার্থই প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বিষয় তাহা নয়।
এই মাত্র বলা যায় যে কাগজ যাহা কলমও
যে তাহা এই ভাব পদার্থই প্রত্যক্ষ হই-
তেছে না। কাগজের মধ্যে যেমন তাহার
গুরু বর্ণ আছে যদি তাহার মধ্যে কলমও
থাকিত তবে প্রত্যক্ষ হইত। ইহা হইতে
অনুমান করা হয় কাগজ কলম হইতে ভিন্ন।
কিন্তু অনেক বিষয় সত্য হইতে পারে
অথচ অতি দূরাত্মসামীপ্যাদিঙ্গিয় ইত্যাদি
কারণে প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। তোমার
হয়ত দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দূরে একটি বৃক্ষ আছে
তুমি দেখিতে পাও কিন্তু আমি পাই না,
তাহা বলিয়া আমার অপ্ৰত্যক্ষ হওয়াতে
ইহা প্রমাণ হইল না যে বৃক্ষ নাই, ঠিক
এইরূপ অভেদ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ইহা
প্রমাণ হয় না যে অভেদ নাই, ইহা বলা
ঠিক হয় না যে প্রত্যক্ষ দ্বারা ভেদ জানা
যায়। জীব ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধেও এই
মাত্র বলা যায় অজ্ঞান দশায় প্রত্যক্ষদ্বারা
অভেদ জানা যায় না। কিন্তু এরূপ
বলিলে জ্ঞান দশায় প্রত্যক্ষ শ্রুতান্ত্র অভেদ
বাদের সহিত বিরোধ হয় না। প্রত্যক্ষ
প্রমাণ অদ্বৈতবাদের বিরোধী এইরূপ ভ্রমে
অনেকেই পড়িয়া থাকেন; কিন্তু অভাব
অথবা নিষেধ বাক্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ
অসম্ভব। প্রত্যক্ষজ্ঞান ইঙ্গিয় সন্নির্কর্ষ-
জনিত, অতএব ভাব পদার্থ সম্বন্ধেই তাহা
সম্ভব। যেখানে প্রত্যক্ষ ব্রব্য নাই বলা

মণ্ডন। আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যখন জীবাত্মার এই ভেদ বোধক বিশেষণ শু আছে তখন ভেদের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও সেই বিশেষণের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ আছে।

শঙ্কর। গুণী ভিন্ন গুণ থাকিতে পারে না, অতএব কেবল বিশেষণের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ অনুমান করা যাইতে পারে না। অবশ্য সেই বিশেষণের আশ্রয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় বলিতে হইবে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় আত্মা সেই আশ্রয়, যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ নাই।

মণ্ডন। সেই বিশেষণের আশ্রয় আত্মার সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ নাই বলিয়াছ, তাহা ভাল বলা হয় নাই, কারণ বাহ্যে-
 ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না থাকিলেও চিত্তরূপ নানাগেন্ড্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছে, যেহেতু চিত্ত এবং আত্মা উভয়ই দ্রব্য, পদার্থ।

শঙ্কর। আত্মা হয় বিতু (সর্বগত) না হয় অণু, উভয়থা সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, যেহেতু সাব্যবের সহিতই সাব্যবের সন্নিকর্ষ দৃষ্ট হয়। আবার পূর্বে যখন ভেদ

হয় সেখানে সেই দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই মাত্র সত্তা অস্বীকার করা হয়; কিন্তু অনেক স্থানে দ্রব্য থাকিয়াও প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। এমন কি কেহ যদি বলে যে সে এই গৃহে একটি ভূত দেখিতেছে, আমি তখন সেই গৃহের ভূত দেখিতেছি না বলিয়া তাহার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হইল না।

ইন্দ্রিয়ের অবিসয় বলা হইয়াছে, তখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই চিত্তকেও ধরা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে চিত্ত কোন পৃথক ইন্দ্রিয় নয়, প্রদীপের ন্যায় লোচনাদি ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যকারী মাত্র।

মণ্ডন। ইন্দ্রিয় লক্ষ্যজ্ঞান যদিও ভেদের প্রমাণ না হউক তথাপি ভেদের সাক্ষি-
 স্বরূপ হউক, কেহই নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করে না। সেই সাক্ষীর সহিত যখন বিরোধ হয় তখন তত্ত্বমদি প্রভৃতি বাক্যে জীববোধের একত্র বুঝাইতে পারে না।

শঙ্কর। অবিদ্যা মায়াযোগে জীব এবং ঈশ্বরের অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াই কিন্তু ঋতি বলিতেছে কৈব-
 বলাবস্থায় তাহাদের অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষ হয়। ঋতির কথা এক অবস্থার, ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য আর এক অবস্থায়, প্রকৃতপক্ষে চক্ষুই অবস্থাভেদে ভিন্ন; অতএব বিরোধ হইতে পারে না। অথবা প্রত্যক্ষের সহিত বি-
 রোধ হইলই বা, যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞাত ভেদ জ্ঞান পূর্ব প্রবৃত্ত অতএব দুর্বল, তাহা চরম প্রবৃত্ত ঋতি প্রতিপন্ন কৈবল্যাবস্থায় প্রত্যক্ষ অভেদ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবে।”

(“পৌর্ক্যাপর্যো পূর্ব দৌর্কল্য” পূর্ব এবং পরজ্ঞানের যদি বিরোধ হয় তবে পূর্বজ্ঞানই দুর্বল। ইহার কারণ এই পূর্ব-
 জ্ঞান পরজ্ঞানের পরে জন্মে নাই অতএব ইহা পরজ্ঞানকে বাধিত করিয়া জন্মে নাই। কিন্তু পরজ্ঞান পূর্বজ্ঞানের পরে জন্মিয়াছে, অতএব পূর্বজ্ঞানকে বাধিত করিয়া জন্ম-
 য়াছে। যেমন শুষ্কিতে যখন রক্ত অম

হয় তখন প্রথমে শুদ্ধিতে রজত জ্ঞান হয়, কিন্তু পরে শুদ্ধিতে শুদ্ধিজ্ঞান হইলে পর রজত জ্ঞান ভ্রম বলিয়া জানা যায়। শুদ্ধি যতক্ষণ, শুদ্ধি বলিয়া প্রত্যক্ষ না হয় ততক্ষণই রজত বলিয়াই বলা যায়, কিন্তু যখন শুদ্ধি বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় কে আর তখন তাহাকে রজত বলিয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞানের অবস্থাতেই জীব ব্রহ্মের ভেদ, জ্ঞান লাভ হইলে সে ভেদ থাকে না।)

মণ্ডন। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা ভেদেদ শ্রুতির বাধা না হইলেও অনুমানদ্বারা ভেদেদ শ্রুতির বাধা হয়, যেহেতু জীব অসর্কজ, ব্রহ্ম সর্কজ, অর্থাৎ ঘটাদি যেমন চিন্ময়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবও সেইরূপ।

শঙ্কর। এই যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভিন্নত্ব অনুমান করিতেছ তাহা কি বস্তুগত না কাল্পনিক। যদি বস্তুগত হয় তবে দৃষ্টান্ত হানি হইল, কারণ ঘটাদির ভিন্নত্ব সম্বন্ধে যখন কোন প্রতিযোগী প্রমাণ নাই, এবং জীবের ভিন্নত্ব সম্বন্ধে আছে তখন ঘটাদির

দৃষ্টান্ত এস্থলে সম্ভব হয় না। আর যদি ভেদ কাল্পনিক হয় আমরাও তাহা স্বীকার করি অতএব সাধনা নিষ্প্রয়োজন।

মণ্ডন। “স্বজ্ঞানাবাধা ভেদবৎ” অর্থাৎ স্বজ্ঞানদ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় না এই আমার সাধা—ঘটাদি স্থলে স্বজ্ঞানদ্বারা ঘট হইতে আমি পৃথক এই জ্ঞান বাধিত হয় না। তুমি বল স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদজ্ঞান বাধিত হয়। অতএব দৃষ্টান্তহানিও হয় নাই, সাধনাও নিষ্প্রয়োজন নয়।

শঙ্কর। স্ব শব্দদ্বারা কি তুমি স্থ পৃথাদিমান্ অথবা তদ্বিধূর আত্মা বলিতে চাও। যদি প্রথমার্থ হয়, আমরাও তাহা স্বীকার করি, তাহা সাধা বিষয় নয়। যদি শেষোক্ত অর্থ হয় তবে আবার তোমার দৃষ্টান্ত হানি হইল। কারণ যে অবস্থায় স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় না আর যে অবস্থায় স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক।

ক্রমশঃ।

যোগিয়া।

০

বহু দিন পরে আজি মেঘ গেছে চ'লে,
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।

সিদ্ধ শ্যাম পত্রপুটে
আলোক বলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন ঘোবন যেন
প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।

জুঁই সরোবর তীরে
নিখাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভূঁয়ে,
অতি মুছ হাসি তার;
বরষার বুষ্টি ধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে
না জানি বা কোন খানে
যোগিয়া রাগিনী গায় করে।

ধীরে ধীরে স্তব্ধ তার
 মিলাইছে চারি ধার
 আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতে।
 গাছ পালা চারি ভিতে
 সঙ্গীতের মাধুরীতে
 মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্ন ছবি।
 এ প্রভাত মনে হয়
 আরেক প্রভাত ময়,
 রবি যেন আর কোন রবি।
 ভাবিতেছি মনে মনে
 কোথা কোন উপবনে
 কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
 চোখে তার অশ্রুরেখা,
 একটু দেছে কি দেখা,
 ছড়ায়েছে চরণ দুখানি !
 তার কি পায়ের কাছে
 বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
 আলো ছায়া পড়েছে কপোলে !
 মলিন মালাটি তুলি গ
 ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
 ভাসাইছে সরসীর জলে !
 বিষাদ কাহিনী তার
 সাধ হয় শুনিবার,
 কোন খানে তাহার ভবন।
 তাহার অঁথির কাছে
 যার মুখ জেগে আছে
 তাহারে বা দেখিতে কেমন !
 একিরে আকুল ভাষা !
 প্রাণের নিরাশ আশা
 পল্লবের মর্দরে মিশালো !

না-জানি কাহারে চায়
 তার দেখা নাহি পায়
 স্নান তাই প্রভাতের আলো।
 এমন কতনা প্রাতে
 চাহিয়া আকাশ পাতে
 কত লোক ফেলেছে নিঃশ্বাস,
 সে সব প্রভাত গেছে
 তা'রা তার নুখে গেছে
 লয়ে গেছে হৃদয়-হতাশ।
 এমন কত না আশা
 কত স্নান ভালবাসা
 প্রতিদিন পড়িছে করিয়া,
 তাদের হৃদয় ব্যথা
 তাদের মরণ গাথা
 কে গাইছে একত্র করিয়া।
 পরস্পর পরস্পরে
 ডাকিতেছে নাম ধরে
 কেহ তাহা শুনিত না পায় !
 কাছে আসে বসে পাশে,
 তবুও কথা না ভাষে
 অশ্রু জলে ফিরে ফিরে যায়।
 চায় তবু নাহি পায়
 অবশেষে নাহি চায়,
 অবশেষে নাহি গায় গান,
 ধীরে ধীরে শূন্য ছিয়া
 বনের ছায়ায় গিয়া
 মুছে আসে সজল নয়ান।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজতরঙ্গিনী ।

—০৫—

ভূষাভোগী ফণারতরোচিঃ সিচয়চারবে ।

নমঃ প্রলীনমুক্তায় হরকল্পমহীকহে ॥ ১

ভালং বহুশিখাঙ্কিতং দধদধি শোভ্রং বহন

নন্তুত—

ক্রীড়ৎকুণ্ডলজ্জ্বলিতং জলধিচ্ছায়াচ্ছকণ্ঠ-

চ্ছবিঃ ।

বক্ষো বিভ্রদহীনকঙ্কচচিতং বদ্ধান্নান্দিস্য বো

ভাগঃ পুষ্পবল্লভগোহস্ত যশসে বামোহথবা

দক্ষিণঃ ॥ ২

পণ্ডিত প্রবর কল্লন ঘাঁহার মঙ্গলাচরণ করিয়া কাশ্মীরের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অদা আমরা সেই দেবাধিদেব কৈলাসনাথের স্ততিগান অবস্কের শীর্ষ মুকুট স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া সেই ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আর্ষাগণের অমৃত প্রসবিনী লেখনী প্রসূত যে কয়েকগান, প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে কাশ্মীরের ইতিহাস “রাজ-তরঙ্গিনী” সর্বোৎকৃষ্ট । গুজ্জরের “রাস-মালা” ত্রিপুরার “রাজমালা” উৎকল দেশের “মাদলাপাঞ্জী” ও রাজস্থানের চারণদিগের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ভারতীয় ইতিহাস সমস্তই রাজতরঙ্গিনী অপেক্ষা আধুনিক । রাজতর-ঙ্গিনী ভারতের একটা ক্ষুদ্র অংশের ইতিহাস

হইলেও ইহাতে ভারতীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্ম কিস্তা সমাজ বিপ্লবের স্তম্ভের ছায়া লক্ষিত হইয়া থাকে । এই গ্রন্থের সাহায্যে আমরা সেই গৌম হর্ব্বণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং তাহার নায়ক যুধিষ্ঠিরাদির সময় নির্ণয় করিতে সক্ষম হই । এই গ্রন্থে ৬৫৩ কলি-গর্ভাক হইতে খ্যাত নামা মোগল সম্রাট জালালোদ্দিন আকবর কর্তৃক কাশ্মীরবিজয় অর্থাৎ ১৪৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ধারা বাহিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে ।

রাজতরঙ্গিনী চারিখণ্ডে বিভক্ত । প্রথম ভাগের রচয়িতায় নাম কল্লন পণ্ডিত । দ্বিতীয় খণ্ডের নাম রাজাবলী, জোনরাজ ইহার লেখন । ত্রীতীয় পণ্ডিত তৃতীয় ও প্রাজাভট্ট চতুর্থ ভাগের রচনা করিয়া “রাজ-তরঙ্গিনী” সমাপ্ত করিয়াছেন ।

কল্লন পণ্ডিত কাশ্মীর দেশীয় মহামাত্য চম্পক প্রভুরপুত্র । তিনি ১১৪৮ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন । তৎপ্রণীত গ্রন্থ ৮ ভরণ্ডে বিভক্ত । ইহাতে ৭৮৫০ শ্লোক আছে । ২৫২৬ পূর্ব্বশকাব্দ হইতে ১০৭০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫৯৬ বৎসরের ইতিহাস কল্লন লিখিয়া গিয়াছেন ।

জোনরাজার রাজাবলীতে দুইটা ভরণ্ড আছে । তাহার শ্লোকসংখ্যা ৯৮০ । জোন রাজ ১৩৩৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন ।

* রাজতরঙ্গিনী । জী.লাকনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ।

জোনরাজের পরবর্তী শ্রীবর পণ্ডিত রাজতরঙ্গিনীর তৃতীয় ভাগ “জৈন রাজতরঙ্গিনী” প্রণেতা। ইহাতে চারিটি তরঙ্গ ও ২২২৫ কবিতা আছে। শ্রীবর পণ্ডিত ১৩৯৯ শকাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন।

প্রাজ্য বা প্রাজ্ঞভট্টকৃত চতুর্থ ভাগ রাজতরঙ্গিনীতে কোন তবঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৩৫ কবিতা আছে। ইহার নাম “রাজ্য বলী পতাকা”

সমগ্র রাজতরঙ্গিনীতে সর্গাশুদ্ধ চতুর্দশটি তরঙ্গ ও ১২০০০ কবিতা আছে।

এই অমূল্য ইতিহাসগ্রন্থ গুণগ্রাহী আকবরের হস্তগত হইলে তিনি ইহা অনুবাদ করিতে অনুমতি দেন। তাহার অনুমতানুসারে খাত নামা আবুল ফাজেল পারস্য ভাষায় রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আহাঙ্গিরের আদেশানুসারে মহম্মদ আলি ও অন্য এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ফরাসী ভ্রমণকারী ডাক্তার বর্ণিয়ার, লম্বাট ওরংজীবের সহিত কাশ্মীরে গমন করিয়া কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের দ্বিতীয় খণ্ডেই এই দেশের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিয়ার ভারতের প্রায় সকল প্রদেশই দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীর ও আমাদের জন্মভূমি বাঙ্গালারই সমধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে “যোগলেরা যে

কাশ্মীরকে ভূসর্গ বলিয়া উল্লেখ করেন ইহা আমার নিকট কোন মতেই অসম্ভব বোধ হইল না। তিনি ভূবনমোহিনী কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।† তাহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তৎপর আরও ২১৩ জন মুসলমান রাজতরঙ্গিনী অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর দেশের ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ১১৪০ হিঃ অব্দে নারায়ণকুল নামক জনৈক কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া “তওয়ারিখে কাশ্মীর” প্রণয়ন করেন।

এসিয়াটিক সোসাইটীর স্থাপন কর্তা সার উইলিয়ম জোন্স এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। ১৮০৫খৃঃ অব্দে খাতনামা কোলক্রক সাহেব কলিকাতা নগরীতে জনৈক মৃত ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারী হইতে একখণ্ড রাজতরঙ্গিনী ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে স্পিক সাহেব লক্ষ্মোনগরে আরও একখণ্ড হস্ত লিখিত রাজতরঙ্গিনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে পণ্ডিত প্রবর হোরেস হেমন উইলসন সাহেব কলিকাতায় আরও একখণ্ড রাজতরঙ্গিনী ক্রয় করিতে সক্ষম হন।

পণ্ডিত প্রবর উইলসন এই তিন খণ্ড হস্ত লিখিত রাজতরঙ্গিনী ও কতকগুলি অনুবাদ অবলম্বন করিয়া “কাশ্মীরের হিন্দু

† Berniers Travels in the Mogul Empire. Vol 11 p 131.

ইতিহাস" শীর্ষক একটি স্মৃতি ও উপাদেশ
সন্দর্ভ লিখিয়া গিয়াছেন। *

এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে রাজতরঙ্গিনী
দেবনাগর অক্ষরে সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচা-
রিত হয়। সোসাইটী সাধারণের সুবিধার
জন্য সমগ্র গ্রন্থ তিন ও চারি টাকা মূল্যে
বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক
সোসাইটীতে আর সুপ্রাপ্য নহে। যাহা
হউক আমরা দেখিয়া স্মৃতি হইলাম যে
“দেশীয় রাজা ও জমিদারদিগের ইতিহাস”
লেখক শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ রাজ-
তরঙ্গিনীর মূল ও বঙ্গাবাদ প্রকাশ করিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা লোকনাথ বাবুর
নাথু সঙ্কল্পের জন্য তাহাকে কৃতজ্ঞতার
সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ঈশ্বর
লোকনাথ বাবুর অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ
করুন। রাজতরঙ্গিনীর এক এক খণ্ড
বঙ্গবাসীদিগের গৃহে গৃহে রক্ষিত হউক ইহাই
আমাদের অভিলাষ। কিন্তু আমাদের
এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে কি? যে দেশে
“লণ্ডন রহস্যের” সহস্র সহস্র গ্রাহক, সেই
দেশে রাজতরঙ্গিনীর আদর হইবে কি?
বঙ্গবাসী অধঃপাতে যাউ ও না। একবার
তোমরা মূল্য ছীন কাচ পরিত্যাগ করিয়া
মরকত মণির আদর কর। একবার তোমরা
বিলাতি তামা মিশান সোনা পরিত্যাগ
করিয়া দেশী স্বর্ণকারের খাটী সোনা গ্রহণ
কর।

এক্ষণে আমরা কল্লণকৃত রাজতরঙ্গিনী
সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত
হইলাম। কল্লণ তাহার পূর্ববর্তী ঐতি-
হাসিক বৃন্দ ও স্বীয় গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে এরূপ
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

* * * * *

পণ্ডিত প্রবর কল্লণ তাহার পূর্ববর্তী

ঘটনা সমূহ দেশপ্রচলিত প্রবাদ হইতে
সংগ্রহ করেন নাই। তাহার পূর্বেও কা-
শ্মীরে কয়েক জন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। কল্লণ সেই সকল ঐতি-
হাসিকদিগের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-গ্রন্থ ও প্রা-
চীন শাসন পত্রাদি অবলম্বন করিয়া কাশ্মী-
রের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া গিয়া-
ছেন।

কাশ্মীরের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজতরঙ্গি-
নীতে লিখিত আছে যে “কাশ্মীর উপত্যকা
রূপে পরিণত হইবার পূর্বে একটি হ্রদ
ছিল। তাহার নাম সতী সরোবর। বর্ত-
মান কল্লারস্ত্রে মরীচি পুন, প্রজ্যস্তা
মহর্ষি কশ্যপ, ত্র্যম্বক, বিষ্ণু ও মহেশ্বর
প্রভৃতি দেবগণের “সাতাঘো ঐ সতী সরের
অভাস্তরস্থিত জলোদ্ভব প্রদেশ আঘাত
করিয়া ঐ হ্রদ হইতে প্রথমে কাশ্মীর প্রদেশ
সৃজন করেন।”

মহাভারতে হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী জলো-
দ্ভব প্রদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। খ্যাত
নামা ভৌগোলিক পণ্ডিত মেজর রেনেল
সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন।

So far am I from doubting the
tradition respecting the existence of
the Lake that covered Cashmere;
that appearances alone would serve
to convince me, without either the
tradition or the history.” †

ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত কাশ্মী-
রের ন্যায় ভারতের পূর্বোত্তর প্রান্তে ও
পশ্চিম মধ্যস্থিত হ্রদ হইতে এইরূপ একটি
মনোহর উপত্যকা প্রদেশ গঠিত হইয়াছে।
সেই সরোবরের নাম “লগতাক” ও তদুদ্ভূত
প্রদেশ “মিতাইলেইপাক”; মানচিত্রে এই

† Memior of a map of Hindooos-
tan or the mogal Empire, by Ren-
nell. page 107.

উপত্যকা “মণিপুর” আখ্যা দ্বারা চিত্রিত। কিন্তু আমরা ইহাকে “জাল মণিপুর” বলিয়া থাকি।

মহর্ষি কশাপ কাশ্মীরের প্রথম নিবাসী। পৌরাণিক মতে কশাপ হইতে দেব, দানব, মানব ও পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুর উৎপত্তি। এমতাবস্থায় কাশ্মীরকে আর্ধ্যজাতির স্মৃতিকা গৃহ বলিতে পারা যায় কি?

নাগরাজ নীল কাশ্মীরের প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর রাজশ্রেণীর শীর্ষদেশে আমবা গোনার্দের নাম দেখিতে পাই। † ইনি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু জরাসন্ধের প্রিয় সখ্যদ ছিলেন। জরাসন্ধ যৎকালে মথুরা অবরোধ করেন, সেই সময় গোনার্দ সৈন্যে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে কৃষ্ণের হস্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বলা বাহুল্য যে এই সময়ে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্তের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই সময় সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, ছোতাতির্কিৎ পণ্ডিত-গণের মতে সপ্তর্ষি মণ্ডল এক হইতে অন্য নক্ষত্রে গমন করিতে এক শতাব্দী অতীত হয়। সুতরাং তদনুসারে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ২৫২৬ পূর্ব শকাব্দে বা বর্তমান সময় হইতে (২৫২৬ + ১৮০৫ =) ৪৩৩১ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ৬৫৩ কলি গতাকাঙ্কে যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সমসাময়িক গোনার্দ জীবিত ছিলেন।

গোনার্দের পর তাঁহার পুত্র দামোদর সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্য শাসন কালে একটা স্বয়ম্বর উপলক্ষে যত্নবংশীয়গণ গান্ধার রাজ্যে গমন করিতেছিলেন। দামোদর পিতৃ শত্রুকে নিকটে পাইয়া আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারি-

লেন না। সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই স্বয়ম্বর প্রার্থী কন্যার প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের চক্র দামোদরের কধির পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। দামোদরের মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যী যশোবতী অস্তঃসহা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজপত্নীকে কাশ্মীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার গর্ভে দ্বিতীয় গোনার্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজার শৈশবাবস্থায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল। কল্লণ বলেন শিশু বলিয়া কোন পক্ষই এই বিষয়সময়ে কাশ্মীর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

দ্বিতীয় গোনার্দের পর ৩৫ জন রাজার নাম বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু ঐতিহাসিক তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। †

তৎপর লব, তৎপর তাঁহার পুত্র কুশেশ্বর, তাঁহার পর তৎপুত্র খগেন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করেন। খগেন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্মের সুবিমল ছোতাতি সর্ব প্রথম কাশ্মীরে প্রতিভাবিত হইয়াছিল।

মহারাজ সুরেন্দ্র, শাক্যসিংহের বহুকাল পূর্বে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শাসনকালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার অনুষ্ঠিত বিবেচনা করিয়া, পণ্ডিত প্রবর উইলসন এই অংশটী গোপন করিয়াছেন। কিন্তু কল্লণ স্পষ্টাক্ষরে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা গোপন করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই যে বৌদ্ধ ধর্ম কিয়ৎপরিমাণে ভারতে প্রচা-

† গোনার্দের পূর্বে ৫২ জন নরপতি কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের নাম স্মরণ্য নহে।

† মুসলমান ইতিহাস এস্থলে ২৫ জন রাজার নাম প্রকাশ করিয়াছে।

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ ।

আজি কালি কোন কোন পত্রিকায় ও লোকের কথাবার্তায় সময় সময় আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলাফলে আলোচনা হইতে দেখা যায়, আর সেই-ই কেহ কেহ বলেন যে আমাদের পুরাতন যে সভ্যতা এতদিন ধরিয়া আমাদের সমাজে অবিদ্বিত ছিল ও এখনও আছে সেই সভ্যতাই আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শক হওয়া শ্রেয়ঃ, সেই সভ্যতা অনুসারেই আমাদের চলা উচিত, পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদের বিশেষ কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বলা কত দূর যুক্তি সঙ্গত, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের গের পথে

তাঁহা

দিয়া বিদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিব, এইরূপে তর্ক করিবার সময় ঐক্যবুদ্ধি আনিয়া আমাদের জ্ঞানবৃত্তিকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাইতে পারে, আমাদের স্থির ও প্রশান্তচিত্তে হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিতে পারে। অতএব স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বুদ্ধির প্রকৃতি কি, কি প্রকারে উহার উন্নতি আর কি কি প্রকারে উহার অবনতি হইতে পারে তাহাই মাত্র এখানে আলোচ্য। তাহাঁই আমাদের বিশ্বাস এ বিষয়

আমাদের

পণে চেষ্টা করিতে পারি। এইরূপ অহুরাগকে প্রকৃত পক্ষে স্বজাতির প্রতি অহুরাগ বলা যাইতে পারে।

এইরূপ অহুরাগের উৎপত্তি কোথা হইতে? যে কারণে আমরা পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসি, আমাদের স্বজাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকেও আমরা প্রথমতঃ অনেকাংশে সেই কারণে ভালবাসি। যাহা কিছু আমাদের সদৃশ তাহা আমরা ভালবাসি; আর যাহা কিছু আমরা অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়া আসি, যাহা কিছুর সহিত আমরা অনেক দিন ধরিয়া পরিচিত, তাহা যদি আমাদের কষ্টকর না হয়, তাহা যদি আমাদের পক্ষে অব্যবহিত ভাবে সুখকর না হইয়াও শুদ্ধ কেবল বঞ্চিত করে, তাহা হইলেও তাহা আমরা ভালবাসি।

সামান্য পাত্র হইয়া

একসঙ্গে আহার, ভ্রমণ, এক সঙ্গে উপবেশন ইত্যাদি কার্য্য করিয়া, অনেক দিন ধরিয়া একরূপ সুখ দুঃখ, একরূপ আশা নিরাশা একরূপ উৎসাহ নিরুৎসাহ ইত্যাদি ভাব অনুভব করিয়া, উহাদিগকে ভালবাসিয়া ফেলি। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের মনে এক একটা বন্ধনী, এক একটা অহু-ভূতি-র গঠিত হইতে থাকে, পরে ঐ সকল বন্ধনীর শক্তিতে আমরা উহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হই। ঐ সকল তারের সংযোগে উহাদিগের হৃদয়ে সহিত আমাদের হৃদয় এক তানে বাজিয়া উঠে। এই ত গেল আমাদের বিবিধপ্রকার পারিবারিক অহুরাগের সাধারণ উৎপত্তি; স্বজাতির প্রতি অহুরাগের প্রথম উৎপত্তিও এইরূপ। কয়েক পরিবার মিলিত হইয়া একটা সমাজ স্থাপন করে; তাহাদিগের জন সংখ্যা প্রথমতঃ এত অল্প যে তাহারা স্বকীয় পরিবারের অন্ত-

ল বাসে

স্বর্গত

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একবার মানুষের মনে কতকগুলি ঘটনার দ্বারা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি গঠিত হইতে দেও, পরে ঐ বৃদ্ধি মানুষের মধ্যে এক পুরুষ হইতে তাহার পরপুরুষে আবার তাহা হইতে তাহার পরপুরুষে এইরূপ ক্রমান্বয়ে নীত হইবে। বিশেষ বিশেষ প্রকার খাদ্যাদি ভোজন করা আশ্রয়াদিগের পক্ষে যখন অবশ্যস্বাভাবী ব্যাপার হইয়া পড়ে, স্বজাতির প্রতি অনুরাগও তেমনই অবশ্যস্বাভাবী ব্যাপার হইয়া পরে আমাদিগের সমাজের আচার ব্যবহার অনেক প্রকারে এই অনুরাগের ক্ষুদ্রিত সাধন করে। আমরা এখন দেখিতে পাই-তেছি যে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুরাগ আর স্বজাতির প্রতি অনুরাগ এই উভয়ে (উৎপত্তি বিষয়ে) অনেক সাদৃশ্য আছে; এখন দেখা বাউক এই উভয়ে কোন বিভেদ আছে কি না। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সংখ্যা কম আর স্বজাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বহু।

বলিয়া উহা সহজেই কার্যকর হয় আর স্বজাতির প্রতি অনুরাগ মাত্রায় অল্প বলিয়া উহা কার্যে পরিণত হইতে সময় লাগে। আমার জাতের কষ্ট দূর করিতে আমি যত শীঘ্র যত্ববান হই, যাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই এরূপ কোন স্বজাতীয় ব্যক্তির কষ্ট দূর করিতে আমি তত শীঘ্র যত্ববান হই না। কিন্তু স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি কার্যে প্রদর্শিত হইতে যেরূপ সময় চাই, সেইরূপ আবার ঐ বৃদ্ধি একবার উদ্বেজিত হইলে পারিবারিকাদি অন্যান্য সমুদয় অনুরাগ বৃদ্ধিই উহাব নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকে; যে কার্যের নিমিত্ত উক্ত বৃদ্ধি উদ্বেজিত হয় সে কার্যের পরিণাম না দেখিতে পাঠিলে আর উহার দিরাতি হয় না।

কোন জাতি যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগও তেমনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য

সে ব্যক্তি এখন আসিয়া হঠাৎ উহাকে দেখিয়া হরত চিনিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বৃক্ষটিকে ঐ পনর বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে সে ব্যক্তির নিকট উক্ত দুই অবস্থার মধ্যে বিবেদ প্রতীত হইলেও ব্যবধান প্রতীত না হইতে পারে, উক্ত দুই অবস্থার মধ্যে একটি এ পারে আর অপরটি ওপারে একরূপ প্রতীত না হইতে পারে। ঐ ব্যক্তির সম্মুখে বৃক্ষটি নিঃশেষে এক অবস্থা হইতে তাহার পরবর্তী অবস্থায় আর তাহা হইতে তাহার পরবর্তী অবস্থায় ক্রমে ক্রমে অবস্থান্তরে প্রবেশ করিয়াছে; অবস্থাগুলির শ্রেণী জলের স্রোতের ন্যায়, মুক্তির হারের ন্যায় নহে—অর্থাৎ তাহাদিগের একটি ও তাহার ঠিক পরবর্তী বা ঠিক পূর্ববর্তীটির মধ্যে কোন ব্যবধান লক্ষিত হয় না। জাতির বৃদ্ধিও এইরূপে ক্রমে ক্রমে অলক্ষিত ভাবে ঘটিয়া থাকে, কোন জাতি অনেক সময় নুতন কোন অবস্থায় প্রবেশ

থাপি উহাদিগের মধ্যে অনেক বিভেদ আছে; জাতির এই তিন অবস্থার উপযোগী স্বজাতির প্রতি অত্যাচারেরও তিনটি অবস্থা আছে। জাতির উক্ত তিন অবস্থারই বা কি কি প্রকৃতি আর স্বজাতির প্রতি অত্যাচারেরই বা উক্ত তিন অবস্থার কি কি প্রকৃতি তাহা এক্ষেপে বিবেচনা করা যাইতেছে।

অসভ্য অবস্থায় লোকে জীবনের গতি—ধিকাংশে স্ব স্ব বুদ্ধি ও ইচ্ছা দ্বারাই নির্ণয় করিয়া থাকে, সামাজিক নিয়ম গুলি তখনও লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই—তাহাদিগের সংখ্যা অল্প ও প্রকৃতি সরল। একরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট তাহার অধীনস্থ জাতির বাহ্যিক ঘটনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আভ্যন্তরিক ঘটনাগুলির প্রতি তত মনোযোগ করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার অধীনস্থ জাতিকে বাহ্যতে অন্যান্য জাতি আসিয়া পরাভূত করিতে না পারে, তাহার — জাতি বাহ্যতে অন্যান্য

—এই ধর্মধাম, মহা গোলা

থাকে, অর্থাৎ জাতির মধ্য হইতে কোন এক জন প্রধান ব্যক্তি তাহার নিজের ইচ্ছানুসারে গবর্ণমেণ্টের কার্য নিৰ্দ্ধারিত করিয়া থাকে; স্বৈচ্ছাচারী শব্দে এস্থলে এমন বুঝাইবে না যে ঐ ব্যক্তি অবশ্যই তাহার জাতির উপর অত্যাচার করিবে। কোন কোন সময় ঐ ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অতিভয়ানক অত্যাচার করিতেও পাবে কিন্তু তাহা বলিয়া সে কখনও সমুদয় জাতির প্রতি অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে না। অসভ্য অবস্থায় লোকেব মনো-স্বজাতির প্রতি অহুবাগ জাগরুক দেখা যায়, কিন্তু সে অহুবাগ লোকেব তখন-কাল অন্যান্য মানসিক বৃত্তিব ন্যায় বিকাশ সোপানের অতি নম্র ধাপে অবস্থিত, সে অহুরাগ তখনও বহুদূরী হইয়া নাই, সে অহুবাগ তখনও দূরবর্তী অতীত ও দূরবর্তী ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনার সহিত কর্তব্যাকর্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বর্তমানে পদবিক্ষেপ করিতে শিখে নাই, সে অহুবাগ তখনও সাং

সে জলাশয়ের নিমিত্ত তাহা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের অধিপতি যদি তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে লবু অপবাধে গুরুদণ্ড প্রদান করেন, কিম্বা তাহাদিগের মধ্যে সবল পুরুষদিগকে অনিচ্ছা সবেও যুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য কবেন, তাহা হইলে তাহা তন্নিমিত্ত অসন্তুষ্ট হইতে পাবে, তথাপি তাহারা সকলে মিলিয়া ঐরূপ স্বৈচ্ছাচারের নিরাকরণে সচেষ্ট হইবে না। অবশ্য অবস্থার প্রকৃতি সাক্ষ্যে স্ফুটিত হইল এখন সম্পূর্ণ সভ্য অবস্থা কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। সম্পূর্ণ সভ্য অবস্থায় সমাজ অমেক-কণ্ঠে নিদ্রিষ্টে নিদ্রা চালাইত হয়; যে জলে সোরা ভি ন আছে সে জল জাল দিলে যেমন সে জাল বিন্দুগুলি জলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত অবশেষে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের পাশে স্থায়ী অবস্থিতি করে ও একটা বিশেষ জল অবলম্বন

অন্তর্গত, সে জল

নাও আধার কিছু না কিছু অহুবাগ আছে,

এই প্রকাশ্য ভাবেই হউক আর অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক তাহাদিগের প্রোতা বা পার্থক্যগণের হৃদয় নিহিত এই অহুরাগ বৃত্তিতে আঘাত করিয়া তাহা হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। জাতিগণের দেশে এইরূপ আচার ব্যবহার এক বিন্দু চলিয়া আসিয়াছে, আমরা কেন তাহাদিগের আচার ব্যবহার হাফিয়া

সে জাতির হৃদয়ে আমার হৃদয় হয়, সে জাতির হৃদয়ে আমি স্থায়ী হই; সে জাতির উন্নতি দেখিলে আমিও আপনাকে উন্নত মনে করি, সে জাতির অবনতি দেখিলে আমিও আপনাকে অধোপ্রাপ্ত মনে করিয়া মন্তক অবনত করি। সাধ্যাভীত না হইলে আমি সে জাতির উন্নতি সাধন করিতে যথা সাধ্য আয়াস স্বীকার করিতে পারি, সে জাতিকে অবনতি জনিত দাক্ষ্য মনোবেদনা হইতে উদ্ধার করিতে প্রাণ

ভিন্ন বিষয়গুলি পরস্পরের পাশ্বে সাম্য-
ভাবে সজ্জিত হইয়া সমাজকে একটা বহু-
অঙ্গবিশিষ্ট দেহাকারে পরিণত করে। সমা-
জের গতিবিধি এক্ষণে নির্দিষ্ট কতকগুলি
নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয়, সমাজের অঙ্গ-
গত লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেক
হ্রাস হয়, এক্ষণে আর সমাজের লোকে
যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারে
না, অর্থাৎ এমন কোন কার্য্য করিতে পারে
না যাহাতে সমাজের কোন প্রধান নিয়মভঙ্গ
করা হয়, যাহাতে সমাজে সাধারণের কোন
অপকার হয়। লোকে এক্ষণে পূর্বপূর
বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে শিখিয়াছে,
এক্ক্ষণে নগরের ঘটনাগুলিকে প্রশস্ত
দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিছে, বিশেষ বস্তু
হইতে সামান্য বস্তু বিচ্যুত করিতে শিখি-
য়াছে। এক্ষণে অবস্থায় স্বজাতির প্রতি
অহুরাগবৃত্তি ইঙ্গ্রিয়গ্রাহ্য ক সুখদুঃখের
সহিত আর তত অবা ত ভাবে সম্বন্ধ
ব সন্ধি আমাদিগের

ধান প্রধান সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেই বস্তু
আমাদিগের পক্ষে কষ্টকর না হইলে আমা-
দিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে; আবার যদি
সে বস্তু হইতে আমরা অনেক সময় অনেক
আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, তবে তাহা
আমাদিগের আরও অধিক প্রিয়পাত্র হয়।
এইরূপে সাধারণতঃ আমরা পিতা মাতা
জ্ঞাতা ভগিনী স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে
ভালবাসি, তাঁহাদের সহিত আমাদিগের শ-
রীর ও মনোগত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়,
তাঁহাদের সহিত আমরা অনেক দিন খরিয়া

রাজকার্য্যে বিপ্লব ঘটবার চিহ্ন। আবার
ইংলণ্ডের কোন গবর্ণমেন্ট যদি সে দেশের
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি হস্তনিষ্কেপ
করেন, তাহা হইলে সে গবর্ণমেন্টের আয়ু
শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া জানিতে
হইবে; সমুদায় ইংরেজজাতি সে গবর্ণমে-
ন্টের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে, ইহার কারণ এই যে
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার হ্রাস গবর্ণমেন্টের
সেচ্ছাচারিত্বের চিহ্ন। সম্পূর্ণ সভা অব-
স্থায় লোকে তাহাদিগের রাজকীয় কার্য্য
নিজে নিজেই সমাধা করিতে পারে, কোন
বিশেষ ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না;
সাধারণ তত্ত্বই সম্পূর্ণ সভা অবস্থার গবর্ণ-
মেন্ট। অসভা ও সম্পূর্ণ সভা এই দুই
অবস্থার মধ্যবর্তী (অর্দ্ধসভা) অবস্থায় অসভা
অবস্থার ন্যায় গবর্ণমেন্ট একজন নৃপতির
হস্তে থাকে, কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায়
সমুদায় কার্য্য নির্বাহ করেন না, মন্ত্রীদিগের
পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নিরূ-
পণ করেন। অর্দ্ধ সভা অবস্থায় স্বজাতি।

ভা বাসে।

স্বজাতির প্রতি অহুরাগের সূত্রপাত হয়
সমাজের আয়তন ক্রমে ক্রমে যেমন বৃদ্ধি
পাইতে থাকে, কয়েকটা পরিবারের অঙ্গ-
গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি
উল্লিখিত ভালবাসাও তেমনই স্বজাতির
প্রতি অহুরাগে পরিণত হইতে থাকে।
যাহাযের মন সমুদয়ই কিবা কোন কোন
অংশেই হউক ঘটনা দ্বারা গঠিত হয়, ঘট-
নার রশবর্তী হইয়া যাহাযের মন বিকশ

রাগ এই দুয়ে আর একটি প্রধান বিভেদ এই দেখা যায়; পূর্ব দুই অবস্থায় কোন জাতির মধ্যে বাহারা স্বজাতি হিতৈষী তাঁহারা সকলেই প্রায় স্বজাতির সুখকামনায় ও দুঃখ নিরাকরণের উদ্দেশ্যে অব্যবহিত কার্য্য করিতে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা দুর্বল পক্ষের প্রতি প্রবল পক্ষের অত্যাচার নিবারণ, কেহ কেহ বা কুপ্রথা দূর করিয়া তৎপরিবর্তে সুপ্রথা প্রবর্তন, কেহ কেহ বা বিদেশীয়দিগের সঙ্কট বাণিজ্যে স্বদেশের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি করণ ইত্যাদি কার্য্যে বাস্তব থাকেন; কিন্তু সভ্য অবস্থায় স্বজাতি হিতৈষী ব্যক্তিগণের মধ্যে সকলেরই স্বজাতির অবস্থা উন্নত করিবার

ইচ্ছা থাকিয়াও কেহ কেহ বা তাঁহাদিগের জাতির অন্তর্গত লোকদিগের সুখ সংঘটন ও দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত অব্যবহিত ভাবে কার্য্য করেন আর কেহ কেহবা সে রূপ না করিয়া যে সকল কার্য্য অব্যবহিত ভাবে নহে কিন্তু পরিণামে দেশের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস কর সেই সকল কার্য্য করেন—যেমন কেহ কেহ বা মানব প্রকৃতির—কেহ কেহ বা সামাজিক ঘটনা সমূহের কার্য্য কারণ অনুসন্ধান ও নিয়মাবলী নিরূপণে ব্যাপৃত থাকেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

(বি এন্স সি, লণ্ডন)

জন ষ্ট্রাট মিল।

—:—

as mine, to draw another prize in the lottery of life: Whoever, either now or here after, may think of me and of the work I have done, must never forget that it is the product not of one intellect and conscience, but of three."

মিল তাঁহার জীবনে তিনটি বিশেষ বন্ধু পান, প্রথম তাঁহার অদ্বিতীয় পিতা, দ্বিতীয় তাঁহার প্রাণাধিক স্ত্রী, তৃতীয় তাঁহার স্নেহের ধন এই কন্যাটি। এই সময়ে মিল গুটিকত রচনা করেন তন্মধ্যে দার্শনিক বেনের "Treatise on the mind" নামক প্রবন্ধের সমালোচনাটি প্রসিদ্ধ। ১৮৬০ খ্রিঃ ইতে ১৮৬১ খ্রিঃাব্দের মধ্যে মিলের দুই খানি খ্যাত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক-খানির নাম "Considerations of Representative Government" ও অপরখানির নাম "The subjection of women" প্রথম-বিষয় পিতৃবন্ধু "বেঙ্কাম" বা-

বিত্ত-প্রাকির্ভেন ও মিল তাঁহার সমস্ত মত-গুলিই সম্পূর্ণ রূপে বাক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তক খানি অধিকতর মূল্যবান হইত সন্দেহ নাই। কিয়দ্বিগুণ পরেই মিলের অপর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, গ্রন্থ খানির নাম "Utilitarianism," বলা বাহুল্য যে এ গ্রন্থ খানিতেও তাঁহার জীবন-অধিকার ছিল।

ইতি মধ্যে দাস ব্যবসায় লইয়া আমেরিকা খণ্ডে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়, দাস ব্যবসায় যে একটি অতি দুর্বল ও নিষ্ঠুর ব্যবহার তাহা আর কাহারো নিকট অবিদিত নাই, মনুষ্য স্বজাতিকে ধরিয়া বিক্রয় করিবে ইহাপেক্ষা নীচতর কার্য আর কি হইতে পারে? এমন কি এ দুই প্রথা এখন প্রচলিত ও জগতে অনেক স্থলে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাস ব্যবসায় যাহাতে একেবারে নিষ্পন্ন হয় সে বিষয়ে অনেকাধিক মহদন্তঃকরণ বিশিষ্ট প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া

ভারতী অ ১২২১)

শিউ দোষী ছিলেন তাহা ইংলণ্ডের সকল
একবাক্যে বলিয়াছিলেন, মিল ও তাঁহাদের
সহিত সমমতাবলম্বী হন। অনন্তর আয়ে-
রিকগণ নিজ দোষ স্বীকার ও তন্নিমিত্ত
ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সমস্ত বিরোধের নি-
বৃত্তি হইল। তৎপরে মিল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে
“ফ্রেসার্স ম্যাগেজিনে” “The Contest in
America” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ
করেন। এই সময়েই মিল “সার্ উইলিয়
হ্যামিণ্টন” প্রণীত “দর্শন” পাঠ করে
তিনি এই গ্রন্থখানি মারাত্মক দোষে
বলিয়া বিবেচনা করেন ও তাহা
বা 

১৮৬২

১৮৬২

Compte

১৮৬২

১৮৬২

মনের অল্প .. পংখ্যক ব্যক্তি
দিগের মধ্যে বিভক্ত হয় সেইরূপ আবার
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ঐ অল্পবয়সের মাত্রাও
অধিক হয়, পরপক্ষে মনের অল্পবয়স যেমন
অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়
সেইরূপ আবার প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে যে
অল্পবয়স পড়ে তাহা মাত্রাতে অল্প হয়।
আমি আমার ভ্রাতা কি ভগিনীকে বত ভাল
বাসি, আমি আমার স্বভ্রাতার ব্যক্তিমা-
কেই তত ভালবাসি না; পারিবারিক অল্প-
বয়স ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মাতার অধিক

দিক ও যেমন এক ক্রমগামী অবিভক্ত
স্রোতাকারে ঘটয়া থাকে, জাতি ও তাহার
সহিত স্বভ্রাতার প্রতি অল্পবয়সের বুদ্ধিও
সেই রূপে ঘটে। কোন বৃক্ষ এখন বেক্রপ
ফল পুষ্প বিশিষ্ট আছে, পনের বৎসর পূর্বে
যখন উহা ভূমি ভেদ করিয়া উঠিয়া আকা-
শের দিকে উহার ক্ষুদ্র মস্তক উত্তোলন ক-
রিতেছিল তখন উহার আর এক ভিন্ন অবস্থা
ছিল; এই দুই অবস্থার মধ্যে বিভেদ এত
অধিক, ব্যবধান এত প্রশস্ত যে, যে ব্যক্তি
পনের বৎসর পূর্বে ঐ বৃক্ষ দেখিয়া গিয়াছে

যেন তারে জন্মান্তরে
দেখিছি স্বপন ঘোরে
সে মাধুরী আজো তাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা রয়েছে
তার হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি
ওই বটে সেই জন
সেই মোর স্বপ্ন ধন
জন্ম জন্ম ব্যারে আমি প্রাণে ভাল বেগেছি

"কোন পরিচিতের মৃত্যু ঘটনাতে"

"জানি আমি এ জীবন অনিতা, হরিষ !—
জানিয়াও জানিত না এ পোড়া হৃদয় ;
নিরাশা-স্বপ্নগানেল জলিয়া আবার
ভাসিতাম কুতুহলে সুখসিন্ধু নীরে ;
দেখিতাম কত ফুল—কত পত্রদল—
অবিরত ধীরে ধীরে ঝরিত কাননে,
ভাবিতাম পুনরায় ফুটিবে কুসুম—
পুনরায় নবপত্র সাজাবে তরুরে ;
কিন্তু না হইত মনে ভ্রমেও কখন—
একবার যে কুসুম—যেই পত্রদল—
ভূতলে ঝরিয়া পড়ে, সে নানি, নানি শুধাকর,
শোভে তরুপরে, কোথা যে শুকায়ে যায়
পড়িয়া ভূতলে, হায়, কে বলিতে পারে ?"
ইত্যাদি।

"স্বপ্নচর"।

"মধুর বসন্ত-নিশি—প্রভাত মধুর—
মধুর যুগের ঘোরে পশিত শ্রবণে
অক্ষুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি লহরী
বাতায়ন সন্নিহিত শাখাদল হ'তে,
মাকে মাকে নকরুণ "বউ কথা কও"—
"বউ কথা কও" রবে ব্যথিত হৃদয় ;
ভাবিতাম এতকিরে বিচ্ছেদ-বসুণা—
এত যদি বাঞ্ছা প্রাণে, তবে কি কারণ—
মিছা দোষে মিছা ভ্রমে মানেতে মজিয়ে,
প্রিয় জনে প্রিয়জন দেব এ যাতনা !
অনিত্যম সুখে শুভে এ সকল রব

নীরব সময়ে দোহি :—প্রভাত সমীর—
গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গ নিঃসঙ্গ পুলিনে—
অনিবার সেই ধনি স্বপনের মত—
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে ॥"

ঐ

"কাননের পাখী ও যে থাকিত কাননে—
কাননে যাহার বাস,
কাননে যাহার আশ,—
কানন-সুখমা যার স্তমিত নয়নে
ভাসিতেছে নানা বর্ণে—
কুণ্ডে ফুলে শ্যাম পর্ণে—
কানন-দলী : যার স্তমিত শ্রবণে !
এ হেন বনের পাখী
পিঞ্জরে বাধিয়ে রাখি,

ফেন এ যাতনা তারে দিয়ে অকারণে ;—
দাও পাখী ছেড়ে দাঁড়াই থাকিলে কাননে।

হায়ের কাননে গিয়া

নিরখিবে প্রাণ প্রিয়া—

নরখিবে আর যত বিহঙ্গ সুন্দর ;—

চিত্ত পুলকিত হ'লে,

সদ্বাক্ত বধিবে সবে,

সবে মিলি বনমাকে গা'বে নিরন্তর ;

ছেড়ে দাও বিহঙ্গেরে—বউ সে কান্তর !"

কালবৃক্ষ।

"থাকিয়া থাকিয়া করিতেছে পাতা,
খসিয়া খসিয়া বহিছে বায় ;
কাল হ'তে পল পড়িছে খসিয়া,
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়।

সকলি যেতেছে—

এ অগত মাকে

আশার আশা

ধূলাতে বুনা

এই যে তখন

বহিয়া গমন

উঠিল তখন—সোণার বরণ—

সে চিত্র এখনো হৃদয়ে আছে।

কোথা কল উহার স্বরনা এখন,
কোথা সে ললিত লোহিত আভা,
কোথনা ভুবন ভরিছে আধারে—
নিশিতে বিলীন হ'স্তেও দিবা।

এই যে সে দিন হৃদয় মাঝারে
রোপিলে যতনে আশার তরু,
না কলিতে ফল শুকাল পাদপ,
সে ছদি এখন হইল মরু।

এই যে সে দিন খোদিলে কাননে
হৃদয় সরস, সলিলে ভরা,
নিদ্রা হইল—শুকাইল সলিল—
নিরস হইল সরস বরা।

ভালবেশে তারে প্রাণেরো অধিক
স্বপ্ন আশে আমি ল'খিছ প্রাণ,
নিদ্রা হইরে গেল সে চলিছে—
এ ছদি করিয়ে চির আশান।

জনসমাজে গোপাল বাবুর পুস্তক খানির
সমুচিত আদর হইলে সুখী হইব।

ভগ্ন-আশা, প্রীতমহি দোল হো-
সেন প্রবীত। এখনি পক্ষা। গ্রন্থকর্তার
মাত্র কেবলই আত্ম হৃদয় যার যে ইনি
শ্রমলয়ানি। মুসলমান হইয়া বঙ্গ
ভাষার প্রাণ হইয়া আশ্চর্যের
নিম্ন বসিলে। গ্রন্থখানি পাঠে
কোন স্থল বিবেচনা করিলিয়া বোধ
হয় না, শুদ্ধ হানে বঙ্গ ভাষার আভাস
পাওয়া যায়। নিম্নে এই পুস্তক করি-
লাম।

পরিবর্তনীয় প্রিয়ে এই ভূমণ্ডল
ভেবেছিহু, তুমি আমি নহিণো কেবল;
এখন দেখিতে পাই, মম সে সিদ্ধান্ত নাই,
নিত্য নবরূপী তব হৃদয় আগার,
নহে স্থির ক্ষণস্থায়ী প্রণয় তোমার।
মনে কি পড়িগো প্রিয়ে সেই একদিন!
সেই সরোবর আর সেই যে পুলিন!
বসি সেই তরুতলে, সাজিয়ে কুসুমদলে,
উল্লাসে দেখিতে ছিলে প্রকলিত মনে,
বিমল সে মুখ-চাঁদ সলিল-দর্পনে!

ইত্যাদি।

কবিতাপাঠ,—প্রথমভাগ, মূল্য ০/০

আনা মাত্র, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার কর্তৃক
প্রণীত ও সংগৃহীত। এ পুস্তকখানি বা-
লিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে;
ইহাতে 'করিমউদ্দিন, ডুগডুগে খেলা' ভার-
তেশ্বরী, প্রভৃতি গুটি কতক ছন্দে গ্রথিত
কল্পিত আছে। এরূপ কবিতা বালক-বা-
লিকাদিগের উপযোগী কি না তাহা শিক্ষা-
পদ্ধতিগণই বিচার করিতে পা-
রেন—হুয়া আমাদের অসাধ্য।

বঙ্গ গৃহ। শ্রীসীতানাথ নন্দী প্র-
ণীত। এই উপন্যাস খানি সত্যই যদি
আধুনিক বঙ্গ গৃহের ছবি হয় তবে বঙ্গের
আশা ভরসা সমূলে নির্মূল! বঙ্গ রসাতলে
ডুবিয়াছে! স্রুকের বিষয় এই ইহা সাধা-
রণ বঙ্গ গৃহের ছবি নহে, বঙ্গের একটি অতি
সঙ্ঘর্ষ সম্প্রদায়কে লইয়া এই পুস্তক খানি
রচিত।

যাহাই হউক, বাঙ্গালার একটি সম্প্রদা-
য়ের একটি ঘরেও এরূপ অস্বাভাবিক,
ঘোর কলঙ্কময় বিদেশী ভাবের বিদেশী
প্রাণের কারবার দেখিলে আমাদের আশা
ভরসা লোপ পায়।

সেন রাজগণ ।

(বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অধ্যায় ।)

সেন রাজগণ কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন, তাহা স্থিররূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। বরেন্দ্র প্রদেশে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপির মধ্যলোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই রাজবংশটি পূর্বে দক্ষিণাপথে বাস করিতেন। তথা হইতে আসিয়া বিজয়সেন সর্বপ্রথম গোড় জয় করেন।

উক্ত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—মহাদেবের স্তবর্ণদশ অটামণ্ডল যাহার সিংহাসন, গঙ্গাজলকণা দ্বারা যাহার চামর বাজন কার্য সম্পাদিত হয়, শিবশিরোভূষণ ফণী রাজের কণা যাহার খেতছত্র, যিনি স্তম্বধার, যাহার সন্দর্শনে সমুদ্র ও চকোর আনন্দে উল্লসিত হয়, যিনি কামদেবের যশের পুণ্ড্র-প্রকাশকারী, সেই চন্দ্রই সেন রাজবংশের আদি পিতা।

সুন্দরবন ও তর্পণদীঘির তাম্রফলকে এই চন্দ্রের গুণানুবাদ এবং “ওদধিনাথ” চন্দ্র হইতেই সেন বংশের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাগরগঞ্জের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, “পৃথিবীকে স্ফটিক পর্বতে ব্যাপ্ত করিয়া, সমুদ্রকে মুক্তাবলী দ্বারা স্তম্ভিত করিয়া, নভস্থলকে স্বর্গীয় নদীর জলে প্লাবিত করিয়া, দিক্কাশিনীদিগকে চিরপরিচিভার

ন্যায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত করিয়া কামদেবের যশের পুণ্ড্রপ্রকাশকারী চন্দ্র প্রকাশিত হউন।”

এই চন্দ্র হইতে যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীর ভারগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে বিশ্রাম-সুখ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদন্দ্বী কেহ ছিল না। তাঁহারা অদ্বিতীয়পরাক্রমশালী ছিলেন। এই বংশ হইতেই সেনবংশের উৎপত্তি।

প্রায় তিন শত বৎসর গত হইল তিব্বত দেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশজ লিখিয়া গিয়াছেন। ১ পদ্মপুরাণভিত্তিক ক্রিয়াযোগসারগ্রন্থে সেনরাজগণকে “সৌম বংশস্তব” লেখা হইয়াছে। ২

রাজসাহির প্রস্তরফলকে লিখিত হইয়াছে, সেই চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্য ফৌজীন্দ্রবীরসেন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চলিতযুক্ত মধুশ্রাবী ইতিহাস জগজ্জনের শ্রবণ রঞ্জন মানসে পরাশরপুত্র ব্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৩

১ Taranath's Vassilief's work on Buddhism. Translated by Miss Lyall.

২ Indo-Aryans, Vol. 11. P. 266.

৩ বংশে তস্যামরজীবিততরতকলামাক্ষিণী দাক্ষিণাত্য-ফৌজীন্দ্রকীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃকী-র্জিনস্তিস্কৃত্ববে।

এই বীরসেন যে কোন্‌ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। বলিলে তাঁহাকে ব্যাসের পূর্ববর্তীও বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য কোণীজ বীরসেনের সহিত গোড়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

সেই সেনবংশে (যে বংশে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে) শতশতবীরহস্তা ব্রহ্মপরায়ণ রাজা সামন্তসেন^৪ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি “ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়,” দিগের কুলের “শিরোদাম” স্বরূপ ছিলেন। ইনি কণাটী-লুণ্ঠনকারী জুবুর্ভদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় শব্দটি লইয়া একটা কোলাহল উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ “মহৎ বা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়”^৫ অনুমোদন করিয়াছেন। যজুর্বেদে “ব্রহ্মক্ষত্রঃ” পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। টীকাকার ইহার অর্থ “ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীৰ্য্যঞ্চ” লিখিয়াছেন।

১২৩৪ সন্বতের (১১৭৭ খৃঃ অব্দ) পৌষ শুক্ল চতুর্থী দিবসে কনোজরাজ জয়চন্দ্র, রাও রাষ্ট্রধর নামক জনৈক ক্ষত্রিয়কে কয়েক খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন পত্রে রাও রাষ্ট্রধরকে “ব্রহ্মক্ষত্রিয়” বলা হইয়াছে।^৬

বক্ষরিআহুচিআপরিচয়ওচয়ঃ স্বক্তিমাধী-
কধারাঃ
পারাশর্যোণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীগনায় প্র-
নীতাঃ।

প্রস্তর লিপির চতুর্থ শ্লোক।

৪ Noblest Kshetriyas.

৫ Asiatic Researches. Vol. XV.
page 450.

প্রস্তর ফলকে ও সামন্ত সেনকে “ব্রহ্মবাদী” বলা হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে সামন্তসেনকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করাই প্রস্তর ফলকলেখকের অভিপ্রায় ছিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কিছুই আমরা কোন গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হইতেছি না। টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ও করা যাইতে পারে।

এই সামন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম হেমন্তসেন। হেমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সামন্তসেন দেব গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র আশ্রমে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেমন্তসেন দেব একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার রাজ্যী পতির রত্নস্বরূপ একান্ত প্রিয়তমা, সতী, ব্রতপরায়ণা, যশস্বিনী, ত্রিভুবনমোহিনী ও স্মৃতিশালিনী ছিলেন। তাঁহার নাম যশোদেবী। রাজা হেমন্তসেনদেব শৈব ছিলেন।

মহাদেব ও দেবী হইতে উৎপন্ন কার্ত্তিকের ন্যায়, যশোদেবীর গর্ভে হেমন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। ইনিই বিজয় সেন। প্রস্তর ফলকে বিজয়সেনকে কপিসৈন্যনেতা রামচন্দ্র ও পাণ্ডবসেনাপতি ধনঞ্জয় হইতে শ্রেষ্ঠ বীর বলা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বিজয়সেনের, সংগ্রামক্ষেত্রে অনন্ত অসিচর্চা দর্শনে জনগণ আশ্চর্য্যাবিত হইত; তাঁহার খড়্গ নীলকমলসদৃশ হইয়াও

শত্রুগণের মর্শ্ব দলন করিত; নবজলধরের নাম্য হইয়া অরাতিদিগের অন্তঃকরণ যন্ত্রণা-নলে দগ্ধ করিত; জমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও ভয় বিস্তার করিত। কচ্ছলবৎ হইয়াও শত্রুদিগের যন্ত্রণা উৎপাদন করিত। তিনি সেই উজ্জল খড়্গ দ্বারা শত্রু নরপালদিগকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজঃস্বয়ংসদৃশ ও ভুজদক্ষ প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় ছিল।

প্রস্তর ফলকের বিংশতি শ্লোকের মর্ম্মা-লোচনা দ্বারা অল্পমিত হয় যে বিজয়সেন গোড় ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন।^৬

প্রস্তর লিপির দ্বাবিংশতি শ্লোকের মর্ম্মা-লোচনা দ্বারা অল্পমিত হয় যে অল্পগঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার জন্য বিজয়সেন এক বহর রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা রণতরী গঙ্গার উপত্যস্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রার ফল কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কোন্ দেশের রাজ্য বিজয়ের বাহুবলে পরাজিত হইয়াছিলেন, কবিবর উমাপতি তাহার উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে বিজয়সেনের রণতরী গঙ্গাবক্ষ বিলোড়ন করিয়া হিমালয়ের পদমূল পর্য্যন্ত গিয়াছিল কি না ইহাই সন্দেহ স্থল। কবি উমাপতি একজন খ্যাত

নামা অভ্যাক্তিপ্রিয়। তাঁহার সকল কথা আমাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

বিজয়সেন যে গোড় বিজয় করিয়াছিলেন ইহা একপ্রকার সর্ববাদিসম্মত। মিত্র মহোদয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয় ও তাঁহার পিতৃপিতামহকে গোড় রাজ্য অবধারণ করিয়াছিলেন।^৭ সুতরাং গোড়ের রাজ্য কর্তৃক গোড়বিজয়বাক্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মিত্র মহাশয় আশ্রম ক্রিয়ৎ-পরিমাণে অল্পভব করিয়া লিখিয়াছেন যে বিজয় ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বঙ্গের রাজ্য ছিলেন। বিজয়সেন পালরাজকে জয় করিয়া গোড় অধিকার করেন।^৮ কিন্তু বিজয়ের পূর্বপুরুষগণ যে বঙ্গের রাজ্য ছিলেন তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। মিত্র মহোদয় কেবল অল্পমানের প্রতি নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যখন প্রস্তর লিপি হইতে দেখাইয়াছি যে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণকে “দাক্ষিণাত্য কো-নীন্দ্র” ও বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেনকে কর্ণাটলুণকারী তুর্ভুতদিগের দমনকর্তা বলা হইয়াছে, তখন অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বিজয় ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথনিবাসী ছিলেন।

৬ স্বঃ নানাবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
ঋদ্ধাহন্যাথ মননরূঢ় নিগূঢ় রোষঃ ।
গৌড়েজ্জমজবদপাকৃত কামরূপ
ভূপঃ কলিঙ্গমপি যন্তরশা দিগ্বার ।

৭ Journal Asiatic Society of Bengal. Vol. XXX. part 1. page. 130.
৮ J. A. S. B. Vol. XLVII. pt. 1. page. 400.

দক্ষিণাঞ্চলবাসী চোলরাজগণ এক সময়ে অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের ভূজবলে এক সময় সমস্ত ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। চোলরাজকুলজিত কুলভূগার শাসন পত্রে লিখিত আছে, এই রাজা বাঙ্গালা ও তদেখাধিপতি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন। ১

মেকজিসংগ্রহের ভূমিকায় বিজয় উইলসন চোলরাজের বাঙ্গালা বিজয় বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ কথিত আছে যে চোলরাজ অর্ধবপোভারোহণে বাঁধা করিয়া কলিঙ্গ ও গোড় জয় করিয়াছিলেন। ১০ কিকি-দক্ষিণ সার্কশতাব্দী পূর্বে কয়েকখান চন্দ্রলিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি বাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্র শাসন আবিস্কৃত হইয়া তাহার সত্যতা পোষণ করিতেছে।

চোলা রাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্মের

১ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1876, page. 108.

১০ Mackenzie Collection. Vol. 1 page. LXXXV111.

কিন্তু উইলসন সাহেব ভ্রমক্রমে কুলভূগার পরিবর্তে তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলাকে বাঙ্গালা আক্রমণকারী লিখিয়াছেন। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে জনৈক ভিন্ন দেশীয় রাজা কর্তৃক জলপথে বাঙ্গালা আক্রমণের কথা কর্ণেল উইলফোর্ড ও লিখিয়া গিয়াছেন। (A. R. Vol IX. page 39.) দক্ষিণ দেশীয় কোন নরপতি দ্বারা যে একবার বাঙ্গালা বিজিত হইয়াছিল ইহা সর্ববাদিসম্মত।

মূল উৎপাটন করেন। চোলা রাজগণের বিজয় বৈজয়ন্তী যে অল্পগাঙ্গ প্রদেশে উড়্ডীন হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন লেখক বলেন যে বৈদ্যনাথের শিবমন্দির চোলরাজগণের নির্মিত। ১১ মন্দির গিরির সাহুদেশে জনৈক চোলা নরপতি যে শিবমন্দির নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যপি বর্তমান থাকিয়া চোলা রাজগণের বাঙ্গালায় আগমনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ডাক্তার বকুনন বলেন যে চোলরাজ আদিত্যসেন সমস্ত অর্ধাবর্তে জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন। চোলা রাজদিগের যে কয়েকখানি বংশাবলী আশ্রয় দর্শন করিয়াছি ১২ তাহার একখান নাতেও আদিত্যসেন নামটী দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু মেকজি সাহেব “আদিত্য চোলা” নামে এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন অতএব বোধ হয় বকুনন তাঁহাকেই এই নামে পরিচিত করিয়াছেন। মহীশূরের ইতিহাসে ডাক্তার বকুনন কুলভূগাকে “ত্রিভুবনচক্রবর্তী” লিখিয়াছেন। বাহা হউক কোন কোন চোলানরপতি যে গঙ্গাসৈন্যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকের স্বীকার করিয়াছেন। চোলরাজদিগের মধ্যে কুলভূগা দুর্বল ছিলেন এমত নহে। ডাক্তার বারনেল তাঁহাকে চোলা রাজবংশের

১১ Eastern India. Vol. 11. p. 22.

১২ Journal Royal Asiatic Society Vol. VII1. page ১২, 23.

সৰ্ব্ব প্রাধান নরপতি লিখিয়াছেন । ১৩ তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পালরাজ-
গণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রতিশোধ
লইবার জন্য শৈব নরপতি বাঙ্গালা আক্রমণ
করিয়াছিলেন । চোলা রাজগণ ভারতের
ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া তাহাদের আত্মীয়
ও অহুচরবর্গকে সেই সেই প্রদেশের রাজ-
সিংহাসনে অভিষিক্ত করার কথা ডাক্তার
বকুনন লিখিয়া গিয়াছেন । ১১৪

রাজসাহির প্রস্তরলিপি ও কুলতুঙ্গার
শাসন পত্র বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া
বোধ হইতেছে বিজয়সেন চোলা রাজবং-
শের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র । তিনি
কুলতুঙ্গ দ্বারা গোড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত
হইয়াছিলেন ।

চোলা রাজগণ শৈব ছিলেন । বিজয়-
সেন শিবোপাসক । সূত্রায় শৈব নরপতি
বৌদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া জনৈক
শৈব ব্যক্তিকে গোড়ের রাজ্যসনে স্থাপন
করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন বলিয়া সহ-
জেই বিবেচনা করা যাইতে পারে ।

এই সময় যে সকল ব্রাহ্মণ দক্ষিণাপথ
হইতে বাঙ্গালায় উপনীত হন, তাহারা ই বোধ
হয় বৈদিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ।
নচেৎ দক্ষিণাপথনিবাসী ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গা-
লায় আসিবার আর কোন সূত্র ইতিহাসে
পাওয়া যায় না । বঙ্গীয় "দাক্ষিণাত্য বৈদিক"
গণ দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়াছিলেন,
একথা তাহারা অদ্যাপি বলিয়া থাকেন ।

আমরা বারবার যে প্রস্তর লিপির কথা
উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রস্তর ফলক রাজসা-
হির অন্তঃপাতি গোদাগাড়ি থানার অধীন
দেওপাড়া গ্রামের নিকটবর্তী "বরিন্দা"
নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । প্রাচীন-
কালে বেগবতী স্রোতস্বতী পদ্মা এই পরি-
ভ্রাজ পল্লীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত
হইত । এক্ষণে পদ্মার প্রবল স্রোত এই স্থান
হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরবর্তী । একটা পুষ্ক-
রিণীর উপতটে প্রোক্ত প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত
হওয়া গিয়াছে । সেই জলাশয়ের মধ্যে পূর্বে
আরও ২১১ থানা প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইত ।
কিন্তু এক্ষণে তাহা জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হই-
য়াছে । যেখানে এই প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত
হওয়া গিয়াছে তাহার অনতিদূরে সার্কি ষষ্ঠ
শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরনির্মিত এক মস-
জিদ বর্তমান রহিয়াছে ।

প্রস্তর ফলকের মধ্যলোচনা দ্বারা অহু-
মিত হয় য, মহারাজ বিজয়সেন দেব একটা
মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রত্নস্মরণ শিবমূর্তি
স্থাপন করিয়াছিলেন । অতুষ্কতিপ্রিয় কবি
উমাপতি এই মন্দিরের বর্ণনা করিতে যাইয়া
সমুদ্র, গগন, মেরু-পর্বত, সূর্য্য, অগস্ত্য ও
বিন্ধ্য পর্বতকে লইয়া টানাটানি করিয়া-
ছেন । মন্দিরের পরিধি সমুদ্রবেষ্টিত, তা-
হার মধ্য গগনতলসদৃশ পরিসর ও চতু-
র্দিক বিস্তৃত । মন্দিরের চূড়া উদয় ও অন্তা-
চলের মধ্যবর্তী মেরু-পর্বতের ন্যায় উচ্চ ।
তৎপরে কবি সূর্য্যকে বলিতেছেন, তুমি
অগস্ত্যকে নিরর্থক দক্ষিণদেশবাসী করি-
য়াছ । বিন্ধ্যপর্বত যত শক্তি উচ্চ হউক

১৩ P. A. S. B. 1876. page 108.

১১ Eastern India, Vol. II p. 22.

না কেন, এই মন্দিরের ন্যায় উচ্চ হইতে পারিবে না। এই মন্দিরের উচ্চ চূড়াই সূর্য্যরপের হরিতাশ্বের গতিরোধ করিল। বিধাতা স্তম্বেকতুল্য মৃত্তিকা দ্বারা পৃথিবী-তুল্য চক্রে এক ঘট প্রস্থত কবিলেও মন্দির শীর্ষস্থিত স্তম্বেকতুল্য হইবে না। অ-ত্যাভিপ্রিয় কবিদিগের মধ্যে উমাপতির নাম ক্রীতদর্শের পবেই নির্দেশ করা যাইতে পারে। বাহা হউক বিজয়সেন এই মন্দির নির্মাণ করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া-ছিলেন। কে বলিতে পারে যে, এই মন্দিরের প্রস্তর লইয়া হিন্দুকীর্তিদোহী মুনলমানেরা উল্লেখিত মসজিদ নির্মাণ করিয়া যান নাই।

যে সময়ে বিজয়সেন গোড়ের রাজ্যসনে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে বোধ হয় আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গ (বা সমতট) প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিজয় সমতটের রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। বোধ হয় এই কন্যার গর্ভেই বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। কুল্যার্চাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদি-শূরের কন্যাকুলসম্ভূত লিখিয়াছেন। সেন রাজগণের যে কয়েকখানি তাম্রশাসন আ-বিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমস্তেই লিখিত আছে যে অধিতীয়কীর্তিশালী, অধর্ম্মের বিষম্বরূপ, বেদমার্গাবলম্বী বল্লালসেন বিজয়সেন হ-ইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গর্ভিত শত্রুদিগকে নিধন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে কধিরনদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ বল্লালসেন দেব স্বীয় কার্য্য-কলাপ দ্বারা বঙ্গবাসীদিগের নিকট চির-

স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রজা-রঞ্জন দ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্গবাসীগণ বিবিধ অলৌকিক ও বিস্ময়-জনক ঘটনাবলী রচনা করিয়া তাঁহার না-মের সহিত গ্রথিত করিয়াছেন।

কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদি-শূরের পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কেহ বা তাহাকে আদিশূরের দৌহিত্র ও ক্রীতদর্শের পুত্র, অন্য কেহ তাহাকে “বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র” ও আবুল ফাজেল তাহাকে স্বকসেনের পুত্র লিখিয়াছেন।

হুই চারিখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-পুস্তকে লিখিত আছে বল্লালের পিতার দুই স্ত্রী ছিল। বল্লাল-পিতা কনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি সমধিক অহরন্তর ছিলেন। ক্ষোষ্ঠা রাজ্যী ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া ভ্রতৈক উদাসীন দ্বারা এক যজ্ঞ করাইলেন। উদাসীন যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তাহার চক্র রাণীকে প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি এই চক্র আপনি রাজাকে খাওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনার চির আত্মা-কারী হইবেন। কনিষ্ঠা রাণী এই সংবাদ অবগত হইয়া ভ্রতৈক দাসী দ্বারা চক্র অপ-হরণ করিয়া তাহা ব্রহ্মপুত্র নদে বিসর্জন করিলেন। চক্রর আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে নদরাজ নরবেশে রাণীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সহবাস প্রার্থনা করিলেন। রাণী কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মপুত্র দৈবশক্তি দ্বারা রাণীকে মোহিত করিয়া বলিলেন ভদ্রে! আমার সহবাসে তুমি অপবিত্র হইবে না, তোমার সন্তান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমি হইতে তুমি

পুত্ররত্ন লাভ করিবে, তিনি অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন নরপতি হইবেন। নন্দরাজের সংসর্গে রাণী গর্ভধারণ করিলেন। রাজা রাণীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া আধুনিক চাকার নিকটবর্তী অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে নির্যাসিত করিলেন।

সেই নির্যাসিতা রাণীর গর্ভে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। বনে জন্ম বলিয়া তিনি বল্লাল আখ্যা প্রাপ্ত হন। দেব পিতার অনুগ্রহে তাঁহার শৈশব জীবন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়াছিল। জনপদের কোলাহলে তাঁহার জীবনের শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। হুঙ্কিয়া-সজ্জাসমাজের আয়োদ প্রয়োদ ও ভোগ বিলাসে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। তাঁহার জন্মদাতা নন্দরাজ লৌহিত্য তাঁহাকে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যায় শৈশবেই তাঁহাকে সুপণ্ডিত করা হইয়াছিল। তিনি শৈশবকালে রাজা ও সেনাপতিগণ দ্বারা পরিচালিত একদল সুশিক্ষিত সৈন্যকে অঙ্গ করিয়াছিলেন।

কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমরা এই সকল বিবরণ পরিচয় করিতে পারি। যাহা হউক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বল্লাল একজন বীর্যবান, বুদ্ধিমান বিদ্যান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মর্ম্মালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, তাঁহার শাস্ত্র লব্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া লেখনী ধারণ করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার রচিত দানসাগর গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে।

“ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌক্রীকাস্তোহপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ। পদান্তোজনবিশ্ববিশ্ব-বসুধাসাম্রাজ্যলক্ষ্মীযুতঃ। শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিজয়তে সৎসদৃশচিন্তামণিঃ * * ইতি পরমমাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্করঃ শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেব বিরচিতঃ শ্রীদানসাগর সমাপ্তঃ।

রা বল্লাল একজন শিবভক্ত ছিলেন এজন্য নাই আমরা তাঁহার নামের সহিত “পরম মাহেশ্বর” ও “নিঃশঙ্ক শঙ্কর” এই দুইটা পদ সংযুক্ত দেখিতে পাই।

আদিশুরের সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কাশ্মীর বাঙ্গালার উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের মধ্যে বল্লাল যাহাদিগকে নবগুণ ১৫ সম্পন্ন দর্শন করিলেন তাহাদিগকে সেই সেই কুল মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা কুণীন আখ্যাদ্বারা সম্বানিত করিয়া-ছিলেন।

দক্ষের উত্তর পুরুষ—চট্টবংশীয় বহুরূপ, সূচ, অরবিন্দ, হল্যদুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন।—

ছান্দকের উত্তর পুরুষ—পুতিভূগুণবংশীয় গোবর্দ্ধন, ঘোষাল বংশের শির, কাজীলাল বংশের কাহু ও কুতুহল এই চারিজন।—

বেদগর্ভের উত্তর পুরুষ—গাজুলি বংশের

১৫ আচার্য্যো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম।

নিষ্ঠাবৃন্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

শিশু, কুন্দগ্রামী বংশের দ্বোষাকর, এই দুইজন ।—

ভট্টনারায়ণের উত্তর পুরুষ বন্দ্যোবংশের মহেশ্বর, জাহ্নন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয়জন ।—

ক্রীর্ধের উত্তর পুরুষ—মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুইজন ।

সর্বশুদ্ধ উনিশজন রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে বল্লাল কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে দক্ষের অষ্টম উত্তর পুরুষ বহরূপ ; ছান্ডের নবম উত্তরপুরুষ গোবর্দ্ধন ; বেদগর্ভের অষ্টম উত্তরপুরুষ শিশু গাঙ্গুলি ; ভট্টনারায়ণের দশম উত্তরপুরুষ মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও ক্রীর্ধের ত্রয়োদশ উত্তর পুরুষ উৎসাহ মুখটী বল্লালের সমসাময়িক। সুতরাং এই সকল ব্রাহ্মণের বংশাবলী অল্প সারে আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০ ও ১১ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। যদি আমরা এই দুই নরপতির মধ্যে গড়ে নয় পুরুষ ব্যবধান ধরিয়া, মিত্র মহোদয়ের অবস্থিত, তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আদিশূরের অন্তর তিন শত বৎসর পরে বল্লাল ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্বে আমরা আদিশূরের যে সময়াবধারণ করিয়াছি, তাহা ইহার সহিত ঐক্য হইতেছে। আদিশূর শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (বা খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) জীবিত ছিলেন। সুতরাং বল্লালসেন শকাব্দের দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর

প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন বলিয়া লেখা যাইতে পারে। দানসাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে “সময় প্রকাশ” প্রণেতা লিখিয়াছেন, যে, এই গ্রন্থ “নিখিল নৃপচক্র তিলক শ্রীবল্লালসেন দেব ১০১৯ শকাব্দে” (১০৯৭ খৃঃ অঃ) রচনা করেন।^{১৬} দানসাগর গ্রন্থ বল্লালের প্রথম বয়সের রচনা নহে এজন্যই এই গ্রন্থ রচনার ৩১ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খৃঃ অঃ) মিত্র মহোদয় বল্লালের অভিষেক কাল অবধারণ করিয়াছেন এবং আমরা ও ইহা অনুমোদন করিতেছি।

কয়েকখানা কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে সেনরাজগণ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। এবং যখন যে ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গোঁড়ের শাসন কর্তৃত্বে নিয়োগ করিতেন। বল্লাল যখন দিল্লীতে রাজত্ব করেন, তৎকালে তাঁহার পুত্র লক্ষণসেন দেব গোঁড়ের শাসনকর্তা ছিলেন। বৈদ্যকুলজিকারগণ বলেন যে, এই সময় বল্লাল এক নীচজাতীয়া রমণীর প্রণয়ে আসক্ত হন। এজন্য লক্ষণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল। তৎকালে লক্ষণসেনের অল্পগত বৈদ্যগণ, বল্লালের সহিত সংগ্রহ পরিভাগ মানসে উপবীত পরিভাগ পূর্বক শূত্রভাব ধারণ করে। এই ঘণিত

১৬ নিখিলনৃপচক্রতিলকশ্রীবল্লালসেন দেবেন।

পূর্বেবংশাদিশমিত্তে শকাব্দে দান সাগরোক্তঃ

মিথ্যা বাক্য পোষণোপযোগী কতকগুলি অশ্লীল কবিতা বঙ্গদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। যে কলুষিত কৃচি হইতে কবিচূড়ামনি কালিদাস নব্বন্ধীয় অশ্লীল গল্প প্রচারিত হইয়াছে। যে জুড়ুপিত কৃচি বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের প্রিয়তমা গুণী “লছমী” দেবীর নির্মল চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা প্রসব করিয়াছে। বল্লাল সেনদেবের বিমল চরিত্রের কলঙ্ক যে কেবল সেই ঘৃণিত কৃচির প্রসবিত্রী এমত নহে, ইহাতে একটি সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থও জড়িত রহিয়াছে। বৈদ্যজ্ঞাতির উপবীত হীনতার অমূলক কারণ প্রচার করিবার জন্য সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া বল্লালকে দিল্লীর রাজ্যাসনে স্থাপন পূর্বক সম্পূর্ণ মিথ্যা বাক্য দেশ মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। রাজনগর নিবাসী রাজবল্লভ সেন এই সমস্ত চক্রান্তের মূল কারণ। ১৭

সেন রাজগণের দিল্লীতে রাজত্ব করার উক্তি আমাদের বিবেচনায় বাতুলের প্র-

১৭ পূর্বে সেন রাজগণ আমাদের দেশে কায়স্থ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। এজন্যই আবুল ফাজেল ও জোসেপ্ টিফিন তন্মার তাঁহাদিগকে কায়স্থ লিখিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যবংশীয় রাজবল্লভসেন ১০ দশ লক্ষ টাকা দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ঘটকদিগকে বাধ্য করিয়া সেন রাজগণকে বৈদ্য ও রাজবল্লভকে তৎবংশের অবধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ পূর্বক অষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। Eastern India, Vol. II p. 615. History and statistics of Dacca Division; page 4. যুক্তাজ্ঞ বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলী ১১০ পৃষ্ঠা; রাজা রাজবল্লভসেনের জীবন চরিত। (বান্ধব, মঙ্গল ৭৩, ৭৯ পৃষ্ঠা) সঙ্কট নির্ণয়, সমালোচনা (বান্ধব, অষ্টমখণ্ড ২৫০—২৬০ পৃষ্ঠা) দেখা।

লাপ মাজ। যে সময়ে আমরা সেন রাজগণকে গোড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখিতে পাই ঠিক সেই সময়ে, রাঠোর বংশীয়েরা কনোজে ও তুঙ্গর, তৎপর চৌহান বংশধরেরা দিল্লীতে রাজত্ব করিতে ছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত অনঙ্গ পালের অধিকারের পূর্বে কনোজ ও দিল্লী এক রাজত্বের অধীন ছিল। তৎপরে আর্ঘ্যাবর্তে একটি বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লব দ্বারা আত্মক হইয়া রাঠোর বংশীয় চন্দ্রদেব কনোজে ও তুঙ্গরবংশীয় বিলনদেব দিল্লীতে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। যেখানে একসময় যুধিষ্ঠির ভারতের সমস্ত রাজ্যবর্গকে জয় করিয়া রাজত্ব যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সুগুণের পুনরুদ্ধার পূর্বক বিলনদেব (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল আখ্যা ধারণ করত ৯৭৪ শকাব্দে (১০৫২ খৃঃ অঃ) দিল্লীর রাজ্যাসন উজ্জ্বল করেন। সেই মহাশয়শান ক্ষেত্রে যে রাশি রাশি ভগ্নাট্টালিকা “কুতুবজ” নামে পরিচিত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। আর্ঘ্যাবর্তের অধিকাংশ নরপতি (দ্বিতীয়) অনঙ্গপালকে “মহারাজাধিরাজ” বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই অনঙ্গপাল হইতে ছহড়দেব বা তৃতীয় অনঙ্গপাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল তুঙ্গর বংশীয়েরা প্রবল পরাক্রমের সহিত দিল্লী শাসন করিয়াছিলেন। তৃতীয় অনঙ্গপালের পর তাহার দৌহিত্র (চৌহান বংশীয় সোমেশ্বরের পুত্র) সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরচূড়ামনি পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৮ এই সকল বিখ্যাত নরপতিগণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বৈদ্য কুলজি

১৮ কবি টাদ বর্দাই তাঁহার “পৃথ্বীরাজ চৌহান রাসো” গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে ২৮ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, যে, চৌহান পৃথ্বী-

লেখকগণ সেনরাজ্যকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময়েই বঙ্গের রাজধানী “সমভট” বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই বিক্রমপুর নগরী অধুনা ‘বল্লাল বাড়ী’ বা ‘রামপাল’ নামে পরিচিত রহিয়াছে। ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজ-বাটীর চতুর্দিকে যে বৃহৎ পরিখা ছিল তাহা ক্রমে ভরাট হইয়া শুকাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। সুপ্রশস্ত রাজপথগুলির চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। যে স্থানে রাজ-বাটী ছিল বলিয়া কথিত হয় তাহার দক্ষিণাংশে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্তমান রহিয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য অল্পমান ৩৫০০ হস্ত ও পরিসর এক সহস্র হস্ত হইতেও অধিক। বর্তমান সময়ে এই দীর্ঘির অনেক স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বল্লালের সময়ে এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য ও পরিসর কত দূর ছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। উক্ত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা ও পুকুরিণী সমূহ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ স্থানে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অতি অল্পই প্রত্যক্ষ হয়। অধিকাংশই ভূগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। রামপাল ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহে ভূমি খনন করিলে প্রায়ই রাশি রাশি

ইষ্টক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে এইরূপ ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা অট্টালিকা প্রভৃতি নি-
শ্চাপ করিয়াছেন। একবার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের এক ষণ্ড প্রস্তর এইস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ১৯ যাহা হউক মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানীর কেবল চিহ্ন মাত্র এক্ষণে বর্তমান রহিয়াছে। আর সকলই কালের অনন্ত কবলে কবলিত হইয়াছে। সার্বণ গোত্রীয় বেদগর্ভের উত্তর-পুরুষ ত্রীআদিদেব বঙ্গালের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ত্রীআদিদেব—

যো বঙ্গরাজরাজ্যত্রীবিজ্ঞানসচিবঃ শুচিঃ।

মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবক্ষ্যাসন্ধিবিগ্রহীঃ।

বল্লালসেন দেব স্বীয় অধিকৃত দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, যথা বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বরেন্দ্র ও মিথিলা। আমরা এই সকল বিভাগের সীমা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে নির্দেশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। বল্লালের সময়ে মিথিলার কিয়দংশ বাঙ্গালার রাজদণ্ডের অধীন ছিল।

বল্লালসেন দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণদেব দেব বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন। লক্ষ্মণসেন ১০২৮ শকাব্দে (১১০৬ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে অল্প প্রচলন করেন তাহা দীর্ঘকাল এদেশে প্রচলিত ছিল। অধুনা ঐ অল্প কেবল মিথিলা প্রদেশে সামান্য রূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মণদেব দেব ভাড়াশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে যে ভূমি দান করিয়া-

রাজকে দিল্লী প্রদান করিয়া তুঙ্গর অনঙ্গ-পাল বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

“দিয় দিলী চহআন কোং

তুঙ্গর বজ্রী আই।”

ইত্যাদি।

কিন্তু পৃথীরাজের গোদিত লিপিতে তাঁহার মাতুল কিরণ দেবের নাম উল্লেখ আছে। (A. R. XV. 444.) বোধ হয় কিরণদেব তাঁহার পিতার বর্তমানেই পরলোক গমন করেন।

১৯ রামপালের বিবরণ, Taylor's Topography of Dacca, and Taylor's Pereplus of the Erythrean sea. দেখ।

ছিলেন তাহার দুই খণ্ড তাম্রশাসন আ-
বিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রথম এক খণ্ড তাম্রশাসন সুন্দরবনে
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের
দশই মাঘে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসন
পত্র দ্বারা “পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক
মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন দেব” খাড়া
মণ্ডলিকার অন্তর্গত তিন স্রোণ ভূমি, ঋগ্বে-
দাশালায়ন শাখাধারী শ্রীকৃষ্ণধর দেব-
শর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভূমির
বার্ষিক রাজস্ব পঞ্চাশৎ পুরাণ অর্থাৎ ৫০
কাহণ কড়ি ধার্য্য হইয়াছে। ২০

লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় তাম্রশাসন দিনাজ-
পুরের অন্তর্গত তর্পণ দীঘির নিকটে প্রাপ্ত
হওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ সাত লক্ষ্মণ-
সেনের ৩রা ভাদ্র। এই শাসনপত্র দ্বারা
মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ভরদ্বাজ গোত্র,
“সামবেদ কোথুম শাখা চরণাচুঠায়িনে”,
শ্রীকৃষ্ণ দেবশর্মাকে বিলুপ্তি প্রামের কিস-
দংশ ভূমি দান করেন। ইহারও বার্ষিক
রাজস্ব ৫০ কাহণ কড়ি ধার্য্য হইয়াছিল। ২১

প্রোক্ত দুই খণ্ড শাসনপত্রের দ্বারা যে
দুই জন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইয়াছিল
আমাদের বিবেচনায় তাহারা বৈদিক শ্রে-
ণীর ব্রাহ্মণ।

উভয় শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন তাহাদের
রাজ্যের “শ্রীপোণ্ডবর্জন” আখ্যা প্রকাশ
করিয়াছেন। কিন্তু দান বিষয়ের ঘোষণা-
পত্র “শ্রীবিজয়পুর” হইতে প্রচারিত হইয়া-
ছিল ইহা তাম্রশাসনেই লিখিত আছে।
লক্ষ্মণসেনের নিবাসভূমি বিজয়পুরে ছিল,
ইহাও শাসনপত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

লক্ষ্মণসেন দেব বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু
তাম্রশাসনের শীর্ষ দেশে ভগবতী দাক্ষা-

য়ণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। বোধ হয়
ইহা সেন রাজগণের কৌলিক দেবতার
প্রতিকৃতি। নারায়ণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি
লক্ষ্মণসেনের “সন্ধিবিগ্রহিক” ছিলেন।
শাসনপত্রাদিতে তাহার উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ যে সকল পণ্ডিত-
রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, কবিবর জয়দেব
তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২২ উমা-
পতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব ও ধোয়ী-
কবিরাজের নাম লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের
দ্বারস্থ প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে। ২৩
ডাক্তর ভুলার কাম্বীরে একখণ্ড হস্তলিখিত
গীতগোবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের
শেষভাগে জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সম-সাম-
য়িক লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয়
কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থ হইতে একটা পংক্তি
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে জয়দেব
লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২৪

এই পঞ্চ পণ্ডিত রত্নের মধ্যে জয়দেব
ও গোবর্দ্ধন ২৫ রাষ্ট্রীয় ও উমাপতি,
শরণ ও ধোয়ী কবিরাজ বৈদিক কি বারেন্দ্র
ছিলেন তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে
পারে না।

২২ বাচঃ পল্লবয়ভূমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিঃ
গিরাং

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্রীঘোষক্লহ-
ক্রতে।

শৃঙ্গারোত্তর সংগ্রামে বচনৈরাচার্য্য গোব-
র্দ্ধন

স্পন্দীকোহপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী
কবিন্দ্রাপতিঃ ॥

গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, চতুর্থ শ্লোক।

২৩ গোবর্দ্ধনশ্চ শরণৌ জয়দেব উমাপতিঃ।

কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ ॥

২৪ Indo—Aryans. Vol 11. page 240.

২৫ ইনি পুণ্ডিতবংশের গোবর্দ্ধন
নহেন। পঞ্চাৎ দেখ।

২০ ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

২১ J. A. S. B. Vol XLIV. part 1.
page 11.

সেন রাজদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেন সৰ্ব্ব প্রধান নরপতি ছিলেন । বাথরগঞ্জে প্রাপ্ত শাসনপত্রে লিখিত আছে এই রাজার “বাহ করিওণ্ড” ও বক্ষস্থল প্রস্তর সদৃশ কঠিন ছিল । তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত মুঘল-ধারী ও গদাপাণির (বলরাম ও জগন্নাথ) মন্দিরের সন্নিকটে (পুরীতে), ও অশী বরুণার-গঙ্গানদীতে অর্থাৎ বিশেষরক্ষিত বারানসীতে এবং ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী, ত্রিবেণী তটে (প্রয়াগে) যজ্ঞ স্থপ সমূহের সহিত সমর বিজয় স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন ।

এতদ্বারা বোধ হইতেছে যে লক্ষ্মণসেন-দেব একদিকে প্রয়াগ ও অন্যদিকে পুরী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন । কান্যকুব্জপতি-দিগের শাসনপত্র আলোচনা দ্বারা অস্ব-মিত হইতেছে, যে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রয়াগ ও বারানসী কনোজ রাজদণ্ডের অধীন ছিল । লক্ষ্মণসেনের বাজালা শাসনকালে মদনপাল ও তৎপরে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কান্যকুব্জ শাসন করিয়া গিয়াছেন । তাঁহারাই কেহই সেন রাজগণ হইতে দুৰ্ব্বল ছিলেন না । বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্রের ১১৬৬ সম্বতের (১০৩২ শক) শাসন পত্রে লিখিত আছে যে, হম্মীর গোড়ের দুৰ্ব্বার ভীষণ বিরদ সমূহের মস্তক চূর্ণ করিয়া বীরগণের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়াছিলেন, তিনি (গোবিন্দচন্দ্র) সেই হম্মীরকে জয় করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । ২৬

গোড়েশ্বর যে দুৰ্ব্বল ছিলেন ইহা দ্বারা এক্রূপ বোধ হয় না, বরং গোড়েশ্বরকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বলিয়াই আর্থ্য বীর সমাজে হম্মীরের খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই হম্মীরকে রণে পরাভূত করিয়া গোবিন্দচন্দ্র স্বরং আফালন করিয়াছেন । হম্মীর একজন অসাধারণ বীর ছিলেন । তাহার শত্রুগণই ইহা স্মৃষ্টাকরে লিখিয়া গিয়া-

২৬ Proceedings. As. So. Bengal, for 1876. page 131.

ছেন । ২৭ হম্মীর কোন প্রদেশের অধিপতি ছিলেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই । বোধ হয় কান্যকুব্জ ও বাজালার মধ্যবর্তী কোন দেশের রাজা ছিলেন । ২৮

যাহা হউক কেশবসেনের শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন দেবের বিক্রম বর্ণনা করিতে বা-ইয়া যে সকল কথা সন্নিবেশিত হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের শাসনপত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং বোধ হইতেছে এই সকল জয়স্তম্ভ প্রয়াগ, কাশী ও পুরীর পরিবর্তে, কবির কল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কেশব-সেনের তাম্রশাসনেই স্থাপিত হইয়াছে । যাহা হউক লক্ষ্মণসেন যে একজন দুৰ্ব্বল নরপতি ছিলেন এমত বোধ হয় না । দুৰ্ব্বল রাজগণ্যবর্গ দ্বারা স্থাপিত অক্ষ এক্রূপ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে না ।

বজ্রালপ্রবর্তিত কোলোনা প্রথা লক্ষ্মণ-সেন দেব দ্বারা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে ।

২৭ বীর চূড়ামণি পৃথ্বী রাজার খোদিত লিপিতে যতবার হম্মীরের নাম উল্লেখ হইয়াছে, প্রত্যেক বারেই নামের পূর্বে “বীর” শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে । Asiatic Researches. Vol XV page 444.

২৮ আমরা বোদ্ধ গয়ার ৩নং প্রস্তর লিপিতে এই রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাই । J. A. S. P. Vol. V. p. 658.

রঘুনাথর পতি বীরচূড়ামণি হম্মীরের জীবন চরিত “হম্মীররানৌ” গ্রন্থে তাহার যে জন্মকাল লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে গণনা করিলে তাহাকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে । কিন্তু উক্ত গ্রন্থে হম্মীরকে আলাউদ্দিনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে । (See Hamir Baso. Translated by Braja Nath Banarjee) সুতরাং আমরা রঘুনাথরপতিকে সেই হম্মীর বলিতে পারি না ।

বাথরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুর পরগনার জনৈক কৃষক ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্র ফলক আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ পরগনার তদানীন্তন জমিদার ৮ বাবু কানাইলাল ঠাকুর তাহা প্রাপ্ত হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদান করেন। ঐশাসন পত্রের মধ্যলোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা কেশবসেনের দান পত্র। কিন্তু শাসন পত্রের যে স্থানে কেশব সেনের নাম লেখা আছে, সেই স্থানটাই কাটা, ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে পূর্বে ইহার নাম লিখিত হইয়াছিল, তিনি এই দান কার্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার উত্তরাধিকারী সেই শাসন পত্রের আপন নাম সংযুক্ত করিয়া তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। শাসন পত্রের মধ্যলোচনা কালে বিজয়র প্রিন্সপ সাহেব এই সকল দর্শন করতঃ বিস্মিত হইয়া পূর্বে সঙ্কল্পিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে প্রিন্সপ সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা অনুমোদন করিতেছি। ২৯

আইন আকবরী প্রণেতা আবুলফাজেল লক্ষণ ও কেশবসেনের মধ্যবর্তী একজন রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই

২৯ It is curious that wherever the name of Kesava Sena occurs on the plate, there makes of an erasure; as if the grant had been prepared during the reign of Madhava Sena, and, on his dying before it was completed (for such a plate must have taken a long time to engrave), the name of his successor Kasava, fortunately happening to be of the same prosodial quantity, was ingeniously substituted, and *mutato nomine*, the endowment was completed and promulgated. Journal As. So. Bengal. Vol. VII. page 42,

মাধব সেন। রাজসী বনুদেবীর গর্ভে লক্ষণসেনের দুই পুত্র জন্মে, যেহেতু মাধব কনিষ্ঠ কেশব। মাধবসেনকে বঙ্গ দেশীয় কুলজি লেখকগণ কেশবের পরবর্তী অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কুলজি গ্রন্থগুলিকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

বাথরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, লক্ষণসেন দেবের প্রধান মহিষীর নাম বনুদেবী, তিনি সতীকুলের অগ্রগণ্যা, তাহাকে নিৰ্ম্মাণ করিয়া বিধাতার হস্ত পবিত্র হইয়াছিল, যেরূপ মহাদেব ও গিরিজা হইতে কার্তিক জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ “অম্বপতি,” “নরপতি” ও “গজপতি” রাজগণের অধিপতি, সেন কুলকমলের ভাস্কর স্বরূপ, সোম বংশের প্রাদীপ, দানে কণসদৃশ, গাঙ্গেয় সদৃশ সত্যব্রত, শরণাগতপ্রীতিপালক পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ কেশবসেন দেব জন্মগ্রহণ করেন।

কবি কেশবসেনের নামের সহিত অনেকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনটাই আমাদের উল্লেখ যোগ্য। প্রথম কেশবসেনকে “সোমবংশপ্রাদীপ” অর্থাৎ চন্দ্র বংশের উজ্জলকারী বলা হইয়াছে। এই শাসনপত্রে বিজয়, বল্লাল, লক্ষণ ও কেশবসেনের নামের সহিত “শঙ্কর গোড়েশ্বর” পদ সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আর কোনও শাসনপত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রিন্সপ ও মিত্র মহোদয় শঙ্কর-গোড়েশ্বর অর্থাৎ “ভাল” কিম্বা “শ্রেষ্ঠ” গোড়েশ্বর করিয়াছেন। ৩০

৩০ Mittra—The excellent Lord of Gour. Prinsep—The auspicious Lord of the city of Gour. কিন্তু প্রিন্সপ সাহেব বলেন “শঙ্কর গোড়েশ্বর” পদটী যদি দ্ব্যর্থ “স” দ্বারা (শঙ্কর গোড়েশ্বর) লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইহাকে

কাশ্মীর দেশে “শঙ্করগৌরীশ” নামে এক শিব মন্দির আছে। ৩১ সেন গোড়েশ্বর-দিগের মধ্যে কোন নরপতি এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া মিত্র মহোদয় অনুমান করেন। কিন্তু আমরা রাজতর-ফিনীর সাহায্যে ইহা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি যে, কাশ্মীর-রাজ শঙ্কর বর্মা “গৌরীশ্বর” মহাদেবের জন্য এই মন্দির নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। ৩২

শাসনপত্রে কেশবসেনকে “পরমদৌর” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্বর্ঘ্যোপাসক বলা হইয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব সৌরকে “সৌর” করিয়া তাহার অর্থ “শ্রেষ্ঠবীর” করিয়াছেন। কিন্তু শাসনপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একাদশ পংক্তির মধ্যভাগে অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গেলেই “সৌর” শব্দ দ্ব্যর্থ “স” দ্বারা লিখিত থাকা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজ্যাবগের শাসন-পত্রে স্বর্ঘ্যো-পাসক রাজাদিগের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সেন গোড়েশ্বরদিগের মিশ্র বা নীচ জাতির প'রচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিব। কিন্তু “সোমবংশ প্রদীপ” পদটী স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চাৎ ভাগে এইরূপ অর্থ যুক্ত পদ প্রয়োগ কোন মতেই সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। শাসন পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অষ্টম পংক্তির আরম্ভ ও শেষ ভাগে দুইবার, নবম পংক্তির মধ্যভাগে এক বার ও দ্বাদশ পংক্তির প্রারম্ভ একবার, সর্বশুদ্ধ চারিবার “শঙ্কর গোড়েশ্বর” পদের উল্লেখ আছে। সেই সেই স্থানে তালব্য “শ” খোদিত রহিয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহার ভ্রম মূলক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া এইরূপ কৃতকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩১ Journal As. So. Bengal. Vol. XVII Part II. p. 283.

৩২ A. R. XV. 65.

বাথরগঞ্জের শাসনপত্র দ্বারা কেশব-সেনদেব বঙ্গদেশস্থ বিক্রমপুরের অন্তঃপাতি বাঙালী প্রভৃতি গ্রামমধ্যে ৩০০ (ত্রোণ) ভূমি শ্রুতিপাঠক জীর্জ্বর দেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন।

কেশবসেনের পর কোন মহাত্মা বাঙ্গা-লার সিংহাসন আরোহণ করেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবুলফাজেল তাঁহার আ-ইন আকবরীতে কেশবসেনের পর সদাসেন ও নৌযাজ্ঞে নামক দুইজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকখানি কুলজি গ্রন্থে ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলীতে কেশবসেনের পর নয়জন রাজার নাম লিখিত আছে। ইহার অধিকাংশই কাল-নিক। যাহা হউক এই নয় জন রাজার মধ্যে আমরা “হরিসেন” নরপতির উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

সাবর্ণ গোত্রীয় “ভবদেবভট্ট বালবল্লভী-ভুজঙ্গ” নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাঢ় প্রদেশে এক মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। ভবদেব ভট্টের বন্ধু জীবাচম্পতি শর্মা প্রস্তরাক্ষিত কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাবর্ণ গোত্রে ভট্ট ভবদেব জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি গোড়েশ্বর হইতে রাঢ় দেশস্থ একশত গানি গ্রাম দান প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। রথাজ তাঁহার এক পুত্র। রথাজের পুত্র অত্যাঙ্গ, তৎপুত্র বৃধ তাহার পুত্র জীমানিদেব ইনি বঙ্গরাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। (আমরা ইহাকে বঙ্গালের মন্ত্রী লিখিয়াছি।) তাহার পুত্র গোবর্দ্ধন। ইনি কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। (আমরা এই গোবর্দ্ধনকেই লক্ষ্মণ-সেনের সভায় দেখিতে পাইতেছি।) গোবর্দ্ধন বঙ্গোৎপত্তীয় সঙ্গোকার পাণিগ্রহণ ক-রিয়াছিলেন। সঙ্গোকার গর্ভে গোবর্দ্ধনের এক পুত্র জন্মে, ইনি ভট্ট জীবদেব বাস-

বল্লভী ভূজঙ্গ। ইহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে ধর্মবিজয়ী হরিবর্ষদেব দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। ৩৩ এই প্রস্তরলিপির সম্বন্ধে আমরা অবশ্যই লক্ষণাঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; কারণ তৎকালে আমাদের দেশে লক্ষণাঙ্কই প্রচলিত ছিল।

লক্ষণসেন দেবের চৌত্রিশ বৎসর অন্ত্রে যে হরিবর্ষদেব রাঢ়ে বঙ্গ রাজত্ব করিতে ছিলেন, তাহার নাম অবশ্যই কেশবসেনের পর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নরপতির নামে “সেন” শব্দ সংযুক্ত না থাকায় একটা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই সন্দেহ কোন কার্যের নহে। গুপ্ত বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি ঘটোৎকচের নামে “গুপ্ত” শব্দ সংযুক্ত নাই। গুপ্ত রাজগণের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী “ভূবোধিনি পত্রিকায়” প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, কয়েকজন রাজার নামের সহিত গুপ্ত শব্দ সংযুক্ত নাই। উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজা জনমেজয় ও তাহার পুত্র যযাতি ও অন্যান্য কয়েকজন রাজার নামের সহিত “কেশরী” শব্দ সংযুক্ত নাই। ৩৪ সুবিখ্যাত মিত্রবংশীয় দ্বিতীয় রাজা ভদ্র-ঘোষের নামের সহিত মিত্র শব্দ সংযুক্ত নাই। ৩৫ কান্যকুব্জ পতি দ্বিতীয় ভোজ-দেবের নামের সহিত পাল শব্দ সংযুক্ত নাই অথচ তাহার পূর্ব ও পরবর্তী চারি জন রাজার নামের অন্ত্রে পালপদ সংযুক্ত রহিয়াছে। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে, যে অশোককে, মিত্রমহোদয় সেন বংশের শেষ নরপতি লিখিয়াছেন তাঁহার নামে “সেন” শব্দ সংযুক্ত নাই। এমত অবস্থায়

হরিবর্ষদেবের নামে “সেন” পদ সংযুক্ত না থাকায়, তিনি সেন বংশীয় নহেন, বলিয়া কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। সেন শব্দ জাতি বাচক উপনাম নহে। “গুপ্ত,” “পাল” “বিষ্ণু” “সেন,” “আদিত্য,” “রুদ্র,” “বর্দ্ধন” “মাহ” “মাহি” “নাগ,” “মিত্র” প্রভৃতি শব্দগুলি ভারতের তিন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজবংশের নামের সহিত পুরু-ষামুক্রমে সংযুক্ত থাকার রাশি রাশি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ৩৬ প্রোক্ত প্রস্তর

৩৬ কেবল যে বাঙ্গালার রাজাদিগের নামের অন্ত “সেন” শব্দ সংযুক্ত ছিল, এমত নহে। বিজ্ঞাপকৃত পার্শ্বে একটা রাজ বংশ রাজত্ব করিতেন। ইহারা সাধারণতঃ “বা কটকপতি” বলিয়া খ্যাত ছিলেন এই বংশীয় প্রবরসেনের শাসনপত্রে ৫ জন সেন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা

মহারাজ প্রবরসেন।

” রুদ্রসেন।

” পুথিবীসেন।

” রুদ্রসেন।

” প্রবরসেন।

J. A. S. B. V, 128,

আর একটা সেন বংশ বল্লভীদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সূর্য্য বংশীয়। (উদয়পুরের জগন্নিধাত রাণাকুল এই বংশ হইতে সমুৎপন্ন)। শাসন পত্র হইতে তাহাদের নাম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। সেনপতি ভট্টায়ক (কণকসেন)।

২। ” ধরসেন।

৩। মহারাজ জোণসেন।

৪। ” জুবসেন।

৫। ” ধরভট্ট।

৬। ” গুহসেন।

৭। ” জীধরসেন।

৮। ” শীলাদিত্য।

৯। ” ঈশ্বরগুহ।

১০। ” জীধরসেন।

৩৩ J. As. So. Bengal. Vol. VI. p. 90.

৩৪ J. A. S. Bengal Vol. V11. p. 58, and, Vol. XLVI. part 1. pp. 150, 173.

৩৫ J. A. S. Bengal Vol. XLIX. part 1. p. 23.

লিপিতে খোদিত হরিবর্ষদেবই কুলজিকার-
গণ দ্বারা হরিসেন নামে পরিচিত হইয়া-
ছেন। এইরূপ ভ্রম যে কেবল বঙ্গদেশে হই-
য়াছে এমনত নহে। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস
লেখকগণ “কেশরী” বংশীয় সমস্ত রাজার
নামের অন্তে “কেশরী” শব্দ সংযুক্ত ক-
রিয়াছেন। ৩৭ খৃষ্টাব্দে যাজক টকিন-
তল্লার গোয়ালিয়ার রাজ বংশের যে তালিকা
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধারা-
বাহিক ৮৫ জন রাজার নামের অন্তে “পাল”
শব্দ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অথচ
প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন পাঠে অবগত
হওয়া যায় যে গোয়ালিয়ার রাজাগণের
নামের অন্তে “দেন,” “সিংহ,” “মল্ল,”
“সাহি,” “পাল” প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত ছিল।

হরিবর্ষদেবের পর আমরা অশোক চন্দ্র-
দেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মিত্র
মহোদয় ইহাকে মুসলমানদিগের লিখিত
লক্ষণেয় (লগমণিয়া) অবধারণ করিয়া-
ছেন। কিন্তু আমরা যে সকল কারণে মিত্র
মহোদয়ের মত অহুমোদন করিতে পারি-
তেছি না, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

বুদ্ধ গয়ার একটা বৌদ্ধ মন্দিরের
দ্বারস্থ প্রস্তরলিপিতে রাজাধিরাজ শ্রীমদ-
শোকচন্দ্র দেবের নাম খোদিত রহিয়াছে।
এই প্রস্তরলিপির অক্ষর শিশু বাঙ্গালা বা
গৌড়ীয়। প্রিন্সেপ সাহেব ইহার যে
প্রতিলিপি দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করি-
য়াছেন তাহা যে সন্দেহ শূন্য ও বিতর্ক তাহা
তিনিও স্বীকার করেন নাই এবং আমরা
ও স্বীকার করিতে পারি না। নিঃসন্দেহ
ভাবে আমরা প্রস্তরলিপি হইতে মহারাজ

অশোকচন্দ্র দেব ও তাহার ভ্রাতা কুমার
দশরথের নাম গ্রহণ করিতে পারি। কুমার
দশরথের কোবাধ্যক্ষ, মহামহাশয় ঋষি-
ব্রহ্মের পৌত্র, মহাশয়ক চাটব্রহ্মের পুত্র
শ্রীমহাপাদ ভট্টাচার্য্য এই মন্দির নির্মাণ
করিয়া তাহাতে খোদিত প্রস্তর লিপি সং-
স্থিত করিয়াছিলেন। প্রস্তরলিপির শেষ
ভাগে লিখিত আছে ‘ইতি শ্রীমল্লকর্ণদেন
দেব পদোদ্যমভীত রাজো সং ৫৩ বৈশাখবদি
১২ শুক্লো’। ৩৮

৩৮ মিত্র মহোদয় উদ্ধৃত অংশের এই-
রূপ অনুবাদ করিয়াছেন:—On Thursday,
the 12th wane, in the month of
Vaisakha, Sam. or year 74 after the
expiration of the reign of the auspi-
cious Lakshmana Sen Deva,

প্রিন্সেপ দেবনাগর অক্ষরে প্রস্তরলিপির
যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন মিত্র
মহোদয় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু
প্রস্তরলিপির অক্ষর লক্ষ্যে প্রিন্সেপ সাহেবের
বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি প্রথমতঃ বলেন
It contains a date sambat 73 or 74,
আবার কয়েক পংক্তি নীচে তিনি লিখি-
য়াছেন, The figures, however, are
unfortunately doubtful,

আমরা লক্ষণসেনপ্রদত্ত তর্পণদীঘির
তাম্রশাসনের খোদিত অক্ষরের সহিত বৌদ্ধ-
গয়ার প্রস্তরলিপির খোদিত অক্ষর তুলনা
করিয়া দেখিয়াছি যে, উক্ত প্রস্তরলিপির
দ্বিতীয় অক্ষ চারি না হইয়া তিন হইবে।
প্রথম অক্ষ লক্ষণসেনের তাম্রশাসন খোদিত
৭ অক্ষের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই।
ইহাকে একটা অর্ধভঙ্গ ৫ অক্ষের ন্যায় স্পষ্ট
দেখিতে পাইতেছি। অতএব আমরা প্রি-
ন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত ৭৩ কিংবা ৭৪ কে
“৫৩” লিখিতে বাধ্য হইলাম।

See J. A. S. B. Vol. V. p 659-
plate XXXI.

১১। „ কুবসেন।

১২। „ শ্রীধরসেন।

১৩। „ দিলাদিভ্য।

J. A. S. B. IV. 486 and V11. 906.

৩৭ Asiatic Reserches. Vol. XV
p. 264.

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।

(পূর্বের অনুরূপ)

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির উৎপত্তি ও উহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল; এক্ষণে দেখা যাউক কি কি প্রকারে উক্ত বৃত্তি উন্নত ও প্রবল হইতে পারে, আর কি কি প্রকারে উহা অধোপাশ্রু ও নিস্তেজ হইতে পারে। মোট কথা এই, যে যে উপায়ে কোন জাতির জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও সুনীতি বিস্তৃত হইতে পারে সেই সেই উপায়ে সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির তেজোরুদ্ধি ও উন্নতি হইতে পারে; জনসাধারণকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া জ্ঞান ও সুনীতি বিস্তারের একটী প্রধান উপায়, এই নিমিত্ত আজি কালি ইংলও আফ্রাণি প্রভৃতি দেশে ইতর শ্রেণীদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের এত দৃষ্টি পড়িয়াছে। * কিন্তু সকল দেশেই ও সকল

* কিন্তু আমাদের দেশের চাষাভূষাদের মধ্যে পড়িতে জানে না,—রামায়ণ মহাভারত থানা পড়িতে পারে না—এমন লোক অল্পই আছে। যাহারা বা পড়িতে জানে না, শুনিয়া শুনিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি তাহাদের এমন কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে যে তাহাতে পড়ার সমানই কাজ হয়। এইরূপে, ও আমাদের যাজ্ঞা গান, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতিতে সাধারণের মনে বেকাপ

অবস্থাতেই আর কিছু সাধারণকে বাধ্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, সুতরাং অন্যান্য উপায়ে সাধারণ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চিত্রশালা, মিউজিয়ম, স্কুলটি উদ্বীপক নাট্যশালা, উপদেশ-বক্তৃতার ঘর ইত্যাদি প্রকার স্থানে সাধারণের জ্ঞান-লাভ ও সুনীতি শিক্ষার বহুল সম্ভাবনা আছে, সুতরাং স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যত্নশীল হইয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইলে তাহারা তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া রাখিতে পারেন। এই সকল উপায়ে লোকের মধ্যে জ্ঞান ও সুনীতির জ্যোতি

সুনীতি ও ধর্ম্য ভাব অঙ্কিত করে, উপদেশে, বক্তৃতায় তাহার শত ভাগের এক ভাগ হয় কি না সন্দেহ। সেই জন্যই আমাদের এই দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত, দীন হীন-অবনতির অবস্থাতেও, আমরা গর্ব করিয়া বলিতে পারি, ভারতবর্ষীয়দিগের মত নীতি-পরায়ণ জাতি আর পৃথিবীতে নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশের অসংখ্য চাষাভূষাদের তুলনার ইয়োরপের সভ্য চাষাভূষারা আকাশ হইতে পাতালের মত ডফাৎ।

পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত সকল প্রথায় অনাদর হইয়া দেশের নীতি শিক্ষার মূলে যে দারুণ কুঠারঘাত করিতেছে এই বড় দুঃখ। ভাং নং।

বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, আর তাহাতে স্বজাতির প্রতি অহুসারগ বুস্তির তেজোবুদ্ধি ও উন্নতি সাধন হয়, কিন্তু আর কতকগুলি উপায় আছে, তাহাতে ঐক বুস্তির উন্নতি সাধন হউক আর নাই হউক অবাবহিত ভাবে উহার তেজোবুদ্ধি হইতে পারে। যে সকল ক্রিয়ায় সাধারণে যোগ দিতে পারে, যে সকল ক্রিয়ায় কি ভদ্র কি অভদ্র, কি ধনী কি দরিদ্র, জাতির অন্তর্গত সকলেই জাতির মঙ্গলের নিমিত্ত, সাধারণের হিতের নিমিত্ত, একমনে কার্য্য করিতে পারে, সে সকল ক্রিয়া দ্বারা স্বজাতির প্রতি অহুসারগ বুস্তির তেজোবুদ্ধি হওয়ার ভূয়সী সম্ভাবনা; যেমন, সমুদয় জাতির প্রধান প্রধান কার্য্য নিরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যে ব্যবস্থাপক সভা থাকে, কিম্বা পথঘাট পরিষ্কার রাখা, সাধারণ গম্যস্থলে আলোক দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যেক সহরে যে সভা থাকে, এই দুইপ্রকার সভার সভ্য নিরীক্ষাচন ক্রিয়ায় সাধারণে যোগ দিতে পারিলে, এই সকল সভার সভাগণ সাধারণ কর্তৃক নিরীক্ষাচিত হইতে পারিলে, আর এই নিরীক্ষাচনক্রিয়া স্মৃতি ও স্মৃতির সহিত সম্পাদিত হইলে সাধারণের মনে এই জ্ঞান জন্মিতে পারে যে তাহারা সকলেই একজাতির অন্তর্গত, সুতরাং কতকগুলি ঘটনায় সেই জাতির অন্তর্গত সকলেরই দুরবস্থা হইতে পারে আর কতকগুলি ঘটনায় সকলেরই সুখ সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে। যে সকল অহুসারগ জাতির মধ্যে এইরূপ শিক্ষা হইতে পারে সে সকল অহু-

সারগ জাতীর জীবনে বহুশূল করিতে স্বজাতি হিতৈষী ব্যক্তিমাজেই উদ্বোধনী হওয়া উচিত। ভাষা, ধর্ম্ম, ও আচার ব্যবহার এই তিন বিষয়ে একতা স্বজাতির প্রতি অহুসারগ বুস্তিকে অলঙ্কিত ভাবে পরিপুষ্ট করে। ভাষাগত একতায় লোকের মধ্যে কতদূর নৈকট্যাব সংস্থাপিত হয় তাহা আমরা স্বদেশে থাকিয়া বুঝিতে পারি না; যখন বিদেশে থাকা যায়, বিদেশীয় ভাষায় সদানন্দলা কথ্য কহিতে হয়, তখন নিজের ভাষায় কথা কহিবার একজন লোকও যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে মনে যেরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয় আর সে লোকটিকে যে কতদূর আপনার বলিয়া মনে হয় তাহা যে সেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে সেই বুঝিয়াছে। ধর্ম্মগত ও আচার ব্যবহার গত একতায় লোকের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সংস্থাপিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। যাহা কিছু দুই ব্যক্তির মধ্যে বিতর্কতার পরিমাণ হ্রাস করে, যাহা কিছু দুই ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে— তাহাই তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতির কারণ হয়। ধর্ম্মের বশে লোকে জীবনের অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, লোকে যে ধর্ম্ম অহুসারে চলে সেধর্ম্মের চিহ্ন তাহাদিগের জীবনের প্রতি কার্য্যে লক্ষিত হয়; সুতরাং ধর্ম্ম এক হইলে জীবনের গতি অনেক বিষয়ে এক হইতে পারে আর তাহাতে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কি কি প্রকারে স্বজাতির প্রতি অহু-

রাগ বৃত্তির প্রকৃতি হইতে পারে তাহা অবগত হওয়াও বৈধ প্রয়োজন, কি কি প্রকারে উক্ত রাগ অধোগতি ও ভেজো-হাস হইতে পারে, তাহা অবগত হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয়, কারণ দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানদ্বারা আমরা আগে থাকিতে দাবধান হইয়া উঠিতে পারি। স্বজাতির প্রতি অহুরাগ বৃত্তির অধোগতি দুইটি প্রধান কারণ এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে (১) স্বার্থপরতা ও (২) অপর শ্রেণী কিসা অপর জাতির প্রতি অনাস্থা। যে জাতির লোকে কেবল নিজের নিজের কার্য্য লইয়াই বাস্তু, নিজের নিজের হিতের চিন্তাতেই মগ্ন, অন্যের স্বখঃখের প্রতি দৃষ্টি করে না—সেজাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অহুরাগ বৃত্তি অতি নিম্নাবস্থায় বর্তমান থাকে। স্বার্থপরতা একটি নিম্ননীয় বৃত্তি ইহা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময়ে অনেকের মনে এই বৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে—অতএব আমাদের সকলেরই এই বৃত্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক; যাহাতে আমরা অন্যের হিতাহিতের প্রতি আস্থাহীন হইয়া না পড়ি, যাহাতে আমাদের নিজের হিতসাধন করিতে যাইয়া আমরা অন্যের হিতের প্রতি অন্ধ না হই, সে বিষয়ে আমরা দিগের সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্তব্য। আবার যে জাতির মধ্যে এক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপর আস্থা করে না, যে জাতির ব্যক্তিগণ স্ব স্ব শ্রেণী লইয়াই ব্যাপৃত, অন্যান্য শ্রেণী স্বার্থেই থাকুক আর হুঃখেই

থাকুক, অন্যান্য শ্রেণী থাকুকই আর নাই বা থাকুক সে বিষয়ের প্রতি দৃকপাত করে না, সেজাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অহুরাগ প্রবল হইতে পারে না, সে জাতির মধ্যে শ্রেণীগত অহুরাগ প্রবল থাকিতে পারে কিন্তু জাতিগত অহুরাগ যে ক্ষীণপ্রভ হইবে সে বিষয়ে মতান্তর হইতে পারে না। আবার যে জাতি অন্যান্য জাতির প্রতি অনাস্থা করে, যে জাতির লোকে অন্যান্য জাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, উন্নতি অবনতি প্রভৃতির প্রতি নিতান্ত উদাসীন, যে জাতির ব্যক্তিগণ কেবল তাহাদিগের নিজের প্রকৃতি, নিজের কার্য্যপদ্ধতি, নিজের আচার ব্যবহারই ভাল মনে করে আর বিদেশীয়দিগের প্রকৃতি, কার্য্যপদ্ধতি, আচার ব্যবহার মন্দ বলিয়া মনে করে, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অহুরাগ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অহুরাগ প্রবল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে অহুরাগ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবে, সে অহুরাগ উর্দ্ধপথে উঠিয়া বিস্তৃতপ্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকৃত ক্ষুণ্ণ লাভ করিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষার কলকল আলোচনা হইতে দেখা যায়, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও মনে করিতে পারেন, যে পাশ্চাত্য শিক্ষার, পাশ্চাত্য সভ্যতার আমাদের কোন বিশেষ উপকার নাই। * কিন্তু এরূপ মত অবলম্বন

* পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কোন উপকার

করিবার পূর্বে আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যবহার করিয়াছি কি অপব্যবহার করিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে যে অংশ আমাদিগের সমাজের উপযোগী সেই সেই অংশই আমাদিগের গ্রহণ করা উচিত, আমাদিগের সমাজ এক প্রকার ঘটনায় গঠিত এক প্রকার ঘটনায় বর্জিত আর ইয়োরোপীয় সমাজ অন্য প্রকার ঘটনায় গঠিত, অন্য প্রকার ঘটনায় বর্জিত—সুতরাং সমগ্র ইয়োরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের সমাজের উপযোগী হইতে পারে না।† মানুষের মনের শক্তি সীমাবদ্ধ। এই সংসারের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করা এক ব্যক্তি বা এক জাতির সাধ্যাতীত, সমুদায় মানব জাতিরও সাধ্যাতীত। সুতরাং আমরা যদি সভ্যতার বাজিতে অ-

নাই তাহা বোধ কেহ মনে করেন না, তবে কি, এই শিক্ষার ফলে যে দেশীয় ভাব, দেশীয় সভ্যতা, দেশীয় রীতি নীতি, সাহিত্য শাস্ত্রাদির প্রতি কতক পরিমাণে বীতরাগ জন্মিতে দেখা যাইতেছে, এই বীতরাগ যে আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতিবন্ধক তাহা বোধ হয় লেখক অস্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না হইত তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণ উপকারীত্বের সম্বন্ধে বোধ করি কাহারো দ্বিধাক্য থাকিত না। ভাং সং।

† যদি ইয়োরোপীয় সভ্যতামুরাগী ব্যক্তিগণ এইটি মনে রাখিয়া কাজ করেন ত দেশের স্বার্থ মঙ্গল হয়। ভাং সং।

নান্য জাতির নিকট পরাস্ত হইতে না চাই তবে অন্যান্য দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য রাজকার্য্য, ব্যক্তিগত ও সমাজগত নীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নুতন নুতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে সেই সকলের সহিত আমাদের পরিচিত থাকা আবশ্যিক ও সে সকল পন্থা ও পদ্ধতি আমাদিগের দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যিক। কি কি প্রকারে স্বজাতির প্রতি অমুরাগ বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে আর কি কি প্রকারে অপকর্ষ ঘটতে পারে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক কিরূপ কাব্য, কিরূপ ব্যবহার স্বজাতির প্রতি অমুরাগের সহিত প্রকৃত সংক্ষেপে সম্মত। অনেক সময়ে লোকে স্বজাতির প্রতি অমুরাগের আশ্রয় লইয়া অনেক কার্য্যে অসৎ প্রবৃত্ত হয় ও অন্যান্য ব্যক্তিদিককে প্রবর্তিত করে; সুতরাং এখন যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে তাহার সুমীমাংসা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ যদি কেহ স্বজাতির প্রতি অমুরাগের বশবর্তী হইয়া ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে পরে সে কার্য্যে ভাল না হইয়া মন্দ হইলেও হইতে পারে। যে কার্য্যে কোন জাতির অন্তর্গত সমুদয় লোকের অর্থ বুদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা সে কার্য্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অমুরাগের অমুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এহলে ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যাহাতে স্থায়ী রূপে দেশের সুখবৃদ্ধি ও দুঃখনিবারণ হয়, সেই দিকেই দেশামুরাগ-

গের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক। কোন কার্যে আপাততঃ লোকের সুখবুদ্ধি বা হুঃখ হ্রাস হইয়া ভবিষ্যতে তাহার বিষময় ফল দেখা দিতে পারে, যেমন নিজে বুদ্ধ না করিয়া বুদ্ধকাথোর নিমিত্ত বিদেশীয়দিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলে লোকে আপাততঃ আনন্দ আশ্লাদে সময় কাটাইতে পারে। কিন্তু এইরূপে পরে তাহারা এরূপ ক্ষীণপ্রাণী হইয়া পড়িবে যে তাহারা নিজের ধন, মান, প্রাণ নিজে রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহাদের বিদেশীয়দিগের পদানত হইতে হইবে। সুতরাং এরূপ কার্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অহুরাগের অহুমোদিত হইতে পারে না। আবার কোন কার্যে কোন সমগ্র জাতি অথবা সে জাতির কোন কোন লোকে আপাততঃ কষ্টলাভ করিয়া পরে উহার ফলস্বরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারে, যেমন, কোন জাতির মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকের অতুল ঐশ্বর্য আছে আর তাহা ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় লোক দরিদ্র, তাহারা বাহা উপার্জন করে তাহা দ্বারা একরূপে তাহাদিগের জীবিকা নির্বাহ হয় কিন্তু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না; এখন উক্ত ধনীব্যক্তির যদি আপনাদিগের কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করে আর দরিদ্র ব্যক্তিরাও কিছু কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে শীঘ্র ঐ জাতির ঐশ্বর্য হওয়ার সম্ভাবনা; আপাততঃ ধনীদিগের অর্থ ব্যয় হইল বটে, আপাততঃ দরি-

দ্রদিগের কষ্ট হইল বটে, কিন্তু পরে জাতির অবস্থা উন্নত হইলে ধনীব্যক্তির তাহাদিগের অর্থ দশগুণে ফিরিয়া পাইবেন, দরিদ্রেরাও পূর্বে যে রূপ সুখের কল্পনাও করে নাই সেইরূপ সুখ ভোগ করিবে। সুতরাং এস্থলে ধনীদিগের অর্থব্যয় আর দরিদ্রদিগের কষ্টভোগ উভয় কার্যই স্বজাতির প্রতি অহুরাগের অহুমোদিত হইবে। জাতির মধ্যে যে কার্যের অহুষ্ঠানে সমগ্র জাতির পরিণামে সুখবুদ্ধি বা হুঃখ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা সে কার্য স্বজাতির প্রতি অহুরাগের সহিত সঙ্গত। কিন্তু কোন কার্যে জাতির সুখবুদ্ধি বা হুঃখ হ্রাস হইবে, কোন কার্যে তাহার বিপরীত হইবে, তাহা আমরা সকল সময় স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, এরূপ পক্ষে কোন কার্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অহুরাগের সহিত সঙ্গত তাহা আমরা কিরূপে স্থির করিব? যদি কোন কার্যের অহুষ্ঠানে জাতির মধ্যে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পায়; সেইরূপ কার্য স্বজাতির প্রতি অহুরাগের সহিত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বলিতে পারেন জাতির মধ্যে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়া আর জাতির মধ্যে প্রকৃত সুখবুদ্ধি বা হুঃখ হ্রাস হওয়া এ দুইটা কথার শেষ অর্থ একই। বাহাতে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে তাহাতেই পরিণামে সুখবুদ্ধি বা হুঃখ হ্রাস হইবে আর বাহা পরিণামে সুখবুদ্ধি বা হুঃখ হ্রাস করিবে তাহাই সুনীতি আনিবে সত্য বটে, কিন্তু কোন কার্যে জাতির মধ্যে প্রকৃত রূপে সুখবুদ্ধি বা হুঃখ

ভ্রাস হইবে ইহা অনেক সময় বলিয়া উঠা কঠিন, অথচ সে কার্যে যে সকল ব্যবহার সুনীতি-আনুকূল বলিয়া আমরা স্বীকার করি সে সকল ব্যবহারের সুপরিণাম হইবে ইহা আমরা বলিতে পারি। এই নিমিত্তই কোন কার্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত সম্ভব কি না ইহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত দুইটি লক্ষণ, (অর্থাৎ যে কার্যে পরিণামে জাতির মধ্যে সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করে) নির্দেশ করা হইয়াছে।

লোকের মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কতদূর প্রবল ইহা কিরূপে নির্ণয় করিতে হইবে? স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কোন জাতির মধ্যে যদি বাস্তবিকই প্রবল থাকে, তবে সে জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সমুদয় জাতির হিতের জন্য তাহাদিগের স্বার্থ-বিসর্জনে দিতে প্রস্তুত থাকিবে আর যে পরিমাণে তাহারা এইরূপ প্রস্তুত থাকিবে তাহাদিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগের শক্তিও সেই পরিমাণের হইবে। যে জাতির দরিদ্রদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র কষ্ট, সহস্র সহস্র অপমান, সহস্র সহস্র পরপদ্য-দাত যন্ত্রণা দেখিয়াও ধনীদিগের হৃদয়ে দয়া ও দুঃখের স্ফূর্তি হয় না, হইলেও তাহা কার্যকর হয় না, যে জাতির মধ্যে লোকে বর্তমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লইয়া ব্যস্ত, ভবিষ্যতে যে পরীভাষ্যকার দুঃখ আসিতে পারে, যে দুঃখের ছায়া বর্তমানেও অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইতেছে, সে দুঃখের বিষয় চিন্তা করে না, সে দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত আগে থাকিতে সচেতন হয় না, সে

জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগের শক্তি অতি অল্পই ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার যে জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে স্বজাতির উপকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, যে জাতির নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সাধারণের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সভা আছে, যে জাতির মধ্যে কোন স্থলে একটু মাত্রও উপদ্রব দেখিলে, একটুমাত্রও অত্যাচার দেখিলে, একটুমাত্রও অরাজকতার চিহ্ন দেখিলে সে স্থলে সমুদয় জাতির দুঃখ পড়ে, সে উপদ্রব সে অত্যাচার, সে অরাজকতা দূর করিবার নিমিত্ত সমুদয় জাতি একমনে একপ্রাণে উদ্যোগ করিতে থাকে সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই অনুরাগ একবার উত্তেজিত হইলে লোকে কিরূপ প্রাণপণে কার্য করিয়া থাকে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা তাহার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ প্রাপ্ত হই। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ অনেক প্রকারে প্রজাদিগের নিকট অবিশ্বাস ও অভক্তির পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পিটিসন্স অব্ রাইট্ নামক আইন বিধিবদ্ধ করিতে সম্মতি দিলেন, এই আইনে এই কথা রহিল যে রাজা আর কখনও পার্লামেন্টের দিনানুসৃত্তিতে রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন না, আর তিনি বিচারালয়ে যথোচিত বিচার না করিয়া কাহাকে কারাবদ্ধ করিবেন না,

আর তিনি প্রজাদিগের ঘরে সৈন্য রাখি-
বেন না, আর তিনি প্রজাদিগকে যুদ্ধের
আইনে দণ্ড দিবেন না। এইরূপ
আইনে সম্মতি দেওয়ার পর হাউস অব
কমনস্‌ তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত
হইল; অর্থ সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু রাজা
তাঁহার আইনানুসারে কার্য্য করিলেন না,
তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বৈচ্ছাচারীই রহি-
লেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গবর্ণ-
মেন্টের বিপক্ষে হাউস অব কমনস্‌ এই
প্রস্তাব করিলেন যে রাজা তাঁহার রাজ-
ত্বের আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত রাজকার্য্যে
যে সকল দোষ করিয়াছেন সে সকল লিপি-
বদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরিত হউক,
আর ইহাও বলা হউক যে তাঁহার কার্য্য-
প্রণালীর প্রতি প্রজারা এখন পর্য্যন্তও
অবিশ্বাস করিতেছে। ১৫৯ জন মেম্বর এই
প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন আর ১৪৮ জন
ইহাতে অসম্মত হইলেন। রাজা ঐ লিপি
প্রাপ্তে ক্রোধ দমন করিয়া হাউস অব
কমনস্‌দের সহিত একমত হইয়া কার্য্য
করিবেন এইরূপ কথা প্রচার করিলেন,
আর সেই উদ্দেশ্যে হাউস অব কমন-
স্‌দের বিশ্বাসভাজন কয়েকজন লোককে
মজ্জী করিলেন। প্রজারা তাঁহাকে এখন
বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল, লোকের
মত তাঁহার স্বপক্ষ হইতে আরম্ভ হ-
ইল—কিন্তু চার্লসের স্বৈচ্ছাচারী ভাব
বাইবার নয়—তিনি মজ্জীদিগকে না ব-

লিয়া এক গুরুতর কার্য্য করিলেন, হাউস
অব কমনস্‌ হইতে বিপক্ষ দলের পাঁচ-
জন নেতা ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং
সৈন্য সহ তথায় গমন করিলেন, সৌভাগ্য
ক্রমে সে পাঁচজন সভ্য তাহার কিছু পূর্ব্ব
হাউস অব কমনস্‌ হইতে চলিয়া গিয়া-
ছিলেন। চার্লস তাঁহাদিগকে ধরিতে পা-
রিলেন না, কিন্তু এখন পার্লামেন্টে তাঁহার
বিরুদ্ধে লোকে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল, রাজ্যের
মধ্যে লোকে তাঁহার স্বৈচ্ছাচার দেখিয়া
দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না।
এখন ইংলণ্ডের লোকে বিধি অনুযায়ী
শাসন-তন্ত্র পাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন
করিতে সচেষ্ট হইল, এরূপ অত্যাচার সহ্য
করিয়া আর তাহারা কতদিন থাকিবে,
তাঁহাদিগের স্বজাতির প্রতি অত্যাচারবৃত্তি
প্রজ্জ্বলিত, আর তাঁহাদিগকে
কে সন্তোষ দেবে। চার্লস উক্ত আইন-বি-
রুদ্ধ গুরুতর কার্য্য করার পর রাত্রে সমুদয়
লণ্ডন শহর অন্ধময় হইল, চারিদিক হইতে
লণ্ডনে লোক আসিতে লাগিল, রাজ্যের
রাজধানীতে থাকা ভার হইয়া উঠিল, রাজা
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, অধিকাংশ
প্রজারা এখন বিধি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র পা-
ইবার নিমিত্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহা
না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আর শান্ত হইল
না।

শ্রীকণী ভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কৈফিয়ৎ ।

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে “পুরাতন কথা” নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাঙ্গদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে “আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিম বাবুর কতকগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এই জন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গ বাবু আনুযায়িক যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাততঃ প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

বঙ্কিম বাবু বলেন “রবীন্দ্র বাবু ‘সত্য’ এবং ‘মিথ্যা’ এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত ‘সত্য’ ‘মিথ্যা’ বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই * * * ‘সত্য’ ‘মিথ্যা’ প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারত-বর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই

অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।”

বঙ্কিম বাবু যে অর্থ মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি। “যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিত্য প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।”

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কি। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মন্ত্রিতে আছে—
সত্যং জয়াৎ, প্রিয়ং জয়াৎ, ন জয়াৎ সত্য-
মপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং জয়াৎ, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ—সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম—এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাই-

তেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া “আরো কিছু”-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশতঃ সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদপরায়ণ বা খ্রীষ্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খ্রীষ্টান হইব—আমার নূতন হিন্দুয়ানীতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি—দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থল-বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—“সত্য” বলিতে প্রতিজ্ঞা “রক্ষা” বুঝায় না। সত্য পালন বা সত্য রক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝায়। কেবলমাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।

তৃতীয়তঃ—বঙ্কিম বাবু “সত্য” শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি “মিথ্যা” শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থল বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে—কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধ করি প্রচলিত নাই—আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ক্রম হইবার আরেকটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন “যদি মিথ্যা কথা কহেন”—সত্য রক্ষা না করাকে “মিথ্যা কথা কহিয়া” কোন পাঠকের মনে

হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন খ্রীষ্টিয়ানই হউন স্বাধীনচিন্তাশীলই হউন আর অনুবাদ-পরায়ণই হউন “মিথ্যা কথা কহা” শুনিলেই তাহার প্রত্যাপ্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাভীরের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখন তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জুন এখানে কোন সত্য গোপন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না, তৎকালে সত্য সত্যই যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোন প্রকার সত্যের ভাণ্ড করেন নাই। আমি যদি বলি যে, “আন্ধি কাল” তোমার বাড়ি যাইব” ও ইতিমধ্যে আন্ধি মরিয়া যাই তবে আমাকে কোন্ নৈয়ামিক মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়—আমি যখন বলিয়াছিলাম তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মাহুষ যখন অতীত বা বর্তমান-সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম অথচ না গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি

বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যা-বাদী। অর্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন, না সে যে তাঁহার ক্ষমতাসঙ্গেও কেবল মাত্র খেয়াল-অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, শুদ্ধর্য ধর্মোক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধাপ্রযুক্ত করিতে পারিলেন না—মহুয়া-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশতঃ এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মহুয়া বুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ বিশ্বাস হইয়াছিল যে তথাপি সমস্ত রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব ন্যাত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে “মিথ্যা কথা কহা” বলা যায় না। যদি কেহ বলেন তবে তিনি মহুয়ার সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনু-রোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একথাকো স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বন্ধিম বাবু এইরূপ বলেন, যে, আমি এখন মহাভারতীয় ক্রোধোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন অগ্রে সেই ক্রোধোক্তি অনু-সন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার স্বার্থ মর্মাগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বন্ধিম বাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় ক্রোধের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্বজনমথ্যাত হ্রোণপর্কস্থ ক্রোধের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অ-

ন্যায় হয় নাই। বিশেষতঃ যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না তখন মহাভারতের যে ক্রোধোক্তি তাহারই সমর্থনের স্বরূপ সঙ্গত হয় অগত্যা তাহাই আমা-দের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য। বিশেষতঃ সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচ-লিত। “হত ইতি গজেন”র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোন অর্থ সহজেই মনে প্রতী-ভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতীভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেই জন্যই বন্ধিম বাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু, এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক।

বন্ধিম বাবু এক স্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যা-কথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আ-মার কোন মতেই বোধ হয় না। কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পা-রিয়া তিনি একটু ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম “লেখক মহাশয় একটি ছন্দ

আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন “প্রথম, ‘কল্পনা’ শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু ‘কল্পনা’ করিয়াছি একথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। ‘পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, ‘কল্পনা’ নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ-গুণ বর্ণনা করিয়াছি।”

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুই জন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্মভ্রষ্ট আরেকজন আচারভ্রষ্ট। ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন—“আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি” ইত্যাদি—কিন্তু আমাকর্তৃক আলোচিত আচারভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখ স্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন—“আর একটি হিন্দুর কথা বলি।” কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখ কালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্বসম্মতভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে একটি কাল্পনিক উদাহরণ গঠিত করা অনেক স্থলেই দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধি-মস্তক আমি এরূপ অনুমান করিয়া থাকি তবে তাহা তরুণবয়সস্থল ও ভ্রম মনে করাই

বঙ্কিম বাবুর ‘নায় উনার হৃদয় মহাদাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষতঃ তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাহার সুদৃশ্যশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখ বলিয়াছেন—“তার পর ‘আদর্শ’ কথাটি সত্য নহে। ‘আদর্শ’ শব্দটা আমার উক্তিভেদে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরাপান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?”

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম “তিনি একটি ‘হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন” ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে—তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। “একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা” ও একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা” উভয়ে অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা—ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শস্থল মনে করি নাই, বঙ্কিম বাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে বঙ্কিম বাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দূষ্য হইয়া গেল তাহা

নহে, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিজেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন চিত্রের প্রতি তিনি, (জাত-স্বরেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিম বাবু একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে-কোন-একটি চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা,—কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিম বাবু যদি মহত্তম আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোন-একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কি ছিল? কিন্তু আদর্শ হিন্দুর দোষগুণ লইয়া আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিম বাবু নিজের মুখে যাহা

বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন—“যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়”—সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন—এত আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিম বাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বাহ্য বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন “প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে” সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কি না জানি না; যদি থাকিত তবে উদাহরণ দিলেই ভাল ছিল আর যদি না থাকিত তবে গোপনে এই বিষয়ক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন “লোকহিত” শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এই জন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জ স্বীকার করিতেছি এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য ধাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালি-গালাজের বড় হুড়াহুড়ি বড় বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিম বাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিম বাবুকে

কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজন ভূলা, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড়! আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে! তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। আমার যে এতদূর আত্মবিশ্মৃতি ঘটয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি কেবল মাত্র অমান্য নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুদ্রদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালি-গালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছো-হাটার ত কথাই নাই আঁষ্টে গন্ধটুকু পর্য্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ-উক্তি। “মেছোহাটা ই-বল আর “প্রার্থনা মন্দির” ই-বল আমি কোথা হইতেও ফরমাস দিয়া কথা আম-দানি করি নাই—আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারি না—হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন।

বন্ধিম বাবু বলিয়াছেন—প্রথম সংখ্যক প্রচার বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্রবাবুর সহিত আমার চার পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই? করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! মূল কথাটার সহিত তাহার কি যোগ? না করিবার অনেক

কারণ থাকিতে পারে। সে সব ঘরের কথা। পাঠকদের বলিবার নহে। বর্তমান লেখকের নানা দোষ থাকিতে পারে। দুর্বল-স্বভাববশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বন্ধিম বাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশতঃ উক্ত কয়েক ছত্রের গুরুত উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোন ব্যক্তির মুখে এসম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে প্রচার আদিবামাত্র কে কোন দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্য ভাল করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে এক-দিন জীঘৃক্স বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দু ধর্ম নামক প্রবন্ধের মর্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অমুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ সকল কথা কেন? আমার সম্বন্ধে আমি যদি কোন অনায়াস কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোন দৃঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই-একটি কথা আছে। বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাব এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তরপ্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্স অমুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্তব্য কার্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই, যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিম বাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণমাত্রই যে অন্যান্য একরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজ-বর্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ক্রমকমেই

এমন মনে করেন যে অন্য কোন মত তাঁহাদের মত-প্রচারের বাধাত করিতেছে, এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোন পক্ষেরই ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভাল, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালিগালাজ করা কোন হিসাবেই ভাল নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিম বাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ নবাবহিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিম বাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের বা “যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের” কোন যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতর রূপে আক্রমণ করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোন অধিকারই নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিমবাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাহার এজলাষের সহিত অথবা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটসমাজের সহিত তাহাদের বিশেষ যোগ আছে তবে

সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোন গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্যাক্ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদিব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদিব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিম বাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিম বাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে

* সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কি যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিম বাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে বঙ্কিম বাবু যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধ তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক কথা নহে। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নব-যুগ-প্রতিষ্ঠা কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল তাঁহাতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথ বাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথাকাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিম বাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের দৃষ্টে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

আদিব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনই তাঁহার দৈর্ঘ্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিম বাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজ বিদেশী-দেবী তরুণ বঙ্গসমাজে যুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং পাশ্চাত্য-লোকে অন্ধ স্বদেশদেবী বঙ্গশূন্যদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ-প্রচলিত কুসংস্কার,বিসর্জন দিয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গেসঙ্গে হিন্দুহৃদয় বিসর্জন দেন নাই—এই জন্য চারিদিক হইতে কক্ষা আসিয়া তাঁহার শিখর আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু কখনও তাঁহার গাভীরা নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদিব্রাহ্মসমাজের অব্যবস্থা সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদিব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অনায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবি-

নয় নিবেদন এই যে আমি সরল ভাবে বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন ।
যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর ।

কোথায় ।

হায়, কোথা যাবে !
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি
পথ কোথা পাবে !
হায়, কোথা যাবে !

এই দেখ ফুটিয়াছে কুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল ।
পুরান' স্মৃতির স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
অতি স্নেহ-ভাবে ।
হায়, কোথা যাবে !

আমরাত সাথে রহিব না,
আমরাত কথা কহিব না,
একটি মুহূর্ত্ত পরে আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে,
হায়, কোথা যাবে !

খেলা ধূল পড়ে না কি মনে !
কত কথা স্নেহের স্মরণে !
স্মৃতি হুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে !
হায়, কোথা যাবে !

মোরা ব'সে কাঁদিব হেথায়,
শুনো চেয়ে ডাকিব তোমায় !
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপ-ধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায় কোথা যাবে !

চির কাল তরে হবে পর,
এ ঘর হবে না তব ঘর ।
যারা তব কোলে যেত তারাও কি পরের মত ।
তাদেরো আর না ফিরে চাবে !
হায় কোথা যাবে !

কঠিন অনন্ত এ ভগৎ
খুঁজে নেন যে যাহার পথ !
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কান মুখ চাবে !
হায়, কোথা যাবে !

হায় কোথা যাবে ।
যাবে যদি, যাও, যাও, অশ্রু বাক্যে নৈবাও,
এই গানে হুখে রেখে যাও !
যে বিজ্ঞান চেয়েছিলে তাই যেন সেথা মিলে
হুদি আঁধি-আরামে ঘুমাও !
যাবে যদি যাও !

ইন্দিরের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা ।

মনের কথা যে মনে মনে চালিত হইতে পারে, কোন একটা অজ্ঞাতশক্তিপ্রভাবে মানুষে যে মানুষের মন জানিতে পারে, একথা আমাদের দেশের কাছে নুতন কথা নহে। আমাদের দেশের জনশ্রুতি, প্রবাদ ইতিহাস, শাস্ত্র সকলই, মানুষের এই আশ্চর্য্য শক্তির অস্তিত্বগান গাহিতেছে, সুতরাং আমাদের দেশের জনসাধারণের যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, ত তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু কেবলি আমাদের দেশে নহে, বিজ্ঞানআলোকপ্রোজ্জ্বলিত, সভ্যতাভিমानी, গর্বিত ইয়োরোপেও এ বিশ্বাসের একেবারে অভাব নাই। হইলে কি হয়, যতক্ষণ এই বিশ্বাস একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইতেছে, ততক্ষণ ইহার মূল্য বড় অল্প, ততক্ষণ ইহাকে কুসংস্কার বলা যাইতে পারে। সেই জন্য বাস্তবপক্ষে এ বিশ্বাসের মূলে কোন সভ্য আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডে মানসিকশক্তি-অনুসন্ধান-সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। মনের কথা মনে মনে চালিত হয় কি না এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া এ সভার সভাগণ যে ফল পাইয়াছেন আজ তাহারই কিছু কিছু লিপ্যবলির নিকটে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

হই বৎসর পূর্বে, ১৮৮২ খ্রীঃবে অব্দে হারি হাউসে এই সভা প্রথম ইংলণ্ডে স্থাপিত

হয়। মনের কথা মনে মনে চালিত হইতে পারে কিনা কেবল এই বিষয়টির অনুসন্ধানই এ সভার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, মনের কথা পাঠ, দিব্য দর্শন, ইচ্ছাশক্তি সঞ্চালন এবং এই শ্রেণীর আরো কয়েকটি বিষয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে রীতিমত পরীক্ষা করাই এ সভার উদ্দেশ্য।

ডাবলিন কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপক ব্যারেট, মানচেষ্টারের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট, ব্রিস্টলের রাজকলেজের অধ্যাপক সেলেশ, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আবিষ্কর্তা ক্রুক্‌শ, অধ্যাপক হেনরি সিড্‌উইক, হাউস অব কমন্সের মেম্বর আর্থার ব্যালফোর ও জন হল্যাণ্ড, প্রভৃতি ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ ও সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এ সভার সভারূপে মানসিক শক্তি অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়া ইহার গুরুত্ব বিশিষ্ট রূপে বর্ধিত করিয়াছেন। অধ্যাপক হেনরি সিড্‌উইকই এ সভার সভাপতি। আমাদের অজ্ঞাত কোন মানসিকশক্তি ইন্দিরের অতীত রূপে কার্য্য করিতে পারে, কিনা, এ বিষয়ে আগে হইতে পক্ষ বিপক্ষ কোন মতই তাঁহারা প্রবর্তনা করিতে চাহেন না, পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্য মিথ্যা ঠিক করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। তবে আজ কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ মানসিক শক্তিসম্বন্ধে একটি যে বদ্ধমূল অ বিশ্বাস দেখা

যায়, তাহা তাঁহাদের মতে প্রশংসনীয় কিম্বা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। এই সভার প্রথম অধিবেশন কালে সভাপতি সিদ্ধউইক তাঁহার একটি বক্তৃতার মধ্যে এই মর্মের কথা বলিয়াছিলেন যে—“যদি বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষীদিগের কথার দশ ভাগের একভাগও সত্য বলিয়া দেখান যায়—তবে এই সকল আশ্চর্য ঘটনার (সে সকল ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে) সভ্যতা সম্বন্ধে এই যে অমূলক অবিশ্বাস তাহা নিতান্তই নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। আমি বলি, অত যোগ্য সাক্ষীগণের এই সব ঘটনায় বিশ্বাস নহেও তবু যে এখনো ইহার সভ্যতার সন্দেহ চলিয়াছে এবং এই সকল প্রশ্ন মীমাংসার জন্য এত লোকের দাক্ষণ ঔৎসুক্য সম্বন্ধে—শিক্ষিত সমাজ যে এই অমূলক অবিশ্বাস লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ইহা একটি ঘোব কলঙ্কের কথা।”

* “That the dispute as to the reality to these marvellous phenomena, —of which it is quite impossible to exaggerate the Scientific importance, if only a tenth part of what has been alleged by generally credible witnesses could be shewn to be true—I say it is a scandal that the dispute as to the reality of these phenomena should still be going on, that so many competent witnesses should have declared their belief in them, that so many others should be profoundly interested in

তাঁহারা চান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণের উপর প্রমাণ চালিয়া যদি পারেন এ অবিশ্বাস ধুইয়া ফেলেন। সিদ্ধউইক বলিতেছেন, “এত দিন হইতে এই অবিশ্বাস বন্ধমূল হইয়া আসিয়াছে এবং ইহার শিকড় এত বহুদিকে প্রসারিত হইয়াছে, যে ইহাকে মারা বড় সহজ নহে। তবে যদি কোন মতে ইহাকে মারিতে পারি ত সে কেবল প্রমাণের রাশির নীচে ইহাকে জীবন্তে শুকাইয়া শুকাইয়া। আমরা কেবল প্রমাণের উপর প্রমাণ সংগ্রহ করিব; পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিব, এবং সেই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত টিক বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দিগ্ধ-মনা বাহিরের লোকের মুখাপেক্ষা করিব না, সেই প্রমাণের আধিক্যের উপর আপনাদের বিশ্বাস গঠিত করিব।” +

তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার পক্ষে ইহাই একমাত্র ও প্রকৃত উপায় সন্দেহ নাই। ইহাতে কৃতকার্য হইলে তবেই মানসিক শক্তির অস্তিত্ব তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবেই ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া বিজ্ঞানের একটি নূতন যুগ আনিতে পারেন, জ্ঞানের একটি

having the question determined, and yet that the educated world as a body, should still be simply in the attitude of incredulity.”

Proceedings of the society for
Psychical Research.

+ Proceedings of the society for
Psychical Research. Vol I. Page 12.
Para 1.

সম্যক নুতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া পুণিবীকে একটি নুতন পথে চালাইতে পারেন।

কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাঁহারা এ সম্বন্ধে কত দূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের দেখিতে হইবে।

মনের কথা চালানাই আমাদের আলোচ্য বিষয়—এ সম্বন্ধে তাঁহারা কিরূপ প্রমাণ পাইলেন এইখানে তাহাই শুধু দেখিব।

মনের কথা সচরাচর আমরা কি উপায়ে জানিতে পারি? প্রথমতঃ কোন ব্যক্তির কথা শুনিয়া, তাহা ছাড়া ইঙ্গিতে, কখনো কখনো বা কোন ব্যক্তির কেবল মাত্র মুখের ভাবেও তাহার মনের কথা জানা যায়। এইরূপে যে কোন প্রকারেই হউক কাহারো মনের কথা জানিতে কোন না কোন ইঙ্গিতের সাহায্য অবশ্য আবশ্যক বলিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত কোন ইঙ্গিতের বিনা সাহায্যে, কেবল মন দিয়া মনের কথা জানিতে পারা যায় কি না, চিন্তার ছাঁচ তুলিয়া লওয়া যায় কি না, তাহাই মাত্র এই সভার সভাগণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মনের কথা চালানার যেরকম দৃষ্টান্তে ইঙ্গিতের কিছু মাত্র সাহায্য আছে বলিয়া বুঝা যায়, যেরকম দৃষ্টান্ত ইহারা বাস্তবিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন না—এমন কি, যদি দুইটি বিশেষ ব্যক্তির ভিতর কেবল মনের কথা চালিত হইতে দেখা যায়, তাহাও তাঁহারা প্রমাণের মধ্যে ধরেন না।

তাঁহারা শুনিতে পান, ডারবিনারে ক্লিয়ারি নামে একজন সম্ভ্রান্ত পাদরির কয়টি বালিকা কন্যা আশ্চর্য্য রূপ মনের

কথা বলিতে পারে, ইহা শুনিয়া তাঁহারা এই বালিকাগণকে লইয়াই সর্ব প্রথমে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইহারা ৫টি ভগিনী, সকলেই স্বস্থ বলিষ্ঠ ও নীরোগ, বয়স সর্ব জোষ্ঠার আঠার—ও সর্ব কনিষ্ঠার ১১ বৎসর মাত্র।

ইহাদের মধ্যে ছোটটি ছাড়া আর সকলেই মনের কথা বলিতে পারিত। নিম্নলিখিত প্রণালীতে এই বালিকাদিগকে পরীক্ষা করা হইত। যে বালিকা মনের কথা বলিবে—তাহাকে অন্য স্থানে পাঠাইয়া তাহার অদৃষ্টান্তে একটি ঘরে কোন একটি কথা কিম্বা কোন জিনিস কেহ মনে করিতেন, তাহার পর বালিকা সে ঘরে আসিয়া, কাহারো পানে না চাহিয়া, একটি কথা না কহিয়া, নত মুখে নিস্তব্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়াইত। এমন কি, কখনো কখনো পরীক্ষার ঘরের মধ্যে সে একেবারে না আসিয়া অন্য লাগাও রুদ্ধ ঘরে থাকিয়া দ্বারের ভিতর হইতে মনের কথা বলিত। তাস ও সংখ্যা লইয়াই বেশার ভাগ একরূপ পরীক্ষা হইয়াছে। এই পরীক্ষার মোট ফল সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

তাসের পরীক্ষায় প্রত্যেক ৬১০ বার দ্বিগুণার মধ্যে ১১৮টি উত্তর, তাহারা একবারেই ঠিক বলিয়াছে, আর ৭৬ উত্তর একবার ভুল বলিবার পর দ্বিতীয় বারে ঠিক বলিয়াছে। এখন ৬১০ এর মধ্যে ১১৮টি ঠিক হইলে গড়ে ০.১৭ মধ্যে এক এই হিসাবে অর্থাৎ কিছু অধিক প্রতি ৫ বারের ভিতর

একবার করিয়া ঠিক বলা হইল। কেবল দৈবক্রমে যদি বালিকাগণের উত্তর ঠিক হইয়া যাইত, তাহা হইলে এরূপ হইত না, দৈবাৎসিকি অর্থাৎ যাহাকে চান্স বলিয়া যায়, তাহার গণনার নিয়ম স্বতন্ত্র, যাহা নিয়ম অনুসারে ৫২ বারের মধ্যে ১ বার ঠিক হইবার কথা।

কেবল এই পদ্ধতিই সামান্য নহে, ইহা হইতে আরো অধিক মাত্রায় একবার বালিকাগণ দিক্‌লাভ করিয়াছিল। একবার উপরি উপরি ২৬০ প্রশ্নের মধ্যে প্রথমবারেই

৬৮টি ঠিক হইয়াছিল, এবং ৩৫টি একবারের পর দ্বিতীয়বারে ঠিক হইয়াছিল, তাহা হইলে এখানে ৩৮২ মধ্যে এক, অর্থাৎ কিছু অধিক তিনবারের মধ্যে এক বার করিয়া ঠিক হইতেছে, চান্স ধরিলে যাহা কখনই হইতে পারে না।

ইহা ছাড়া নামের পরীক্ষাতেও বালিকাগণ তাহাদের ক্ষমতার কিরূপ আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা দিয়া বুঝা যাইবে।

মনে করা হইয়াছে

উত্তর

উইলিয়ম ষ্টব্‌স্

সোফিয়া শ

টিমথি টেলর

আইজ্যাক হারডিং

অ্যালবার্ট মেলগ্রোব,

টম থম,

সিনড্রেলা,

চেটার,

পাইপ,

কর্ক,

কর্কস্,

টংগ্

‘উইলিয়ম ষ্টব্‌স্,’

“সোফিয়া শ,”

{ (প্রথম বারে) (দ্বিতীয় বারে)
‘টমটেলর’—‘টিমথিটেলর,’

“আইজ্যাক হারডিং”

{ (প্র) (বি)
“অ্যালবার্ট সিনগ্রোর”—“অ্যালবার্টগ্রোবার,”

“টম থম,”

“সিনড্রেলা,”

{ (প্র) (বি)
“ম্যানচেটার”—“চেটার”

{ (প্র) (বি) (তৃতীয়া)
“প্লেট”—“পেপার,”—“পাইপ,”

“কর্ক”

“কর্কস্,”

{ (প্র) (বি)
“কারার আয়রণস্”—“পোকার”

• টংগ্, কারার-আয়রণ ও পোকার এই কয়টি কিরূপ কাছাকাছি ধরণের স্তিমিত পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন।

এই ভালিকায়, যে যে স্থলে উত্তরগুলি পূর্ণ ঠিক হয় নাই, সেখানেও তাহা আসলের কত কাছাকাছি হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, প্রকটর বলিতেছেন,

"It appears to me that the failures in these and other cases yet to be cited are as important a part of the evidence in favour of mind reading and mind ruling, as the successes."

মর্ম্ম এই, "আমার মনে হয় যে যে স্থলে উত্তর ঠিক হইয়াছে সেখানেও যেমন, সেখানে

ঠিক হয় নাই সেখানেও তেমন মনের কথা পাঠের পক্ষ সমর্থন হইতেছে।

কিরূপ করিয়া তাহারা মনের কথা ধরিতে পারে—জিজ্ঞাসার উত্তরে বালিকারা বলিয়াছিল, প্রথমেই কাছাকাছি এক রকমের দুই তিনটা কথা, কিম্বা জিনিস তাহাদের মনে আসে, তাহার মধ্যে আবার যেটা তাহারা মনের চক্ষে সর্কাপেক্ষা স্পষ্ট দেখিতে পায়, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেইটা বাছিয়া লইয়া তাহারা বলে।

ক্রমশঃ

আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন ঋগিগণ বেদ উপবেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং যেরূপে বেদ বিভাগ এবং তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে চরণ বাহেবাহা উক্ত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

চরণ বাহমতে "ঋগ্বেদস্য উপবেদঃ আয়ুর্বেদঃ," অথর্ববেদস্য শত্ৰুশাস্ত্রাধিবাদঃ।" (১) অর্থাৎ আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ এবং অশ্বশাস্ত্র অথর্ববেদের উপবেদ।

(১) শত্ৰুশাস্ত্রম্, আয়ুর্বেদ শব্দে ব্রূতব্য।

পৃথিবীতে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে ঋগ্বেদই সর্কাপেক্ষা প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে সময়ে নৃপতিগণ আয়ুর্বেদের উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করিতেন। (২) জল যে বহরোগনাশক ঔষধ এবং জলে যে বিবিধ ঔষধ উৎপন্ন হয় তাহাও সে সময়ে ভারতবাসীগণ জানিতেন। (৩) সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত না

(২) শত্ৰুশাস্ত্রম্, অথর্ববেদে সশত্ৰুশাস্ত্রম্ গভীরী সূক্তভিষ্টে অশ্ব * * (ঋগ্বেদে ইত্যাদি অনেক আভাস পাওয়া যায়।

(৩) "অপ্ সত্ত্বত্ব মৃতমপ্, ভেদজমপামৃত

হইলেও ঋগ্বেদের পূর্ব সময় হইতেই যে ভারতে আয়ুর্বেদের সূত্রপাত হইয়া ছিল, এতদ্বারা তাহার সম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ধনুস্তরি সূত্রতকে বলিয়াছেন :

ইহখল্লায়ুর্বেদো নাম যত্পাণ্ডমথর্কবেদস্যাহ
পাটদ্যব

প্রজাঃ, শ্লোক শত সহস্র মধ্যায় সহস্রক
কৃতবান্ স্যস্তুঃ।

ততোহল্লায়ুর্ষ্টমল্ল মেধন্তুকাবলোকানরাণাং
ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান্”

(সূত্রত ১ম অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রহ্মা অথর্কবেদের উপাঙ্গরূপে, সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করেন। অনন্তর মানবগণের অল্লায়ু ও অল্লমেধা দেখিয়া আটভাগে বিভক্ত করিয়া পুনরায় সংক্ষেপে আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করেন।

চরক সংহিতায়ও আয়ুর্বেদকে অথর্কবেদের অন্তর্কর্ত্তী বলা হইয়াছে :— * * *

পরবর্ত্তী ভাবমিশ্র প্রভৃতিও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন :— * * *

বাহলা ভয়ে আমরা সংস্কৃত শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

সৌনক মুনি কৃত “চরক ব্যূহ” গ্রন্থানুসারে আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ আবার

প্রশস্তয়ে।” এবং “অপমুমে গোমোহব্রবীদন্ত
বিশ্বানি ভেবজাঃ। অগ্নিক বিশ্বলন্ত য মাশ্চ
বিশ্বভেবজাঃ। (৫: ৫:৫) দোমরসও তখন
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত, বধা “গয়কানো
অমিহা বহুবিন্ পুষ্টিবর্ধনঃ ১৪ অ, ৯১ সূঃ।

সূত্রত চরক প্রভৃতির মতে উহা অথর্কবেদের উপাঙ্গ সূত্রায় এ উভয় মতের কোনটী সত্য? আমাদের মতে এ উভয় মতেই সত্য নিহিত আছে। কারণ ঋক যজু সাম এই তিন বেদের কোন কোন অংশ সংগ্রহ করিয়া অথর্ক নামক ঋষি অথর্কবেদ প্রণয়ন করেন। আয়ুর্বেদ প্রথমতঃ ঋগ্বেদেরই অন্তর্কর্ত্তী ছিল। অনন্তর অথর্ক ঋষি বেদত্রয় হইতে অনান্য অংশ সংগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ হইতে আয়ুর্বেদ ও অথর্কবেদ সংগ্রহ করিয়াছেন। সূত্রায় আয়ুর্বেদকে ঋগ্বেদ বা অথর্কবেদ ইহার যে কোন গ্রন্থের বেদের অন্তর্গত বা উপবেদ বলিলে দোষ হয় না। ঋগ্বেদে বা অথর্কবেদে যে মূল আয়ুর্বেদ ছিল তাহা বহুশতাব্দী যাবৎ লোপ পাইয়াছে। সে মূল আয়ুর্বেদ, চরক সূত্রত প্রভৃতি মুনিগণও দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। আত্রেয় ধনুস্তরি অগ্নিবেশ হারীত কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ সেই মূল গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্বক তাহাতে স্বীয় স্বীয় অভিমত গুরুপদেশ প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া যে যে সংস্থিত প্রণয়ন করেন তাহাই বর্ত্তমান সময়ে মূল গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

আয়ুর্বেদীয় কণাদ সংহিতা প্রণেতা মহর্ষি কণাদের মতে আয়ুর্বেদ কোনও বেদের উপবেদ নহে। আয়ুর্বেদই এক স্বতন্ত্র বেদ তিনি আয়ুর্বেদকে পঞ্চমবেদ বলিয়াছেন; বধা :—

যদভেভাঃ পঞ্চ সংখ্যা গতেভ্যো,
বেদ জাতা ঋক যজু সাম ভেদাঃ।

আয়ুর্বেদোহথর্কবেদশ্চ তদ্বিস্তাং শস্ত্রো”
আয়ুর্বেদঃ পঞ্চমো বৈদ্যাকাথ্যো বেত্তা ক-

শ্চিত্তস্য নাস্তে মহেশাং ।

তস্মাদ্ভাতাধ্যেত তস্মাৎ তুরাযাট, তস্মাজ্জ
জ্ঞাত্বা বক্তুঃ সর্হামিশাস্ত্রং ।

(কণাদ সংহিতা)

অর্থাৎ যাঁহার পাঁচ মুখ হইতে ষক্, যজু এবং সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে সেই শিবই আয়ুর্বেদ এবং অথর্কবেদ বর্তমান ছিল। বৈদ্যাকাথ্য আয়ুর্বেদই পঞ্চমবেদ ; মহেশ ভিন্ন তাহা আর কেহই জানিতেন না। শিবের নিকট ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র ইহা অধ্যয়ন করেন। সেই ইন্দের নিকট অবগত হইয়াই আমি এই আয়ুর্বেদ প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইতেছি।

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণেও আয়ুর্বেদকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে ; যথা:—

“ঋগ্ যজুঃ সমাথর্কাকাথ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্
প্রজ্ঞাপতিঃ ।

বিচিন্ত্য তেযামর্থং চৈচরায়ুর্বেদং চকারসঃ ।

কৃত্বাতু পঞ্চমং বেদং ভাক্তরায় দদৌবিভুঃ ॥

(ব্রহ্ম বৈ: পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ১৬শ অধ্যায়)

প্রস্থান ভেদ প্রণেতা দণ্ডী মধুসূদন সরস্বতী বলেন :—

“আয়ুর্বেদো ধর্ম্মর্কেদো গান্ধর্ববেদোহর্থ
শাস্ত্রক্ষেতি চচার উপবেদাঃ ।”

বিক্রপুর্নাণের প্রথমস্কন্ধের উপসংহার স্থলের চীকার তদ্বীকাকার রত্নগর্ভ ভট্টাচার্য্য ও বলিয়াছেন ‘উপবেদা আয়ুর্বেদাদয়ঃ’

“আয়ুর্বেদ উপবেদ নঃ স্ততঃসবেদঃ”

এ বিষয়ে স্কেন্দ্রন নানা মুনির নামা যত সেই

রূপ আয়ুর্বেদের প্রচারক প্রভৃতি লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(ক) মহর্ষি কনাদের মতে ; শিবই আয়ুর্বেদের আদি গুরু ; শিবের নিকট ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র এবং ইন্দের নিকট কণাদ ইহা শিক্ষা করেন।

(খ) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে, ব্রহ্মাই আদি গুরু তাঁহার নিকট সূর্য্য এবং সূর্য্যের নিকট ধন্বন্তরি, অশ্বিনী কুমারদয়, নকুল, সহদেব, চাবণ, জনক, বুধ, প্রভৃতি ষোল জন শিষ্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন।

(গ) ধন্বন্তরির মতে ব্রহ্মার নিকট দক্ষ-প্রজাপতি তাঁহার নিকট অশ্বিনী কুমারদয়, তাঁহাদিগের নিকট ইন্দ্র এবং ইন্দের নিকট ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। তথাহি:—

ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতিরধিজগে,
তস্মাদশ্বিনাবশ্বিত্যামিঙ্গ, ইন্দ্রাদহং মর্গদ্বিহ
প্রদেয় মর্ষিভ্যাঃ প্রজাহিতহেতোঃ ।

(স্বশ্রুত, ১ম অধ্যায়)

(ঘ) হরিবংশ মতে—ধন্বন্তরি, ভরদ্বাজ মুনির নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন।

“কাশীরাজো মহারাজঃ সর্বরোগ প্রণাশনঃ ।
আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাংপ্রাপ্য——”

(ঙ) চরকের মতে—ব্রহ্মা হইতে দক্ষ-প্রজাপতি, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার দয়, তাঁহাদিগ হইতে ইন্দ্র, ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ হইতে আত্রেয়াদি মুনিগণ, এবং আত্রেয়ের নিকট অগ্নিবেশ হারীত প্রভৃতি ছয়জন মুনি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন।

“ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তং আয়ুর্বেদং প্রজা-
পতিঃ ।

অপ্রাহ নিপিলেনাদারশ্বিনৌত পুনস্ততঃ ॥

অস্থিত্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদেহি কে-
বলং
ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজ স্তম্ভাচ্ছক মুশাগমৎ।

তত্ম প্রোবাচ ভগবান্ আয়ুর্বেদং শতক্রতুঃ।

ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাচ্ছগৃহস্তঃ প্রজাহিতঃ।

অথ মৈত্রী পরঃ পুণ্যমায়ুর্বেদং পুনর্কল্পঃ।

শিষ্যোভোদন্তবান্ বড়ভ্যঃ সর্ষভূতাহু কম্পয়া

অগ্নিবৈশাচ ভেলশ্চ জ্ঞত্ব কর্ণঃ পরাশরঃ

হারীতঃ ক্যারপাশিচ অগৃহস্তমুর্নেক্ষচঃ।

চরক, সুঃস্থান ১ম অধ্যায়ঃ।

(আত্রেয় মুনির অপর নামই পুনর্কল্প)

(চ) হারীত সংহিতার প্রতি সংস্কার কর্তা
বলিয়াছেন—

আমৌষদ্ ব্রহ্মণা প্রোক্তঃ ইন্দ্রেণ তদনন্তরং।

ধ্বস্তরিত্তদাপ্রোক্তং অগ্নিনৌ যমবাস্তবনা। (৭)

(হারীত, শারীরস্থানের উপসংহার)

(ছ) বাভটের মতে, ব্রহ্মার নিকট দক্ষ,

দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমার দ্বয়, তাহাদের

নিকট ইন্দ্র, তাহার নিকট আত্রেয় প্রভৃতি

মুনিগণ এবং তাহাদিগের নিকট অগ্নিবৈশ

প্রভৃতি আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন—যথাঃ—

“ব্রহ্মা সৃষ্টায়ুষো বেদং প্রজাপতি মজিগ্রহৎ।

সোহশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষঃ সোহত্রি পুত্রাদি-

কামুনীন।

তেহগ্নিবৈশাদিকান্তেতু পৃথক্ তজ্জাণি তে-

থিরে।

(বাভট)

বাহুল্য ভয়ে আরও অনেক প্রমাণ উ-

দ্ধৃত করিলাম না। এক্ষণ দেখা যাইতেছে,
উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের একটীর সহিত অন্য-
টীর কিছু না কিছু অনৈক্য আছেই, এবং
কোনটীর সহিত বিষম মতভেদও রহি-
য়াছে। তবে ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত চরক
ও সুশ্রুতে বেশ ঐক্য আছে। বাগ্ভট
ইন্দ্রের শিষ্য লইয়া ও হরিবংশে ধ্বস্তরির
শুক্র লইয়া কিছু গোল যোগ দেখা যায়।
যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সুশ্রুত ও চরকের
মতই অধিক প্রামাণ্য।

মহর্ষি কণাদের মতে, আয়ুর্বেদ প্রথ-
মতঃ এক মাত্র রুদ্রেই বর্তমান ছিল তাঁহার
নিকট উহা ব্রহ্মা অধ্যয়ন করেন। একথাটী
আপাততঃ নূতন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তব-
বিক নূতন নহে। কেননা স্মৃতি পুরাণ
প্রভৃতি মতে রুদ্রই স্রষ্টি তত্ত্ব প্রভৃতি যাব-
তীয় শাস্ত্রের একমাত্র আধার, (৪) তাহার
নিকট প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মা ঐ সমস্ত প্রচার
করেন। ঋষিদের অনেক স্থলে, স্বাস্থ্য ও
বলবীৰ্য্যাদি লাভের জন্য গৃহসমদ প্রভৃতি
বেদ ঋষিগণ রুদ্রকে প্রার্থনা করিয়াছেন;
তাঁহার রুদ্রকেই ভিষগ্দিগের মধ্যে সর্ষ-
শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। রুদ্র প্রদত্ত ঔষ-
ধাদিই অধিক স্বাস্থ্যকর ও বলপ্রদ বলিয়া
যে ঋষিদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঋষিগণ তা-
হারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ কল-
প্রদ ও সর্ষরোগ নাশক পারদের অপর নাম

(৪) মহাভারত, শান্তি পর্ক ২৮৫ অধ্যায়,
অমুশাসন পর্ক ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ে এ
সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

“কল্পভেদ” বা “কল্প”। কথিত আছে রস-
(পারদ) সংযুক্ত ঔষধ গুলির অধিকাংশই
রুদ্র কর্তৃক আবিষ্কৃত। রুদ্রভাবিত তন্ত্র
সমূহ হইতেই এই সমস্ত ঔষধ সংগৃহীত
হইয়াছে। এই নিমিত্তই “রসেন্দ্রসার সং-
গ্রহ” প্রভৃতি রস গ্রন্থের প্রণেতাগণ রুদ্রকেই
একমাত্র আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে তাঁহাকে
প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। রুদ্রই
বৈদ্যানার নামে চিরকাল সকলের নিকট

পরিচিত। বহুবিধ তৈল স্তব্ধ রুদ্রভা-
ষিত বা বৈদ্যানাথ-ভাবিত বলিয়া প্রশং-
সিত। (৫)

এখন দেবলোকের বিষয় যাউক, নর-
লোকে কোন কোন মহাত্মা কতক সর্ব
প্রথমে আয়ুর্কর্ষেদের প্রচার আরম্ভ হয় তৎ
সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

হুগলির ইমাম বাড়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছবি।

দেড় শত বৎসরেরও পূর্বেরকার কথা
হইতেছে; এই সময় একদিন দ্বিপ্রহরের
পর নৌকা হইতে হুগলি নগরের দিকে
চাহিয়া দেখ—সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্য দেখিতে
পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ গ্রহরীর ন্যায়
শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি সারি
বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাইতেছেন,
প্রাসাদের আশে পাশে, ছোট বড় গাছ
গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে
সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানি-
কটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশি
জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি
করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত
হইয়া লতায় জটাছুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া
পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত
খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা

যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত,
আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট
ছোট পাতার কুটির গুলি উইচিবির মত প্র-
কাশ পাইতেছে। কোথায় বা এক একটি বড়
বড় বট অশ্বখের রাশি রাশি পাতার ফাঁক
দিয়া এক একটি পুরাতন ইষ্টক নির্মিত
বাড়ী অতি দীন হীন ভাবে উঁকি মারি
তেছে, আবার কোথায় বা উপকূল ঘোড়া
এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টা-
লিকা, চারিদিকের ছোট কুটিরদিগকে
অবজ্ঞা করিয়া, আশে পাশের বড় বড় গাছ
গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া
সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর

(৫) মহাভারতের অনেক স্থানেও ক-
ল্পকে “বৈদ্য প্রেষ্ঠ” ও ধনুস্তরি বলা হই-
য়াছে।

এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি ছোট ক্ষুদ্র মুখ ফুটিয়া তাহার মধুররূপে উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া কি সূঁচের কাজ করিতেছিলেন, কাজ করিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুঝি ক্রান্ত হইল, আনত মৃণাল কণ্ঠ, বুঝি বাণিত হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। যুবতীর হৃদয়েও সহস্র চিন্তা আসিয়া সেই মেঘ পুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধিল। মুন্না চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্তের মধ্যে আশঙ্ক হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, ‘বুঝি-স্বাচ্ছন্দ করীম, চোখ হাড়’ করীমও হাসিয়া চোখ ছাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি ছবি ধরিয়া বলিল, ‘কেমন বল দেখি?’ আমেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইহার হিন্দু নহেন। করীম ও মুন্না দুজনে ভাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহে। মুন্নার মাতার হই বিবাহ। প্রথম

বিবাহের সন্তান করীম। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। করীম ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকিত, উহার দুইজনে প্রায় সম-বয়স্ক বলিলেই হয়, দু-এক বছরের মাত্র ছোট বড়, সেই জন্য উহাদের মধ্যে মানোর বাবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহার পরস্পরকে ভাল বাসে। করীম দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক, উন্নত ললাট পূর্ণায়তন নয়ন উদার ভাব জ্যোতি পূর্ণ; নবীন শাশ্ব-শোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অথচ সে তেজ, অহুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত; প্রশস্ত বক্ষ শালী স্তূর্ণঠন বলিষ্ঠ দেহ, যেন শত শত দুর্বলের আশ্রয় নিকেতন। তাহার সেই হেহাহুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্বল মুন্না কে সে যেন অতি যত্নে রক্ষা করিতে চায়।

করীমের হাত হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না করীমের দিকে ফিরিয়া বলিল, তাহার পর হাসিয়া অর্ধ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল ‘এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?’ করীম বলিল, ‘কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া যায় না?’ মুন্না। ‘এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাহা জানতুম না’

করীম। ‘কেন ভাল জিনিসের কি আর দর আছে? এ পর্যন্ত তাতো দেখলুম না’

মুন্না। ‘তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর,’ করীম। ‘তুই ভাই আদরটা একবার

দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,”

মুন্না হাসিয়া বলিল, “তোমার বেলায় ভাল জমিষের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা।

করিম। “বুঝিলিনে, এই হচ্ছে সেয়ানা লোকের কাজ,” মুন্না ছোট মাথাটি নাড়িয়া, অলক গুচ্ছগুলি ছুলাইয়া একটু মৃদু মধুব হাসিয়া বলিল—“তুমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নির্কোষ বুঝি,”

করিম। “নিদেন জগতের অর্ধেক লোক মেয়ে জাত। তাইত তোর কাছে আগে বিক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল।” বলিতে বলিতে করিম একটু হাসিল, সে হাসিতে তাহার শুভ ললাটে ঈষৎ বিক্রপময় ভাবের যেন রেখা পড়িল, মুন্না বলিল, “মরে যাই আর কি, উনি যা পেলেন কুড়িয়ে, তাই আমি পরয়া দিয়া কিনিব। এক কানাকড়িও না।” করীম ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তুমি কানাকড়িও দিলে না, কিন্তু এর মধ্যে এর হাজার টাকা দাম উঠিয়াছে।” মুন্না হাসিয়া বলিল, “এমন নির্কোষ কেনে?”

করিম। “সে নির্কোষ আর কেউ না, আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি মহম্মদ মসীম।”

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এ কথা শুনিলেই মুন্নার কণ্ঠ হইবে, তাহা করিম জানিত, কিন্তু সেই সজাবিত কণ্ঠ-

টাকে উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার ভাবে করিম কথা পাড়িয়াছিল। মুন্নাকে বিষয় দেয়া করিম তামাসা রাখিয়া মুহূর্তমণ্ডে গম্ভীর হইয়া বলিল, “আমি ঠাট্টা করিতেছি না, সত্যি হাজার টাকার বিনিময়ে মসীম এই ছবিখানি পাইয়াছেন, একপ করিয়া আর কদিন চলিবে, অমন অতুল ঐশ্বর্য্য সবত যায় যাব, তুমি কি একটি কথা কহিবে না।”

চোখের জল চোখে রুদ্ধ করিয়া মুন্না বলিলেন, “ভাই যাহার ধন তিনি এরূপ করিলে আমার কি হাত? আমি কে।” সে কথায় সে যেরে করীমের সুন্দর মুখ কাল হইয়া পড়িল, ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া বাহিব হইল—একটু পরে একটুখানি কাঁঠ হাসি হাসিয়া করীম বলিল “ধন কার? তোমার কি সব ধন নহে? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে। সকল স্ত্রীলোকে যদি তোমার মত হইত তবেত দেখিতেছি জগতের ধারা উলটাইয়া যাইত।”

মুন্নার পিতার ঐশ্বর্য্যেই মুন্নার স্বামী। ধনী শত্ৰু, কিন্তু মুন্না কখনো ও ভাবে তাগ দেখে নাই। এক মুহূর্তের জন্যও তাহার মনে হইত না, সে উহা তাহার স্বামীর নহে মুন্নার নিজের ধন। জাতার কথায় মুন্না আশ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্রুদ্ধ হইল, মুন্না বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। করীম তাহা বুঝিতে পারিল—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায় বলিল “কিন্তু যার ধন সে যদি পাগল হইয়া

যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি কেহ নিরস্ত করিবে না”—

তাহা সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কতবার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার ক্রক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে? অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে চাহে তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই। যে হৃদয় একবার প্রেম প্রতিদান পাইবার পর সে প্রেমে সন্দেহ করিয়াছে, যে সন্দেহে যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, যে নিরাশায় এখনো আশা, ভরসা দিতেছে, সে হৃদয়ে অভিমান আছে।—কিন্তু মুন্না অভিমান করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে সন্দেহে বিশ্বাসের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক ছুঁপে, অধিক কটে। মুন্না তাহার সমুখে ষাতনায় অশ্রু নদা বহাইয়াছে, তিনি একবার ক্রক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের ক্রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপনাই হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মাহ্বা হইয়া মুমূর্ষু বাস্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের চক্ষে অনুগ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। সেই অবধি ষাতনার তাত্র অনলে হৃদয় ভস্মীভূত করিলে হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস গভীর নিশীথের বায়ু ভরসে মুন্না মিশাইতে থাকে, উন্মত্ত হৃৎকের অশ্রু লংঘী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁ-

ধিয়া শুকাইয়া ফেলে, তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ভিতর স্বামীকে যে কথা কহিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে, তবে ইহাতে সঙ্কোচ কিদের? মুন্না ভীকু নিস্তেজ হৃদয় পাষণ্ড বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এক কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপনার সর্বনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আন্তে আন্তে ক্রমিক বলিল “তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব”—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কথায় উঠিয়া গেল, করীম বাহিরে চলিয়া গেল। রোজ যেরূপ কাজ কন্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ায় তেমনি হাসি মুখে তাহার কাছে বসিয়া, তাহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট খাট নিখান কে জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুক্কায়িত অশ্রু জল দেখিতে পাইলেন—

তিনিও অবাক্ত ভাবে হৃদয়ে একটি খাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নিকোঁধ সরলা বাল্য ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অস্থখ ধরিতে পারেন নাহি,—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাওয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পুরপারে গাছের রাশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, রাশি রাশি খন্দোতিক্য মালা সেই আঁধার কায়ে জলিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গা স্বপ্ন মোহে মহান আকাশ, অগণ্য নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে পরিয়া, আফ্লা-দের হাসি হানিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহিরের স্বপ্ন জগতে নৃত্য বলিয়া ছড়াইয়া যুম ঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিক্য মুন্না সেই নিশীপের যুমন্ত আঁধারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত চীৎকার থামিয়া পড়িল, মণীদের বন্ধু বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নৌচে মসলদের উপর বিশ্রাম শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভরে-সন্তোচে পা ফেলিয়া একখান ক্ষৌণ ছায়ার মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। মহম্মদ মসীম অর্জু নিমালিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন “কে এ ও—” মুন্নার মুখে কথা ফুটিল না, সেই যে দুপুর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া কিরূপে, কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত ব্যর্থ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া পেল—আনটা যেন কেমন কাঁপিতে লা-

গিল, চোখে কেমন জল আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না,—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন যথৌ ন তথৌ হইয়া মুন্না পায়ান মূর্ত্তির নায় দাঁড়াইয়া রহিল। মসীম এদিকে নেশার ঘোরে সপ্তম সর্গে উঠিয়াছেন, তাহার মনে হইল সর্গের একটি ছরি বৃষ্টি তাহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে,—কি বলিয়া সন্তুষ্ট করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগলেন, বৃষ্টি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অশ্লষ্ট কথায় যাঁহা বলিলেন তাহার অর্থ এই “অগ্নি সর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলোক কর।”

মুন্না বুকিল স্বামী ভুল বুঝিয়াছেন মুন্নার তখন কথা ফুটিল—বীরে ধীরে বলিল, “আমি মুন্না”—মসীমের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দারুণ পতন হইল,—অর্জুচোখ খুলিয়া তাহার নিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, “মুন্না—তুমি—ক্যা—আন” মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় করীম গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সমুখে একবার, দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেল, অল্প মসীম তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। করীমকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ প্রাণে যেন বলের সঞ্চার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বাঁচিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে হৃদয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, “একটি কথা আছে,” মসীম আগেকার ভাষায় বলিলেন, “কথা ডের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেমন”

সকালে মসীম যতকথা শুনিবেন তা মুন্সাই জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাঁহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহারপর অপরাহ্ণে উঠিয়া বেশবিন্যাস করিয়া আবার আসরে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্সাই ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি নুহুতের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তারপর মসীমের নিকট আসিয়া একপান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এতসঙ্কল্প সকল টুটিয়া পড়িল। মসীম কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, ঢুলুঢুলু নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অমনি জগতের যত রাগ তাহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া আগেকার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন, “কোথায় পাইলে?” মুন্সাই ধীরে ধীরে বলিল, “করিম হু এক টাকায় কিনিয়া আনিয়াছেন।” মসীম আরো জলিয়া গেলেন, তাহার হাজার টাকার ছবির মত ছবি যে করীম হু এক টাকায় কিনিবে ইহা কক্ষনোই হইতে পারে না, তাহার দেয়ালের ছবি যে কেউ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিদ্যুৎমাত্র তাহার সংশয় রহিল না, স্থালত সূত্রাবা নানারূপ ভাষায় সকালবেলায় সেই চোরের ঘাড় ভাঙিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্সাই সাহস করিয়া অনেক বার বলিল যে “না তাহার ঘরের ছবি কেউ লয় নাই, সে যেখানকার সেই খানেই আছে, চাহিয়া দেখিলেই সে ছবি দেখিতে পাইবেন।” কিন্তু মুন্সাইর কথা কে শোনে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দেয়ালে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই খানেই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাকী চোরা ককর্শ শ্রমে বলিলেন কুয়ি

কে? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও,—চাই না, দেখতে চাই না।”

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্সাইর কথা ফোটে নাই, একটু কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্সাই থামিয়া পড়িতেছিল, স্বামীর নির্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রক্তউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্সাইর মুখ ফুটিল, মুন্সাইর সাহস বাড়িল, মুন্সাই ধীরে ধীরে বলিল “আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভুকে আজ মিনতি করিয়া, চরণ করিয়া যে কথা বলিতে আসিয়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না। একবার সংসার পানে চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন আপনার সর্বনাশ কিরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাহি না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরহে আমি সুখী হইব না। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিদ্যুৎ ভাবি না কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।” এক নিশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্সাই প্রান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তব্ধ ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতাল অবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা মুন্সাই ভাবিল না, হয়ত বা মুন্সাই জীবনে স্বামীর সজ্ঞান অবস্থা দেখে নাই, স্তব্ধতা সজ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির কিরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুঝিত না, সেইজন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু মসীমের মাথায় অভঙলা কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—“ধন আর রত্ন ধন আর রত্ন” কিছু পরে ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, আইসব। ধন রত্ন যদি খোয়াইলাম অতরত্ন তোমার গারে কেন? তোমার এই জন্ম-

ভার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।”

অবসর স্মিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে সৰল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট গভীর স্বরে বলিল “স্বামিন্ এলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? আমার মত দুগ্ধিনীর আবার রাজ সজ্জা কি? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে, বাহির সাজাইয়া কি হইবে? আমি নিজের স্নেহের জন্য অলঙ্কার পরিনা, যদি ইহা দেখিতেও তোমার কষ্ট হয়, সে কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—নাথ। তোমার কষ্ট ঘুচাইতে আমি হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ

হইবে? ইহা তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বুধা পড়িয়া আছে,”

মুগ্ধা বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি স্বামীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। মণীমের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া গেল, তিনি অবাধ হইয়া সেই তেজস্বিনী মূর্তি পানে চাহিয়া রহিলেন, মুগ্ধা যখন চলিয়া গেল, তাহার মনে একটি অশান্তির ভাব, আদিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয় মহম্মদ মণীমের সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিবম দুৰ্বলতা, তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া আর দুধক বোতল মদ দ্বানিতে বলিলেন।

ক্রমশঃ।

ভারা।

আমাদের বেশ একখানি বাড়ি ছিল, বাড়িটির চারধারে কেমন বেশ বাগানে ঘেরা একটি সরু ঝিল, ঝিল ঝিল কোরে ব'য়ে যেত, আমরা সন্ধ্যাবেলা তার ধারে ধারে বৃষ্টি ফুল তুলতে যেতুম, আমাদের বেশ একখানি বাড়ি ছিল।

একদিন বৃষ্টি তুলতে তুলতে বরু বোলে “দাদা, কবে বাবা আসবেন?” আবার অনামনক হয়ে প্রজাপতি ধরবার তরে ছুটে গেল, আমার আর উত্তর দেওয়া হ'ল না, কেন না বরুর কাছে বাবার কথা তুলতে আমার ইচ্ছা ছিল না, বরু ছোট মেয়ে, বয়েস হবে সাত বৎসর, আমাদের প্রাণে সকলি নয়, কচি প্রাণে আঘাত দিতে বড় ব্যথা লাগে, তাতে সে কিছুই বুঝত না, আপনায় মনে ফুল তুলতো, আপনায় মনে কতকি গান গাইত, আর কখনো কখনো আকাশের পানে এমনি ভাবে চেয়ে

থাকত, যেন সেখা তার কত সাধের বাড়ি ঘরদোর ফেলে এসেছে। চাঁদ দেখতে যেমন সকল মেয়ে ভালবাসে, সে তেমন বাসত না, সে কেবল তারাদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত, তারাদের ভিতর যেন তার কতকি লুকান আছে। যে দিন পূর্ণিমা, আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় আকাশ ভুবে গেছে, আর বুর বুর কোরে মধুর বাতাস বইছে, বরু সে দিন চপ্ কোরে একেলা জানালাটির ধারে বোসে থাকত, কারো সঙ্গে কথা বার্তা কইত না, কেবল যখন ‘মা’ তাকে আদর কোরে চুমো খেতে চাইতেন, তখন সে ছুটি হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে এমনি ভাবে চুমো খেত, যেন তার আর চুমো খাওয়া হুরোবে না, সে যেন আর মায়ের কোল থেকে উঠতে চায় না, সে যেন মায়ের বুকের উপর মাথা রেখে চিরকাল স্বপ্ন দেখতে চায়। মা যখন তাকে

জিজ্ঞাসা কোরতেন, ‘বন্ধু, তুই’ বুকি আগে তারা ছিল, তাই তোর চোখ দুটিতে এখনো তারার আলো ভাসছে?’ সে তখনই ছোট নাথাটি ছলিয়ে, কচিমুখখানিতে হা-

সতে হাসতে বলত “হ্যাঁ মা আমি তারা ছিলাম”। সেই দিন হইতে বন্ধুকে আমরা তারা বলিয়া ডাকি।

শ্রী:—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

মিশর যাত্রী-বাস্তালী । শ্রীশ্যাম-লাল মিত্র পণ্ডিত । বাঙ্গালা ভাষায় একপ ধরণের পুস্তক এই নূতন । লেখক মিশর যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া সাহা দেখিয়াছেন তাহাই অতি ছদ্মগ্রাসীকরণে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে । শ্বেতপুরুষদিগের যুদ্ধ চাভুগা মিশরবাসীদিগের রীতি নীতি, আতিথেয়া-প্রভৃতি সকলি একপ সুন্দর রূপে লেখা, সে যিনি ইহা পড়িবেন, তিনি যেন তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে । বিশেষ লেখকের প্রতি এবং অন্যান্য ভারতবাসীর প্রতি একজন কাপ্তেনের সেই নিদারুণ অত্যাচার পড়িতে পড়িতে শরীরে কাঁটা দিয়া উঠে, গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া আসে । আমাদের অহু-রোধ প্রত্যেক বাঙ্গালী ই এ পুস্তকখানি এক-বার পাঠ করিয়া দেখুন, তাহা ছাড়া ইয়ো-রপীয়গণও যাহাতে ইহা পড়িতে পারেন সেই জন্য ইংরাজিতেও এখানির অহুবাদ বিশেষ প্রার্থনীয় । শ্বেতপুরুষগণ তাঁহাদের সাধুতা তাঁহাদের সম্বাহার একবার প্রত্যক্ষ করুন । আনকল্ টমশ্ ক্যাবিন পড়িয়া ইয়োরপে যেমন ছলছল পড়িয়া গিয়াছিল, ক্রীত দাস-দিগের কষ্ট যেমন তাঁহারা ছদ্মগ্রাস করি-য়াছিলেন, এই বইখানির অহুবাদ পড়িয়া ততদূর না হউক, ভারতবাসীদিগের দুর্দশা যদি তাঁহারা কতকটাও অহুভব করেন তবে একটি মহা ফললাভ হইবে ।

বিবিধ সন্দর্ভ । শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় প্রণীত । নগেন্দ্র বাবু সময়ে সময়ে বঙ্গদর্শন আর্ষদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রি-কার যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এ পুস্তকে তাহাই একত্রে সংগৃহীত হইয়াছে । নগেন্দ্র বাবু একজন সুলেখক, ইনি বঙ্গ সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, ইহার পর আবার তাহার এই প্রবন্ধগুলি পূর্ক হইতেই সা-ধারণে সমাদৃত হইয়াছে, এখন নূতন করিয়া ইহার প্রশংসা গান করা বাহলা মাত্র ।

গৃহ মুকুর । প্রথম ভাগ শ্রীযুক্ত রামদয়াল সেন গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ।

এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি । ইহাতে যে সমস্ত সদুপদেশ আছে, তাহা পালন করিলে প্রত্যেক ঘরেই উপকার হইতে পারে । ‘সন্তান পালন’ ও ‘হৃতিকা গৃহ’ সম্বন্ধে ইনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সারগর্ভ ।

চারুনীতি-পাঠ । শ্রীযুক্ত কালী-কৃষ্ণ দত্ত প্রণীত । এ পুস্তকখানি রচনার প্রথা অতি সুন্দর । ইহা কেবল মাত্র নীরস উপদেশ বাক্যে পূর্ণ নহে । গ্রন্থকর্তা উত্তম উত্তম গল্পদ্বারা বেশ নীতি শিক্ষা দিয়াছেন । ইহাতে কেবল মাত্র বালকের কেন অনেক বৃদ্ধেরও উপকার হইতে পারে ।

সেন রাজগণ ।

বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের ৫৩ বৎসর
অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে)
আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গোড়ের রাজা-
সনে দেখিতে পাই। মিত্র মহোদয় যে
কেন অশোকচন্দ্রকে “অশোকদেন” লিখিয়া-
ছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন
সিংহাসনে অরোহণ করেন। শেষ গোড়ে-
খরের নাম যে প্রকৃত পক্ষে “লক্ষণ” ছিল
তাহা তাঁহার সমসাময়িক “ব্রাহ্মণসর্বস্ব” ও
‘সমুজ্জিকর্ণামৃত’ গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাই-
তেছে। পশ্চিমদেশে লক্ষ্মণকে সাধারণতঃ
“লক্ষ্মণ” বা “লক্ষ্মণ” বলা হইয়া থাকে।
মুসলমান ইতিহাসলেখক মিনহাজ তদন্ত-
সারে তাঁহাকে “লক্ষ্মণিয়া” লিখিয়া গিয়া-
ছেন। ইহাতে কোনরূপ নামবৈচিত্র্য বা
গুণগোল দৃষ্ট হয় না।

মিনহাজই সিরাজ তাঁহার তবকত-ই-নে-
ছারি গ্রন্থে রাজা “লক্ষ্মণিয়ার” জন্ম সম্বন্ধে
এক আশ্চর্য্য গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন।
এই রাজা যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার
পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার
পূর্বে তাঁহার মাতার উদরোপরি রাজমুকুট
স্থাপন করা হইয়াছিল। রাজমাতার
প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। জ্যোতির্বিদ
গণনা করিয়া বলিলেন, “এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ
হইলে নিত্যকাল দুর্ভাগ্য হইবে এবং এই

শিশু কখন রাজমুকুট লাভ করিবে না।
আর যদি দুই ঘণ্টা পরে এই সন্তান জন্ম-
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অশীতি
বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজদণ্ডধারণ করি-
বেন।” এই সংবাদ রাজমাতার কর্ণগোচর
হইলে, তিনি বলিলেন, “যতক্ষণ শুভলয়
উপস্থিত না হয়, সেই অবধি আমার পাদ-
দ্বয় উপর দিকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া
রাখ।” তদন্তসারে কার্য্য হইল। দুই ঘণ্টা
অন্তর রাজমাতার বন্ধনমোচন করা হইলে
লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার মাতা সেই
মুহূর্ত্তে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অ-
মাতাগণ লক্ষ্মণকে সিংহাসনে স্থাপন করি-
লেন। ৩৯

মিনহাজের লিখিত গল্প হইতে এইমাত্র
গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মণ তাঁহার
পিতৃবিয়োগের পর ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের
পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি
শৈশবাবধি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া
দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

মিনহাজের লিখিত বাক্য লক্ষ্মণের
মজী হলামুখ পোষণ করিতেছেন। তিনি
“ব্রাহ্মণসর্বস্ব” গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন
বাৎস গোত্র (অর্থাৎ ছান্দড়ের বংশে ৪০)

৩৯ Raverty's Tabakat-i-Nasiri.
page 554.

৪০ হলামুখ। (ভারতী, সপ্তমভাগ ৩৩২
পৃষ্ঠা) দেখ।

ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন । তিনি গোমেশ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । উজ্জ্বলা নাম্নী রমণী তাঁহার গৃহিণী ছিলেন । সেই গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের ঈশান, হলায়ুধ ও পশুপতি নামে তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করেন । ঈশান ব্রাহ্মণ-দিগের “আঙ্গিক পদ্ধতি,” হলায়ুধ, “ব্রাহ্মণ সর্কস্ব” ও পশুপতি “পশুপতি পদ্ধতি” নামক শাস্ত্রাদিকৃত প্রাপ্ত করেন । ত্রীমল্লক্সেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্য রাজপণ্ডিত-যৌবনারম্ভে মন্ত্রী পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন । ৪১

মিনহাজ বলেন যে “লক্ষণিয়া” ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই কথা সম্পূর্ণ সত্য কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না । কিন্তু এই রাজা যে ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল গোঁড়ের রাজ্যসনে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই । কারণ যদি আমরা বিবেচনা করি যে, হলায়ুধ ২০ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজপণ্ডিত ও ২৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত মন্ত্রী ও তাহার পর হইতে ধর্ম্মাধিকারে অভিষিক্ত ছিলেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই আমাদের কাছে স্বীকার করিতে হইবে যে,

৪১ বালোখ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাং-
শুবিষ্মোজ্জল-

চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহন্তরূপদং দত্তা নবে
যৌবনে ।

যশ্মৈ যৌবনশেষযোগামখিলক্ষ্মাপাল-

নারায়ণঃ

ত্রীমল্লক্সেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং
দদৌ ॥

ব্রাহ্মণসর্কস্ব, (১। ১২) ।

হলায়ুধের আশ্রয়দাতা লক্ষণসেন দেব ৪০ বৎসরেরও অধিককাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ গয়ার প্রান্তরলিপির খোদিত অক্ষের পর বৎসর অর্থাৎ ১০৮২ শকাব্দে (১১৬০ খৃষ্টাব্দে) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ইহা স্বীকার করিয়া, এক্ষণে আমাদের দেখা উচিত, তিনি কতকাল স্রীবিত ছিলেন ।

মুসলমানগণ বলেন লক্ষণসেন দেব নদীয়ায় বাস করিতেন । ইহার পূর্বে আর কোন গ্রন্থে কিম্বা শাসনপত্রাদিতে নদীয়া বা নবদ্বীপের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । অতএবই বোধ হয় এই রাজা লক্ষণিয়াই নবদ্বীপে রাজপাঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । যাহা হউক মুসলমান সেনাপতি খিলজি দেশোদ্ভব বখতিয়ার পুত্র মহম্মদ প্রকাশ্য “মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি” বিহারজয়ের দুই বৎসর অন্তে নদীয়া নগরী অধিকার করেন ।

মিনহাজ লিখিয়াছেন, মহম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বিহার অধিকৃত হইলে তাঁহার যশঃসৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । ক্রমে তাহা লক্ষণসেন দেবেরও কর্ণগোচর হইল । বহুসংখ্যক জ্যোতির্বিদ, জ্ঞানী, ও অমাত্য রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই দেশ তুরকীদিগের হস্তগত হইবে, এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হওয়ায় সময় উপস্থিত । তুরকীয়েরা বিহার অধিকার করিয়াছে, পর বৎসর তাহারা অবশ্যই এ দেশে উপস্থিত হইবে । অতএব আমা-

দের বিবেচনায় মহারাজ এ প্রদেশবাসী সকলকে লইয়া অনাক্রম্য গমন করিয়া তুর-কীয়দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষার উপায় করুন।”

রাজা জিজ্ঞাসা করি যে ব্যক্তি এই দেশ অধিকার করিবে? গ্রন্থে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি না? তাহারা বলিলেন, আছে, তিনি আছা। পৃষ্ঠ ৪২। রাজা বলিলেন, তবে ইহার তথ্যসম্বন্ধে অন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করা হউক। মহম্মদ বখতিয়ারকে দর্শন করবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। সেই দূত প্রত্যাবর্তন করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের প্রকাশিত বাক্যের সত্যতা পোষণ করিল।

মিনহাজের গ্রন্থে হইতে যে গল্পটি সং-কলিত হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে যে কি সত্য লুক্কায়িত আছে আমরা তাহার উদ্ধার করিতে পারিলাম না। পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সর্বনাশ জন্য কতপ্রকার জপুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। লক্ষ্যের কয়েক জন সভাসদকে যে মহম্মদ বখতিয়ার হস্তগত না করিয়াছিলেন ইহাই বা কি রূপে বলা যা-ইতে পারে। নচেৎ তুরক কর্তৃক গোড়া-ধিকার ও কদাকাের আদর্শস্থল মহম্মদ বখতিয়ারের রূপ বর্ণনা কেন হিন্দু শাস্ত্রে সন্নিবেশিত থাকা প্রকাশিত হইবে। যদি এ বৃত্তান্তটী যথার্থই গল্প না হয় তাহা হইলে

মহম্মদ বখতিয়ার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। দিরাজদৌলার পতনের ইতিহাস কি আমাদের কাছে একপ অসম্মান করিতে প্রণোদিত করে না?

এই ঘটনার পর নদীয়ার অধিকাংশ অধিবাসী সমতট-বন্দ ও কামরূপ প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রায় লক্ষণ-সেন দেব অটলভাবে স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান পূর্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিহার বিজয়ের দুই বৎসর পর মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বৃহৎ একদল সৈন্য সহ আসিয়া নদীয়া অধিকার করিলেন। মহম্মদ বখতিয়ার যখন নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করেন, তখন কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বরোহী তাঁহার সঙ্গে ছিল। নগরবাসীদিগের নিকট তাঁহারা অশ্ববিক্রেতা বলিয়া পরিচিত হইয়া-ছিলেন। সেই ছদ্মবেশী উনবিংশ অশ্ব-বিক্রেতা রাজনিকেতন মধ্যে প্রবেশ ক-রিয়া হঠাৎ দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিল। এই আকস্মিক ঘটনা দ্বারা একটা ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এদিকে মহম্মদ বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া তাঁ-হার সহিত মিলিত হইয়া, অপ্রস্তুত নদীয়া-বাসীদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। রাজা লক্ষণ সন্তোষুরে আহ্বার করিতে বসিয়া-ছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া কোনরূপ সহায় অবলম্বন করিতে পারিলেন না, অগত্যা সপরিবার খিড়কি দ্বারে বাহির হইয়া “সমতট বন্দে” প্রস্থান করিলেন।”

আমরা মিনহাজের গ্রন্থ হইতে এই বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিলাম। মিনহাজ লিখিয়াছেন, যৈ, মহম্মদ বখতিয়ার এইরূপ দ্রুত-গমন করিয়াছিলেন ৪৩ যে, কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বরোহী মাত্র তাঁহার সহিত গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ দ্রুত গমনে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎ আসিতেছিল। তাঁহার অন্যান্য সৈন্যগণ যেনগর আক্রমণকালে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, ইহা জাতীয়-পক্ষপাতী মিনহাজও স্বীকার করিয়াছেন। ৪৪ মহম্মদ বখতিয়ারের নদীয়া অধিকারের প্রায় ৪০ বৎসর অন্তে মিনহাজ গোঁড়ে আসিয়া ছুই একজন বুদ্ধ মুসলমানের নিকট যে সকল গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন ২০ বৎসর অন্তে তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ও স্বীয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা গল্পনবিশ বুদ্ধদিগের দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া মিনহাজের কণ্ঠগোচর হইয়াছিল। এই অতিরঞ্জিত ঘটনার তিনি আবার কবিত্বশক্তি ফলাইয়া স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। মার্সমান-প্রমুখ ইংরাজ লেখকগণ রঙ্গের উপর রং চড়াইয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে কেবল সপ্তদশ অশ্বরোহী সাহায্যে মহম্মদ বখতিয়ার বাঙ্গালা বিজয় করিয়াছেন। ৪৫ মার্সমানের ন্যায়

একজন সদাশয় ধর্মপ্রচারক যে কিরূপে এই মিথ্যাবাক্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যেজাতীয় ইতিহাসলেখক হিন্দুকুলভূষণদিগের পর-লোকগমনকে রকে গমন” বলিয়া লিখিতে কিছু ঠিত হন নাই মিনহাজ সেইরূপ লেখক। তিনি যেজাতীয় গৌরব জন্য তাঁহার দ্রুত গল্পের উপর আরও কিছু রং চড়াইতে দ্রুত করেন নাই, ইহা বোধ হয় কোন সদাশয় পাঠকই স্বীকার করিবেন না। মিনহাজের লেখা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। “সপ্তদশ অশ্বরোহী কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়” ইহা নবনির্মিত মিথ্যা বাক্য।

তাঁহার বৃহৎ সেনাদল নগরপ্রান্তে এক বন মধ্যে লুঙ্ঘিত রাখিয়া স্বয়ং সপ্তদশ অশ্বরোহীর সহিত নগরে প্রবেশ করেন। তিনি দ্রুত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং নদীয়াবাসীগণ তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। পরে তিনি যখন রাজবাটীর মধ্যে (আহারের সময়ে) প্রবেশ করিয়া দ্বাররক্ষকে আক্রমণ করিলেন অমনি তাহার সৈন্যগণও বন মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল। (Stewart's History of Bengal. page. 44.) ট্যুয়ার্ট কোন্ গ্রন্থ হইতে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। বাহা হউক মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ অধিকার নিশ্চয়ই একটা চক্রান্তমূলক কার্য। বাঙ্গালার অদৃষ্ট চিরকাল চক্রবৎ পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে।

৪৩ Raverty's Tabakat-i-Nasiri page. 557.

৪৪ ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠা দেখ।

৪৫ মেলর ট্যুয়ার্ট তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন “মহম্মদ বখতিয়ার

তৎপরে মিনহাজ বলেন রায় লক্ষণিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক “সমতট বঙ্গ” গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কালকবলিত হন। তাঁহার উত্তর পুরুষ অদ্যাপি (৬৫৮ হিঃ অঃ ১২৬০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন।

প্রাচীনকালে বঙ্গের রাজধানী সমতট নামে পরিচিত ছিল। ইহা আমরা পাঁচ-বৎসর পূর্বে বিশেষ রূপে দর্শাইয়াছি। ৪৬ মিনহাজের গ্রন্থে সমতট নামটি বিকৃতভাবে লিখিত আছে। হস্তলিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে কোনটীতে “সনকট, কোনটীতে সন-নট” অন্য কোনটীতে “সনকনট” দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মিনহাজের কিম্বা তাঁহার পরবর্তী নকলনবিসদিগের ভ্রম। যেস্থলে মিনহাজ বারংবার “সনকট” শব্দের সহিত “বঙ্গ” যোগ করিয়াছেন, সেস্থলে তিনি যে সমতট বঙ্গকে লক্ষ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তবকত-ই-নাছরি গ্রন্থের অনুবাদক মেজর রেবার্টি সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ৪৭

পরবর্তী মুসলমান ইতিহাস “তবকত-আকবরি” ও “তাজকরত উল মূলুকে” লিখিত আছে যে, রাজা লক্ষণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক জগন্নাথতীর্থে

গমন করিয়াছিলেন। ৪৮ বুদ্ধ মিনহাজের বাক্য এস্থলে সমধিক প্রামাণ্য। মিনহাজ ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, মহম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপ জয় করিয়া রাঢ় দেশের উত্তরভাগ ও বরেন্দ্রের পশ্চিম ভাগ মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। “বঙ্গদেশ লক্ষণের অধিকারে ছিল, তাহার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি সেই দেশ শাসন করিতেছেন।”

এক্ষণে দেখা যাউক লক্ষণসেন দেব কোন বৎসর নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক পূর্ব-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেজর রেবার্টি সাহেবের মতে ১১১৬ শকাব্দে (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হইয়াছিল। ৪৯ বুদ্ধমান সাহেবের মতে ১১২৫ শকাব্দে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানেরা নবদ্বীপ অধিকার করেন। ৫০ টোমাস সাহেবের মতে ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃঃ অঃ ৬০০ হিঃ অব্দে) লক্ষণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করেন। ৫১ কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১১২৯ শকাব্দে (১২০৭ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ

৪৮-মেজর ষ্টুয়ার্ট এই মত অবলম্বন করেন। তদনুসারে পরবর্তী ইংরাজ ও বাদ্শালি লেখকগণ ষ্টুয়ার্টের প্রদর্শিত ভ্রম-মার্গে বিচরণ করিতেছেন।

৪৯ Tabakat-i Nasire, and J. A. S. B. XLIV. part 1 page 277.

৫০ J. A. S. B. XLII part 1. pp. 206, 211.

৫১ Joarnal. Royal As. Society (1873) Vol. VI. p. 340. and J. A. S. B. XLII part 1. p. 343.

৪৬ ভারতী চতুর্থ ভাগ। ১২১—১২৫ পৃষ্ঠা

৪৭ The part meant by our author more probably refers to a province of Eastern Bang. Raverty's Tabakat-i Nasiri p. 557.

বখতিয়ার নদীয়া অধিকার করিয়াছিলেন । ৫২ আমরা বুকমান কিষা রেবার্টি সাহেবের মতান্ত্রমোদন করিতে পারি না । কারণ ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে ৯৯ লক্ষ-গাব্দে) সত্বিকিকর্ণামৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । ৫৩ এই সময়ে লক্ষ্মণসেন দেব নদীয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন । লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক গ্রন্থকারের লেখা অবশ্য পরবর্তী লেখকদিগের লিখিত বাক্য অপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থ রচনার পর লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন । আমরা বিজ্ঞের টোমাস সাহেবের মতে অন্ত্রমোদন করিয়া বলিতেছি যে ১১২৭ শকাব্দের (১২০৫ খৃঃ

অঃ) শেষভাগে মহম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্বক পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন । তিনি জীবিতকালে ঐ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন । ১১৮২ শকাব্দে (১২৬৭ খৃঃ অঃ) যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখনও তিনি লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেনের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন । তৎপরে “তওয়ারিখে ফিরোজ শাহি” লেখক জইয়ে বারনি লিখিয়াছেন ১২০২ শকাব্দে (১২৮০ খৃঃ অঃ) সুলতান বলবন যখন বিজৌহী শাসনকর্তা মুঘলুদ্দিন তুঘলের পশ্চাৎকাবিত হইয়া জাঙ্গনগর (জিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় বদেখর খুজ রায় সম্রাটকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন, স্তত্রাং দেখা যাইতেছে লক্ষ্মণসেন দেবের নদীয়া হইতে পলায়নের ৭৫ বৎসর পরে ও বঙ্গদেশ তাহার উত্তর পুরুষের হস্তে ছিল ।

সামসুদ্দিন আবুল মোজ্জফর ফিরোজ শাহের শাসনকালে ১২২৯—১২৪৯ শকাব্দের (৭০২—৭২২ হিজরী অক্ষ, ১৩০৭ হইতে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন এক সময়ে বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের হস্তে আইসে । কারণ টোমাস সাহেবের প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাবে দৃষ্ট হইতেছে যে ফিরোজ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা স্বর্ণগ্রানের টাকসালে মুদ্রিত হইয়াছিল । ৫৪ অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রায় এক শত বৎসর কাল লক্ষ্মণ সেন দেবের উত্তর পুরুষগণ প্রকৃত বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের ধারাবাহিক নাম আমরা কোন স্থা-

৫২ Asiatic Researches. Vol. 1X. page. 203.

৫৩ শাকে সপ্তবিংশতাদিক শতোপেত দশশতে শরদাঃ ।

শ্রীমল্ললক্ষ্মণসেন ক্ষিত্তিপস্যাহি রসরসচাক্ষে ॥

মিত্র মহোদয় তাহার Notice of Sanskrit MSS-এর তৃতীয় খণ্ডে এই কবিতাটী বিকৃত অবস্থায় উদ্ধৃত করিয়াছেন (pp. 134. 149.) তাহাতে দুইটি ভয়ানক ভুল আছে । প্রথমতঃ কবিতার উভয় পদের অর্থ পরস্পর বিপরীত হইয়া গিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ ছন্দো ভঙ্গ দোষ হইয়াছে । কারণ এই কবিতা আখ্যাছন্দে লিখিত । এই ছন্দের নিয়মামুসারে প্রথমার্কে ত্রিশ মাত্রা, দ্বিতীয়ার্কে ২৭ মাত্রা হইবে । মিত্রমহোদয়ের প্রকাশিত কবিতার দ্বিতীয় অর্কে ২৫ এর অধিক মাত্রা নাই । যাহা হউক ভক্তিভাজন মিত্র মহোদয় ইহার জন্য দায়ী নহেন । তিনি যে হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থলেখকই তাহার দায়ী ।

৫৪ Thomas. Initial coinage of Bengal. (J. A. S. B. Vol. XXXVI. part 1. p. 45.)

নেই প্রাপ্ত হইতেছি না। মিত্র মহোদয়
অনুমানের সাহায্যে তিন জন রাজার নাম
উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

বল্লালসেন (দ্বিতীয়)

সুসেন—

সুরসেন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা কেবল
অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত
নহি।

তাম্র ও প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া
আমরা সেনরাজগণের নিম্ন-লিখিত বংশ-
শাবলী প্রস্তুত করিলাম। সমস্ত খোদিত
লিপিতে এই রাজবংশকে চন্দ্রবংশজ বলা
হইয়াছে। উহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন
তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।
বিশেষত মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে
এই রাজবংশ শ্রেষ্ঠ কুল হইতে উদ্ভূত।
ভারতের রাজ্যবর্গ ইহাদিগকে বিশেষ-
সম্মান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বলা
যাইতে পারে যে, সেনরাজগণ চন্দ্র-
বংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। কোন বর্ণ-
সঙ্কর জাতি হইতে এই রাজবংশের উৎ-
পত্তি হইয়া থাকিলে তাঁহারা কখনই এইরূপ
সম্মান লাভ করিতে পারিতেন না ও খো-
দিত লিপিতেও “চন্দ্রবংশ” “ঐশ্বিনাথবংশ”
ও “গোমবংশ” বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত
না। কারণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যের এরূপ
পরিচয়ের অধিকার নাই। মিত্র মহোদয়
পদ্মপুরাণোক্তগত ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থ হইতে
একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে
রাজা সুসেনকে গোমবংশীয় লেখা হই-
য়াছে। ৫৫

প্রাচীনকালে ভারতে অশ্বঠ নামে এক-

দেশ ছিল। বিষ্ণুপুরাণের, দ্বিতীয়াংশ, ভূ-
তীয় অধ্যায়ে ভারতের সংক্ষিপ্ত ভূগোল
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে
“অশ্বঠা” শব্দ দ্বারা সেই নামখান্ড দেশ-
বাসাদিগকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ৫৬
মহাভারত, সভাপর্বে নকুলের দ্বিধিক্রয়
উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি “দ-
শার্ণ, শিবি, দ্বিগর্ত, অশ্বঠ, মালব, পঞ্চ
কর্পট, মধ্যমক, বাটধান” কে পরাজয় ক-
রিয়াছিলেন। ৫৭ বরাহমিহির “মেক
লাশ্বঠা” এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ
করিয়াছেন। তদ্বারা ও অন্যান্য গ্রন্থ সমা-
লোচনা করিয়া বোধ হয়, বিদ্যা পর্বতের
অপর পার্শ্বে, নন্দ্যাদামিধ্যে অশ্বঠ দেশ
অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ পূর্বে
সেই দেশে বাস করিতেন। এ জন্যই
তাঁহারা লোকসমাজে অশ্বঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া
পরিচিত হন। পরে যখন কেবল কাম্বুজ
জাতিই সমস্ত ভারতে অশ্বঠ আখ্যা দ্বারা
পরিচিত হইলেন, তখন সেনরাজগণও
কাম্বুজ জাতীয় বলিয়া খ্যাত হন। বিগত
শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যজাতীয় রাজ-
বংশ উপবীত গ্রহণ পূর্বক বৈদ্য ও অশ্বঠ
অভিন্ন অবধারণ করিয়া আপনাকে বল্লাল
বংশজ পরিচয় দিতে লাগিলেন সেই সময়
হইতে সেন রাজগণ আমাদের দেশে বৈদ্য
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৫
খৃষ্টাব্দে মিত্র মহোদয় সর্বপ্রথম খোদিত
লিপি অবলম্বন করিয়া সেনরাজগণকে
চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় অবধারণ করেন। তম-
সাচ্ছন্দ্য ওয়ায় নিপতিত সভ্য উদ্ধার করিয়া-
ছিলেন বলিয়া অদ্য আমরা তাঁহাকে কৃত-
জ্ঞতার কুম্মাজলি প্রদান করিতেছি। এই

৫৫ তদ্বিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ককামকল-
প্রদে।

ভবেজ্ঞান্য সুসেনাধ্যঃ গোমবংশসমুদ্ভবঃ ॥

Indo-Aryan. Vol. 11. p. 266.

৫৬ জীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসাক প্রকা-
শিত বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ২৬ পৃষ্ঠা।

৫৭ সিংহ মহোদয়ের মহাভারত সভ্য
পর্ব ৫৫ পৃষ্ঠা।

প্রস্তাবের কোন কোন স্থানে আমরা মিত্র মহোদয়ের ভ্রম প্রদর্শন ও তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার প্রতি কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শন করি নাই। আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি, তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া আমরা ঐতিহাসিক জগতে বিচরণ করিতেছি, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে অনন্ত কাল স্মারক করিব।

বংশাবলী।

(চন্দ্র)

*

*

বীরসেন। দাক্ষিণ্যপথনিবাসী।

*

*

সামন্তসেন। ঐ

|

হেমন্তসেন ঐ

|

১। মহারাজ বিজয়সেন দেব। গোড়ের
প্রথম রাজা।

|

২। „ বল্লালসেন দেব।

|

৩। „ লক্ষ্মণসেন দেব।

|

৪। „ মাধবসেন দেব ৫। কেশবসেনদেব

৬। হরিত্রকদেব

৭। অশোকচন্দ্র দেব।

৮। লক্ষ্মণসেন দেব। ১১২৭ শকাব্দে
নদীয়া হইতে পলায়ন করেন।

*

সুসেনদেব।

*

দনুজ রায়।

*

বল্লালসেন দেব (দ্বিতীয়)।

দ্বিতীয় বল্লালসেনের সময়ে মুসলমানগণ পূর্ব বাঙ্গালা অধিকার করেন। ইহা একটি প্রবাদ বাক্য। দীর্ঘকালাবধি এই প্রবাদ বিক্রমপুরে প্রচলিত রহিয়াছে। ইংরেজি, বাঙ্গালা বিবিধ পুস্তকে দেশপ্রচলিত প্রোক্ত প্রবাদ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বংশাবলীর শেষভাগে আমরা যে তিন জন রাজার নাম সংযুক্ত করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে সুসেনের নাম হিন্দু ও মুসলমানের বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে। দহুজরায়ের নাম বারবির লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় বল্লালসেনের নাম দেশপ্রচলিত প্রবাদ হইতে সংগৃহীত। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই নামটী বিশ্বাস করিতে পারেন, না করিলেও আমাদের কোন আসিয়া যায় না। কিন্তু আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে দর্শন করিয়াছি যে, বল্লালসেনের সময়ে “বাবাদম” নামে জনৈক মুসলমান প্রকৃত বঙ্গ দেশে সর্বপ্রথম মুসলমান জয়পতাকা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সেন রাজগণের চিহ্ন মাত্র লোপ পাইয়াছে। বঙ্গীয় আখ্য-গৌরব-ভাস্কর চিরকালের জন্য অন্তর্মিত হইয়াছে। বঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

গোঁড় গীত।

উত্তরে নর্মদা হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত গোঁড়দেশ বিস্তৃত। হোস-ঙ্গাবাদ, জব্বলপুর, মাওলা, রাইপুর প্রভৃতি মধ্য প্রদেশের প্রায় সমুদয় জেলাতেই গোঁড়ের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। নাগপুরের প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারক হিসলপ গোঁড়দের কতকগুলি গীত সংগ্রহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ২৮৬৬ খ্রীঃ অশ্বে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিসনর, রিচার্ড টেম্পল (এক্ষণে সার রিচার্ড টেম্পল) ঐ সকল গীত ইংরাজী অমুবাদ সহ প্রকাশ করেন। নিম্নে ইহার (অনেক বাদ সাদ্দিয়া) বাঙ্গলা অমুবাদ করা গেল; স্থানে স্থানে কেবল ভাবার্থ লওয়া হইয়াছে। গীতগুলি গোঁড় সমাজের ক্রমবিকাশ অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে তজ্জন্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পঠিত। কিন্তু তা ছাড়া উহাতে মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্ব লক্ষিত হয়। গীত কয়টির বর্তমান পরিচ্ছদে হিন্দুদের হাত দেখা যায়—গোঁড়রা মহাদেব পার্ৱতী প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর ধার ধারে না; তাহাদের উপাস্য দেবতা স্বতন্ত্র কিন্তু গীতগুলির আসল গঠন যে গোঁড়ী তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথম ভাগ।

গোঁড়ের কারাবাস।

অমমিয়া গোঁড় বনে ছড়ানে পড়িল,
তুম্ব গিরিশঙ্ক কিম্বা নিম্ন উপত্যকা,

গোঁড় নাই হেন ঠাঁই দেখা নাহি যায়।
যা কিছু দেখিতে পায় তাই খাদ্য তার;
হরিণ, শৃগাল, ভেক, মহিস, শূকর,
বাঁড়, গরু, আরসোলা, কিম্বা গিরগিটা,
নাহি কোন মানবিচ সব ধরে খায়।
ছয় মাস ধরে গোঁড় মান নাহি করে;
মুখ নাহি ধোয় কভু; গোবরের পর
স্বহন্দে শুইয়া রহে; † ছিল এইরূপ
গোঁড় সৃষ্টির প্রথমে; পূরিল অনিল
দুর্গন্ধে ধবলাগিরি শিবের আবাস।
ক্রোধাক্ষ ধূর্জটী বলে ডাকি নারায়ণে;—
“কলুষিত সব স্থান করিলেক গোঁড়;
ধ্বংশিব তাহার বংশ প্রতিজ্ঞা আমার।
এহেন ধবলাগিরি, বাস স্থান মোর,
পূরিত দুর্গন্ধে এবে; আন হেথা গোঁড়”।

দলে দলে গোঁড় তবে হইল আনীত;
লয়ে তাহাদিগে নিম্নে, উপত্যকা মাঝে,
সারি সারি করি শিব বসায়ে সবারে,
নিরমিয়া এক কাঠবিড়ালি তখন,
জীবিত করিয়া তারে দিলেন ছাড়িয়া।
খাড়া করি লেজ কাটবিড়ালি দৌড়ায়;
দেখি তারে গোঁড় সব উঠিল দাঁড়ায়,
ধায় পিছে পিছে তার, কেহ বলে “মার,”

* জঙ্গলের গোঁড়েরা অদ্যাপি একরূপ
থাইয়া থাকে।

+ নিতান্ত অসত্য গোঁড়ের পক্ষে এ-
কিত্তি এখনও অযথার্থ নহে।

না পায় দেখিতে কিছু ; কভু বলিতেছে,
দাঁড়াইছে কভু, লক্ষ দিতেছে কভু বা,
গড়াগড়ি যায় কভু আরস্তিল নৃগ।
রাক্ষসী + প্রভাতে আদি ঘরের বাহির,
শুনিল মাঠের দিকে মধুর সঙ্গীত।
আসিয়া তথায় তার স্বামীরে ডাকিল ;
ঘন ঘন তুলি পদ প্রসারিয়া বাহ,
নোয়াইয়া ঘাড় নৃত্য করি রাক্ষসী ২৫

অসম্মত নানা

৩৭

হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ; দেখিয়া তাহারে
উচ্চে ডাকিল রাক্ষসী “ওরে মিন্বে মোর,
বড়ই মধুর আই সঙ্গীত, রে বুড়ো’
কেড়ে লয় মন প্রাণ, আমিও নাচিব।”
এতবলি আরস্তিল নাচিতে রাক্ষসী। †

ক্রমশঃ

শ্রী প্রমথনাথ বসু।

(বি এন্স সি, লণ্ডন)

ইন্দ্রিয়ের তাহাষা বিনা মনের কথা জানা।

—পূর্বের অনুরূতি।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ক্রিয়ারি
কন্যাগণ মনের কথা বলিবার জন্য যে
কিছুমাত্র কপটতা, কিছুমাত্র প্রতারণার
আশ্রয় লয় নাই, ইহা আনয় কি করিয়া
জানিব? কিন্তু যদি সেই উচ্চশ্রেণীর
খ্যাতিনামা পরীক্ষকগণকে বিশ্বাস করিতে
হয়, ত এ সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে
না, তাহারা বলিতেছেন যে “ক্রিয়ারি এক-
জন সজ্জাত সাধুচেতা ব্যক্তি, কন্যাগুলি
অতি শিষ্ট শাস্ত সংস্কারিত। যিনি তাহাদের
দেখিয়াছেন তিনিই বলিবেন যে প্রতারণা
কপটতা তাহাদের কর্ম নহে।” ইহা সত্যও
তাহারা যেরূপ সাবধান হইয়া পরীক্ষা
করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রতা-
রণার উপায় পর্যন্ত রাখিতে দেন নাই।

সন্দেহের পথ একেবারে বন্দ করিবার জন্য
পরীক্ষকগণ এত সাবধানে কাজ করিতেন,
যে পরীক্ষাধীন বালিকার শিক্ষাতে কেহ
কাহারো কাণে কাণে কথা পর্যন্ত কহিতে
পাইত না। কি জানি ঠোঁট নাড়ার ধরণে
যদি বালিকাগণ কিছু বুঝিতে পারে। কেহ
যদি বলেন যে বালিকার পিতা মাতা প্র-
ভৃতি আত্মীয়গণ যাহারা সে গৃহে থাকিতেন
তাহারা ত আগে হইতে কোনরূপ বন্দো-
বস্ত করিয়া সেই সময় ইঙ্গিতে, কথা না ক-
হিয়াও, বালিকাদের কিছু জ্ঞানাইয়া দিতে
পারেন। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না,
পরীক্ষকগণ যে কথা মনে করিতেন, তাহা
বালিকাদের আত্মীয়গণকে সব সময় জানিতে

† রাক্ষসী মাঠ হইতে কিছু দূরে ঘরে
থইয়াছিল।

‡ অসম্মতের উপরেও সঙ্গীতের কমতা
এখানে উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গৌড়
কবির এখানে বাস্তবিক কবিত্ব দেখা যায়।

দিতেন না। তবে যখন বালিকাদের আত্মীয়গণকে তাহা জানাইতেন তখন একরূপ হৃদয় দৃষ্টিতে তাহাদের উপর নজর রাখিতেন, যে সেদৃষ্টি এড়ান বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তারপর বালিকাগুলি এত শিষ্ট শাস্ত, যে পরীক্ষকগণ পরীক্ষার সুবিধার জন্য যখন যে স্থানে যে অবস্থায় দাঁড়াইতে বলিয়াছেন তাহার। তাহাই করিয়াছে, পরীক্ষকগণও কপটতা অবলম্বন করিবার' যো না থাকে এইরূপ স্থানে বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের দাঁড় করাইয়াছেন। ইহা ছাড়া আগেই বলা হইয়াছে যে বালিকাগণ অনেক সময় পরীক্ষা গৃহের কাহারো সহিত কোনরূপ সংশ্বে ন। আসিয়া অন্য লাগাও রুদ্ধ ঘরের মধ্য হইতে ঠিক উত্তর করিয়াছে।*

* এসম্বন্ধে অধ্যাপক ব্যারেট যাত্রা বলিতেছেন তাহা বরং এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"The exceptional nature of this inquiry goes far to invalidate arguments founded on character and demeanour; and, on this head, we will only state our conviction that any candid critic, present during the whole course of the experiment would have carried away a far more vivid impression of their genuineness than the bare printed record can possibly convey. Of more real importance is the hypothesis of exalted sensibility of the ordinary sense organs. We could discover no indication of this in any of its known forms: but by way of precaution, as has been al-

মনের কথা পাঠের পক্ষ প্রমাণ ইহা হইতে আর কি অধিক হইতে পারে।

ready stated, we commonly avoided even whispering any word, number, or name that we had selected; and the position of the excluded child, when the door was opened, would in every case have satisfied the most exacting critic. The explanation which might be sought in unconscious indications given by the sitters, and especially in the movement of the lips, has been already adverted to. Coming as we did to this investigation with considerable previous experience of the same kind, we were throughout strictly on our guard against giving such indications ourselves; the possibility of their being given by the family was, of course, excluded where the family were ignorant of the selected word or thing; and on the remaining occasions our perpetual vigilant watch never detected a trace of any thing of the kind. The absolute docility of the children—both the guesser and others—in taking any position in the room that we indicated, was naturally an assistance to our precautions. It may be further mentioned that, on a previous visit made by one of us, the child called the required name through the shut door, or from an adjoining room, having thus been completely isolated from the very beginning to the very end of the experiment.

এক কথায়, বালিকাদের এই মনের কথা বলিতে পারার ভিতর যে মিথ্যা জুয়া-চুরি কিছুমাত্র ছিল না, সে বিষয়ে পরীক্ষক-গণ নিঃসংশয় হইয়াছিলেন।

প্রতারণা ত দূরের কথা, কোন জ্ঞাত ইন্দ্రిয়ের কোনরূপ বিশেষ তীক্ষ্ণ অসাধারণ অল্পভব শক্তি দ্বারাও যে বালিকাগণ উক্ত ঘটনা সকল স্মৃতি করিয়াছিল এমন লক্ষণ পর্য্যন্তও তাহারা দেখিতে পান নাই।

প্রফুল্ল ও উৎসাহ পূর্ণ মনের অবস্থাতেই মনে করা হইয়াছে।

এক সোনার ব্রোচ,

একটা ডিম,

একটা কলম দণ্ড (এই দুইয়ের উপর একটা আঙ্গুল দস্তানা (থিমবল) উলটান ছিল।)

একটা ঘোর লাল আপেল

একটা চাবি,

বালিকাগণ সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য হইত। এমন কি একবার উৎসাহিত হইয়া উপরি উপরি ১৭ টি ভাস একেবারে ঠিক বলিয়াছিল, একটিও ভুল করে নাই।

ক্রিয়ারির কন্যাগণই যে একমাত্র মনের কথা বলিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছে এমন নহে, লিবারপুলের ছুটি মহিলা উক্ত সভার সভাগণের নিকট কিরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন তাহা নিম্নের তালিকায় প্রকাশ করা যাই-তেছে।

উত্তর।

ইহার রং হলদে, ইহা একটা ব্রোচ।

ঠিক যেন একটা ডিমের মত।

{ একটা থাম, একটা ঘন্টার মত গড়নের জিনিস তার উপর উলটান রয়েছে।

{ এটা গোল, খুব ঘোর লাল রংয়ের, একটা দর-জার নবেরমত দেখিতে, এটা একটা আপেল।

{ একটা ছোট জিনিস, তার একশেষে একটা গোলচাকা, আর একশেষে একটা ছোট নিশা-নের মত, একটা খেলেনার যেন নিশান মত রয়েছে। (তাহার পর ইহার নাম কি বলিতে অস্বীকার হইয়া,) এটা একটা চাবির মত।

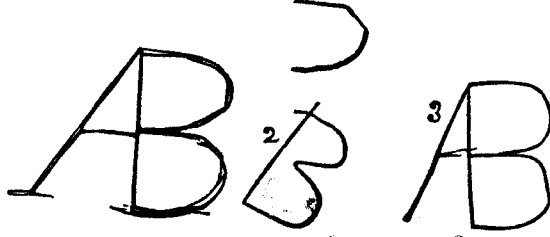
ইত্যাদি।

স্থিতি নামক একজন যুবকের উপর পরীক্ষা করিয়া আরো আশ্চর্যরূপ মানসিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে মিষ্টার ব্যাকবর্ণ স্থিতির পরীক্ষক। ব্যাকবর্ণ অতি বুদ্ধিমান, অতি কড়া পরীক্ষক, তাহার কাছে পান হইতে চুনটি খসিবার ঘো নাই, সেই জন্য অন্যান্য সভাগণ কর্তৃক তিনিই পরীক্ষক রূপে নির্বাচিত হইলেন। স্থিতির চোখ

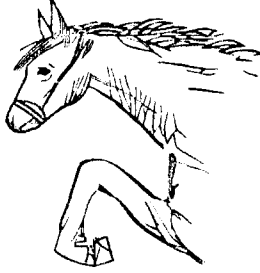
বাঁধা, তিনি একটি টেবিলের কাছে উপ-বিষ্ট, তাহার হাতের কাছে টেবিলে আঁকি-বার জিনিসপত্র। একজন সভ্য তাহার কাছে বসিয়া পাহারায় নিযুক্ত আছে, আর একজন সভ্য অন্য স্থানে গিয়া কোনরূপ একটি ছবি আঁকিয়া তাহা ব্যাকবর্ণকে ডাকিয়া দেখাইলেন, ব্যাকবর্ণ সেই ছবি কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে দেখিবার পর চোখ বুজিয়া আর

একজনের হাত ধরিয়া পরীক্ষা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া স্থিতির পশ্চাতে কিছু দূরে নিস্তক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন হয়ত বা বসিলেন। কিছুক্ষণ ব্যাকবর্ণ স্থির মনে

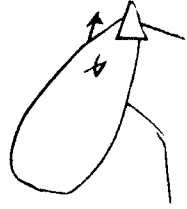
ঐ ছবি ভাবিবার পর, স্থিতি সেই চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ব্যাকবর্ণের মনের ছবি আঁকিয়া দিলেন।



ব্যাকবর্ণ মনে করিলেন, স্থিতি আঁকিলেন, তৃতীয় চেষ্টায়



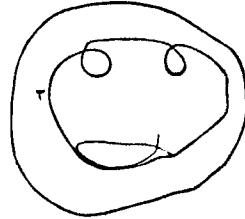
ব্যাকবর্ণ মনে করিয়াছেন,



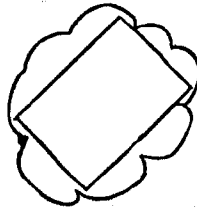
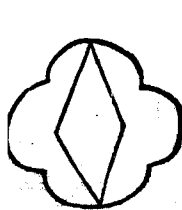
স্থিতি আঁকিলেন



ব্যাকবর্ণ মনে করিয়াছেন,



স্থিতির আঁকা



ব্যাকবর্ণ মনে করিয়াছেন, স্থিতি আঁকিলেন

এখানে যেক্রপ নমুনা দেখান হইল
এটরূপ ছবি, ৬০ পাতা ধরিয়া উক্ত সভার
কার্যাবিবরণ পুস্তকে দেওয়া আছে। এই
রূপ পরীক্ষার সময় একবার স্থিতির চোখ
বাঁধিয়াই পরীক্ষকগণ ক্ষান্ত হন নাই। তাহার
কানে ছিপি দিয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া,
তাঁহার পর আর এক কাপড়ে মাথা হইতে
সমস্ত মুখ ঢাকিয়া তাহার উপর আবার আর
একখানি কপড় দিয়া মাথা হইতে তাহার বুক
পর্যন্ত ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। কোন প্রকারে

যাহাতে তাহার আর বাহিরের কিছু শুনিবার
কি বুঝিবার সম্ভাবনা না থাকে। আশ্চর্য্য
এই, এই অবস্থায় স্থিতির ছবি অঁকা অন্য
সময় হইতে আরো ঠিক হইয়াছিল। ইহা
হইতে দেখিতে পাইতেছি সংযত অবস্থাই
চিন্তাপাঠের অন্তকূল অবস্থা। ইহাতে আমা-
দের যোগশাস্ত্রের জয় দেখা যাইতেছে,
যোগশাস্ত্রমতে বাহির হইতে মনকে যতই
সরাইয়া লইবে, ততই মানসিক শক্তির
বিকাশ সাধন হইবে।

ক্রমশঃ

আয়ুর্বেদের ইতিহাস ।

এই দেখা যায় যে, প্রথমে ভরদ্বাজ মু-
নিই ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রচার
করেন, তাঁহার এই উদ্যমের ফল, আত্রেয়
সংহিতা, অগ্নিবেশ তন্ত্র বা চরক-সংহিতা,
হারীত সংহিতা প্রভৃতি অবিনশ্বর কীর্ত্তি সকল
বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যতম প্রচারক ধ্ব-
জুরির প্রচারের ফল ধ্বজুরি সংহিতা, সূ-
শ্রুত, ঔরভ প্রভৃতি। ভারতবর্ষে চিকিৎসা
বিজ্ঞানের যে এত উন্নতি হইয়াছিল ভরদ্বাজ
ও ধ্বজুরিই তাহার আদি কারণ। চাৰণ
কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণও আয়ুর্বেদের উ-
ন্নতি কল্পে বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ভারতবর্ষে যেক্রপে আ-
য়ুর্বেদ প্রচার করেন, চরক সংহিতার প্রা-
রম্ভে তাহা এইরূপে বর্ণিত আছে।

যে সময়ে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া

শরীরীদিগের তপস্যা, উপবাস, অধায়ন,
ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, আয়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ
বিদ্র জন্মাইতেছিল, তখন প্রাণী সমূহের
প্রতি দয়া করাই প্রধান উপলক্ষ করিয়া
পুণ্যকর্ম্ম মহর্ষিগণ মঙ্গলময় হিমালয়-পার্শ্বে
এক সুমহতী সভা আহ্বান করিলেন।
অঙ্গিরা, যমদগ্নি বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, আ-
ত্রেয়, “গৌতম, সাংখ্য” পুলস্ত, নারদ, অ-
সিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয় অশ্বলায়ণ,
পারিক্শি, “ভিক্ষু আত্রেয়,” ভরদ্বাজ, কপি-
ষ্ঠল, বিশ্বামিত্র, আশ্বরথা, ভার্গব চাৰণ, অ-
ভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, কৌতিল্য, বাক্শি,
দেবল, গালব, সাক্ত্য, বৈজবাণি, ক্লশিক,
বাদরায়ণ, বড়িশ, শরলোমা কাপ্য, কাত্যা-
য়ণ, কাক্ষায়ণ কৈকশেয়, ধোম্য, যারীচ,
কাশ্যপ, শর্করাক, হিরণ্যাক, লৌগাক্শি,

পৈঙ্গি, শৌনক, শাকুন্য, মৈত্রেয়, (৬) মৈম-ভারণি প্রভৃতি ঋষিগণ বৈখানস এবং বাল-খিলা মুনিগণ এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া তপোলক্বেদঃ প্রভাবে হুয়মান প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্ম-জ্ঞান, দম এবং নিয়মের নিধি স্বরূপ। তাঁহারা তথায় সুখে উপবেশন করিয়া এই পুণ্যজনক কথার প্রস্তাব করিলেন,ঃ— “আবোগাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতু-র্কর্গ লাভের প্রধান উপায়। রোগ সমুহই সেই আরোগোর মঙ্গলের এবং জীব-নের অপহর্ত্ত। ব্যাধি মনুষ্যসংগের পক্ষে মহাবিষ্ম স্বরূপ হইয়া প্রাত্তুভূত হইয়াছে। এই ব্যাধি সমূহের শান্তির উপায়, কে বলিয়া দিবেন?”

ইহা বলিয়া তাঁহারা ধ্যানস্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধ্যান চক্ষে দেখিতে পাই-লেন যে, এ বিষয়ে ইন্দ্রই একমাত্র শবণ্য। তিনিই যথাযথ রূপে রোগশান্তির উপায় বলিয়া দিবেন। অনন্তর আবার প্রস্তাব করিলেন, ইন্দ্রকে বোগশান্তির উপায় জি-জ্ঞাসা করিবার জন্য কে ইন্দ্রভবনে গমন

করিবেন? “এখানে এতদন্য আমিই নিযুক্ত হইলাম” সর্ক প্রথমে ভবদ্বাজই এ কথা বলিলেন সুতরাং ঋষিগণ কর্তৃক তিনিই নিয়োজিত হইলেন।

ধীমান ভবদ্বাজ ইন্দ্রভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন দিবর্ষিগণের মধ্যে সর্ক-বল-হস্তা ইন্দ্র দীপ্যমান সূর্য্যোব ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ভগবান ভবদ্বাজ নিকটে যাইয়া, জয় উচ্চারণ এবং আশীর্কচন দ্বারা ইন্দ্রকে অভিনন্দন করিয়া, ঋষিগণের অভি-লম্বিত বাক্য জানাইয়া বলিলেন, ব্যাধি-সকল সকলপ্রাণীর আতঙ্ক স্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, হে অমব প্রভো! আমাকে দেই ব্যাধি সকলের শান্তির উপায় আত্ম-পূর্কিক বলিয়া দিন।

অল্প কথাতেই বিপুল বুদ্ধি দেখিয়া, ভগবান ইন্দ্র, মহর্ষিকে আয়ুর্বেদের উপ-দেশ দিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মভাষিত আয়ুর্বেদ, সুপবিত্র, নিত্য ; বোগেব কারণ, বোগের লক্ষণ, এবং ঔষধ জ্ঞান এই ত্রিবিধ সূত্রে পরিপূর্ণ এবং সুস্থ ও বোগী উভয়েরই সমান আশ্রয়স্থল। মহা-মতি ভরদ্বাজ মুনি তন্মনা হইয়া সেই অনন্ত পার ত্রিকন্ডে আয়ুর্বেদ অচিরাত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঋষিগণ দীর্ঘ আয়ু কামনা করিয়া প্রজাদিগের হিতকর এবং আয়ু-র্কর্ছন আয়ুর্বেদ ভরদ্বাজ হইতে গ্রহণ করি-য়াছিলেন। মহর্ষিগণ, আয়ুর্বেদ পাঠে জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়া তদ্রোক্ত বিধি, সামান্য, বিশেষ ওষ, কর্ম্ম, সমবায় প্রভৃতি অবগত হইয়া পরম শান্তি এবং অনন্তর জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

৬ মহাভারত, অমুশাসন পর্কের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র মুনির পুত্রদিগের নামের তালিকায় অশ্বলায়ণ, গার্গ্য, গালব, হির-ণ্যাক জাবালি সূক্ত এবং নারদের নাম বৃষ্ট হয়। বৈশ্য্যার-গর্ভে এবং বিশ্বামিত্রের গুণে সূক্তভেদ জন্ম হয়। যদি উল্লিখিত সূত্ৰাঙ্ অশ্বলায়ণ প্রভৃতি ঋষিগণ বিশ্বা-মিত্রের সূক্ত হন তবে তাঁহারা সূক্তভের ব্যাধি:

ভরষাজের শিষ্যদিগের মধ্যে লোক-
হিতে রত পূর্মর্কসু আত্রেয় ঋষি, সকল প্রা-
ণীর হিতের জন্য অগ্নিবেশ, ভেল, জাভুকর্ণ,
পরাসর, তারীত, ক্ষারপাণি, এই ছয়টি
শিষ্যকে সুপবিত্র আম্বুর্কেদ শিক্ষা দান
করিয়াছিলেন। তাঁহারাও মুনির বাক্য
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

যদিচ মুনি, সকল শিষ্যকেই এ সম্বন্ধে
ধর্মান উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহা-
দের মধ্যে বৃদ্ধির পার্থক্য দেখা যায়, কেন না,
সর্বপ্রথমে অগ্নিবেশই তত্ত্ব প্রণয়ন করেন ।
অনন্তর সুরমেধা-সম্পন্ন ভেল প্রভৃতি পঞ্চ
ঋষিও নিজ নিজ তত্ত্ব প্রণয়ন করিয়া ঋষি-
গণের সহিত আত্রেয় মুনিকে শ্রবণ করা-
ইয়াছিলেন । পূণ্যকর্ম্য ঋষিগণ সূত্রার্থ
শ্রবণ করিয়া “সুন্দর রূপে রচিত হইয়াছে”
এই বলিয়া প্রস্তুত চিত্তে অহুমোদন করি-
লেন । সেই সময়ে দেবতাগণও মহা আ-
নন্দ করিয়াছিলেন । * * * ।
ঋষিগণ কর্তৃক সেই তত্ত্বগুলি অহুমোদিত
হইয়া প্রাণীগণের হিতার্থে পৃথিবীতে পরম
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল । (৭)

বাহ্যল্যভয়ে এখানে আর মূল উদ্ধৃত
করিলাম না । কেবল মূলের অনুবাদ ক-
রিয়া দিলাম । চরক সংহিতা বাতীত
আম্বুর্কেদ প্রচারের একরূপ বিস্তৃত প্রাচীন
ইতিহাস আর কোথাও দৃষ্ট হয় না । উল্লি-
খিত সভাতে যে যে ঋষি উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই যে আম্বুর্কেদের
উন্নতিকল্পে যত্ন করিয়াছিলেন এখনও

৭ চরকসংহিতা ১ম অধ্যায় (সুজহান) ।

ভাষায় অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় ।
অনেক ঔষধ, তৈল, স্নাত প্রভৃতিতে কাশাপ,
চাবণ, গার্গ্য, অগস্ত্য প্রভৃতির নাম দেখা
যায় । যথাহলে এই সকল আলোচনা
করিব ।

আম্বুর্কেদ প্রণেতাদিগের এবং তাঁহা-
দিগের শ্রগীত গ্রন্থাদির বিবরণ, অঙ্গবৈবর্ত
পুরাণে এইরূপে লিখিত আছে ;—

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ক্যখ্যান্ দৃষ্ট্বেদান্ প্রজা-
পতিঃ ।

বিচিন্ত্য তেষামর্গকৈবাম্বুর্কেদং চকার সঃ ।

কুত্বাতু পঞ্চমংবেদং ভাস্করায় নদৌ বিভূঃ ।

স্বতন্ত্রসংহিতাং তস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ ।

ভাস্করশ্চ শশিযোভ্য আম্বুর্কেদং স্বসংহিতাম্ ।

‘প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্লুঃ সংহিতা স্ততোঃ ॥

তেষাং নামানি বিদ্যাং তস্মানি তৎকৃতানি চ ।

ব্যাধিপ্রশাসদীজানি সাধি ! মন্তোনিশা-
গয় ॥

যযন্তরি দ্বিবোদাসঃ কাশীরাজোহুত্বিনী
সুতো ।

নকুলঃ সহদেবোহর্কিচ্যবণো জনকো বুধঃ ।

জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোহগস্ত্য এ-
বচ ।

এতে বেদান্তবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ ।

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তত্ত্বং মনোরমং ।

যযন্তরিশ্চ ভগবান চকার প্রথমে সতি ।

চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাস শ্চকার সঃ ।

চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশীরাজ শ্চকার
সঃ ।

চিকিৎসা সারতন্ত্রক জয়সং চাভিনীসুতো ।

তত্ত্বং বৈদ্যকসর্কসং নকুলশ্চ চকার সঃ ।

চকারসহদেবশচ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দনং ।
জ্ঞানার্ণবঃ মহামন্ত্রঃ যমরাজ শ্চকার সংঃ ॥
চাবনো জীবদানঃ চকার ভগবান্ ঋষিঃ ।
চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনঃ ॥
সর্কসারং চন্দ্রহতো জাবালস্তদ্রসাবকং ।
বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলি মুনিঃ ॥
পৈলো নিদানং করথ স্তত্রং সর্কধরংপরং ।
বৈদ্যনির্ণয় তন্ত্রঞ্চ চকার কুণ্ডসত্ত্ববঃ ॥
চিকিৎসা শাস্ত্রবীজাণি তন্ত্রাণ্যোতাণি যো
ডঃ ॥ (৮)

ইহার মর্ম এই, ত্রুজা ঋগযজুঃ সাম এবং
অথর্ক এই চারিবেদ, অবলম্বন করিয়া
পঞ্চমবেদ আয়ুর্ষেদ প্রণয়ন করত উহা
স্বর্ধাকে প্রদান করেন। স্বর্ধা আবার নিজ
নামে, ভাস্করসংহিতা প্রণয়ন করিয়া ঋষ-
স্তুরি প্রভৃতি বোড়শ জন শিষ্যকে উহার
শিক্ষা দান করেন। এই ভাস্করসংহিতা
অবলম্বন করিয়া ষোলজন শিষ্যের মধ্যে
(১) ধ্বস্তুরি চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান (২) দি-
বোদ্যাস চিকিৎসাদর্পণ (৩) কাশীরাজ
চিকিৎসাকৌমুদী (৪) ৫) অশ্বিনীকুমারদ্বয়
চিকিৎসা তন্ত্র (৬) নকুল বৈদ্যক সর্কস্ব (৭)
সহদেব ব্যাধিসিন্ধু-বিমর্দন (৮) যমরাজ জ্ঞা-
নার্ণব (৯) চাবন জীবদান (১০) রাজর্ষি
জনক বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন (১১) বুধ সর্কসার
(১২) জাবাল মুনি তন্ত্রসার (১৩) জাজলি
মুনি বেদাঙ্গসার (১৪) পৈলমুনি নিদান (১৫)
করথ মুনি সর্কধরতন্ত্র এবং (১৬) অগস্ত্যমুনি

৮ 'ত্রুজবৈবর্ত' পুর্বাণ, অক্ষখণ্ড, ১৬শ
অধ্যায়।

বৈদ্য-নির্ণয় তন্ত্র প্রণয়ন করেন; এই ষোল
জন তন্ত্রই চিকিৎসা শাস্ত্রের বীজ স্বরূপ।

ত্রুজবৈবর্ত পুর্বাণের এই সকল কথা কি
কেহ বিশ্বাস করিবেন? ইহাতে যে কিছু
ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহাতে
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয়,
ইহাতে প্রকৃততত্ত্ব অপেক্ষা অমূলক বিব-
রণের ভাগই অধিক। চুপের বিষয় উল্লি-
খিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এখন লোপ
পাইয়াছে; সুতরাং সত্যাসত্য সন্ধ্যা
পর্যালোচনা করা সহজ নহে। আয়ুর্ষে-
দীয় টীকাকাবগণ অনেক প্রাচীন গ্রন্থের
নানোরেন্থ করিয়া তাহা হইতে বচন উদ্ধৃত
করিয়াছেন কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলির কোনখানির
নামই প্রায় টীকা প্রভৃতিতে দেখা যায় না।

অমৃতচার্গা ধ্বস্তুরি, সুশ্রুত, কাশীরাজ
ধ্বস্তুরি বাগ্‌ডট প্রভৃতি ভিন্ন, অধিকাংশ
আয়ুর্ষেদীয় সংহিতা প্রণেতৃগণই ব্রাহ্মণ
ছিলেন। অতি পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণগণই
আয়ুর্ষেদ ব্যবসায়ী ছিলেন। যাহা এই
শাস্ত্রের প্রাণদাতা যাহারা এই শাস্ত্র প্রভাবে
মাহুদের জীবনত্রাণ কবিতেন সেই ব্রাহ্মণ
গণ এই চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন কবিলে
একপে লোকসমাজে এত ঘৃণাস্পদ হয়েন
কেন? আমবা এই স্ত্রে পূজ্যতম ব্রাহ্মণ-
দিগের অলৌকিক উদারতা এবং অপারি-
মিস্বার্থতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। পুর্বা-
কালের ভারতীর ব্রাহ্মণগণের অনেক বিষয়ে
স্বার্থপরতার চিহ্ন বর্তমান থাকিলেও তাঁ
হারা আবার অনেক স্থলে এরূপ উদারতা
মহৎ ও নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছেন যে

তাঁহা তুলনা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্যের একরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল যে তাঁহারা ই সমাজের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। তাঁহারা রাজেশ্বর সত্রাটেরও শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবাধে নিজেরাই রাজদণ্ড ধারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহারা কদাচ করিতেন না বরং যিনি এজন্য লাল্যমিত হইতেন তাঁহাকে পতিত হইতে হইত। অতি পূর্বে ব্রাহ্মণ্যই চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন; ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট উপার্জনও ছিল, কিন্তু যখন তাঁহারা অমৃতচাৰ্য্য ধন্বন্তরির সময় হইতে বৈদ্যদিগকে এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন তখন তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যদি ব্রাহ্মণ্য এ ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ না করিতে পারেন তবে আর বৈদ্যজ্ঞাতির উপায়ান্তর নাই, তবে তাহারা কি করিয়া অর্থাপার্জন করিবে? সুতরাং নিয়ম করা হইল, চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পাওয়া যাইবে না। যখন এ সামান্য ক্ষতিতে তাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না তখন নিয়ম করা হইল “চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ শূত্র তুল্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাহাদের অন্তর্ভোজন করিলে পতিত হইবেন এবং কুকুরবানি লাভ করি-

বেন। ১০ কিন্তু ইহাতেও ব্রাহ্মণ্যগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। যখন মহারাজ পরীক্ষিতকে তক্ষক দংশন করিতে যায় তখন কাশ্যপের ন্যায় মহর্ষিও অর্থলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, পরীক্ষিতের চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তক্ষক বহু অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাকে পথেই বিদায় করিয়া দিল। মহর্ষিগণ দেখিলেন, একরূপ চক্রান্ত করিয়াও অর্থলুব্ধ ব্রাহ্মণদিগকে এ ব্যবসায় হইতে বিরত রাখা যাইবে না। অর্থের কাছে এই আত্মমর্ধ্যাদা টুকুর জন্য অনেকেই এ ব্যবসা ছাড়িবেন না। সুতরাং এ নিয়ম ও বৈদ্যদিগের উপার্জনের পক্ষে অনুকূল হইল না। সুতরাং আবার নিয়ম করিলেন—“ব্রাহ্মণ্য ভিক্ষণ দৃষ্টা সচেলং নান্যাদিশেষঃ” এবং “পুণ্ড্র চিকিৎসকস্যগ্রং * * * ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে দেখিলে বস্ত্রসহ নান করিবে, চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের অন্ন পুষ্টুলা, ইত্যাদি। ধন্য ব্রাহ্মণ্যগণ! তোমরা যথার্থ ভূদেব। দেবতা ভিন্ন সামান্য মনুষ্য কি অন্যের জন্য নিজ স্বার্থ এইরূপ বলিদান করিতে পারে! শুধু বৈদ্যদিগের জন্য নহে, রাজা যুদ্ধব্যবসায়ী রাজকন্ঠচারী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের অন্য ব্রাহ্মণ্যগণ এইরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পারজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কাছে অর্থলোভ, রাজ-পদ প্রভৃতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। অন্য ব্যবসায় অবলম্বন

করিলে তপোষপ ধর্মকর্ম শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির দিকে মনোনিবেশ হয় না সুতরাং এই সমুদায়ের উপর স্থগা প্রদর্শন করিতেন, এবং স্বজ্ঞাতিদিগকেও ঐ সমুদয় ব্যবসায়ের উপর বিতৃষ্ণ করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে এই সকল নিয়মের প্রবর্তনা করিতেন । তাহা হউক, তথাপি দেবতুল্য লোক ব্যতীত কি সামান্য মনের লোকে এই সকল লোভ সংবরণ করিতে পাবে? যাহা হউক, এই সকল নিয়ম কবিয়া ঋষিগণ বেশ কৃত-কার্য্য হইলেন । তখন ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসায় একেবারে ছাড়িয়া দিলেন । প্রায় বাগ্‌ভট গুপ্তের সময় হইতে চিকিৎসা, বৈদ্যদিগের একচেটিয়া ব্যবসা হইয়া গেল । সেই সময় হইতে কত শত আয়ুর্কর্ষদীয় গ্রন্থকার, টীকাকার প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই, তাহারা সকলেই প্রায় বৈদ্যবংশীয় ।

কিন্তু আত্রেয় প্রভৃতি মুনিদিগের সময় হইতে ব্যবস্থা আছে যে ব্রাহ্মণগণ কেবল প্রাণীদিগের উপকারার্থ, ক্ষত্রিয়গণ আত্ম-রক্ষার্থ এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির নিমিত্ত ক্রিয়া সামান্যতঃ ধর্ম অর্থ এবং কাম প্রতিগ্রহের নিমিত্ত, সকলেই আয়ুর্কর্ষদ অধ্যয়ন করিতে পারে । তথাপি:—

স (আয়ুর্কর্ষদঃ) চাঠৈষাতবো ব্রাহ্মণ রা-

জনা বৈশ্যৈঃ ; তত্রান্ন গ্রহার্থং প্রজানাং ব্রাহ্মণৈঃ রাজ্যবক্ষার্থং রাজনৈঃ, বৃত্তার্থং বৈশ্যৈঃ, সামান্যতো বা ধর্মার্থ-কাম-প্রতিগ্রহার্থং শর্তৈঃ । ইত্যাদি । (চরক, সূত্রস্থান, ৩০শ অধ্যায়)

এই নিয়মানুসারে চলিয়া চিকিৎসা করিলে ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক চিকিৎসোগোপন্যবী-দিগের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইত না । কিন্তু পরোপকারী ঋষিগণ দেখিলেন এ নিয়মানুসারে চলিলেও কোন কোন অর্থ-লুপ্ত ব্রাহ্মণ শাস্ত্র না মানিয়া চিকিৎসা দ্বারা অর্থাদি গ্রহণ করিতে পাবে ; সুতরাং চিকিৎসা ব্যবসায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়া “ব্রাহ্মণঃ ভিষজ্ঞঃ দৃষ্টা * * এই বিশেষ বিধিই বজায় রাখিলেন ।

যেমন বৈদিক কালে সেইরূপ পৌরাণিক ও আচার্য্য সময়েও আয়ুর্কর্ষদেব উন্নতি কল্পে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ আন্তরিক যত্ন করিতেন । বিক্রমাদিত্য, ভোজ মদনপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ স্বয়ং প্রজাদিগের চিকিৎসা করিতেন এবং তাহারা আয়ুর্কর্ষদীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।

ক্রমশঃ ।

সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ।

সমাজের স্বার্থের নিমিত্ত শাসনের প্রয়োজন । সমাজের অন্তর্গত সমুদায় ব্যক্তিগণ

যাহাতে সুখে থাকিতে পারে এই উদ্দেশ্যে দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন

ভিন্ন প্রকার নিয়মাবলী ও কার্য পদ্ধতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সকল কার্যপদ্ধতি ও নিয়মাবলীর মধ্যে এক প্রধান সাদৃশ্য এই যে তাহাদের সকলেরই এক মূখ্য উদ্দেশ্য ছুটের দমন ও শিষ্টের পালন। যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে তাহাকে সকল সমাজেরই লোকে ঘৃণা করে ও শাসন করিতে চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি স্ব-সম্মান্য আহার্য্য ও পরিধেয় পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সমাজের উন্নতি সাধনে দায়ী জীবন উৎসর্গ করে তাহাকে সকল সমাজেরই লোকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে। ছুটের দমন ছই প্রকারে হইয়া থাকে।

প্রথম, সমাজের কতকগুলি কর্মচারী দ্বারা। দ্বিতীয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা।

যে রূপ কার্যে সমাজের আত্যন্তিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সেরূপ কার্যের যথোপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব না হইলে তাহার দণ্ড কতকগুলি কর্মচারী দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকে। নর হত্যা, চৌর্য্য-বৃত্তি, জাতস্বারে প্রকাশ্য ভাবে অন্যের সম্পত্তিনাশ, ইত্যাদি কার্য এই শ্রেণীর দুর্কর্ম। আর যে রূপ কার্যে সমাজের আত্যন্তিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কিম্বা আত্যন্তিক ক্ষতি হইলেও প্রমাণ দেওয়া কঠিন সেরূপ কার্যের দণ্ড সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রদত্ত হয়। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি করুণাচরণ করে, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করে, আইন দ্বারা সে ব্যক্তির দণ্ড হয় না, কিন্তু তাহার প্রতিবাদী-গণ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ও তাহা

হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ শাসনকে আমরা সামাজিক শাসন বলি ; সামাজিক শাসনের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ লোকের বিমত নাই। যে রূপ কার্যে সমাজের অমঙ্গল হওয়ার বিলম্ব সম্ভাবনা অথচ আইন দ্বারা যাহার দণ্ড বিধান করা বিবেচনা সঙ্গত নহে, সামাজিক শাসন দ্বারা সেরূপ কার্যের নিরাকরণ হওয়া আবশ্যিক, আবার সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকাও আবশ্যিক। যে প্রথা অধিককাল ধরিয়া কোন সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের তাহার প্রতি অস্বীকার জানিয়া আইনে, আর কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিলে সে ব্যক্তির প্রতি লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িতে পারে—সে ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদীদলের, এমন কি সমুদায় সমাজের বিরাগভাজন হইতে পারে। এরূপ হওয়ার কারণ কি? আমরা যাহা কিছুতে অধিক কাল ধরিয়া অভ্যস্ত হই তাহা ক্রমে ক্রমে আমাদের নিকট গহজ হইয়া আইনে, তাহা যদি আমাদের গুণ-কর হয়, উত্তম,—যদি অশুভকর হয় তাহা হইলে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিতে শিখি, যদিই পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় না দেখি তথাপি তাহা হইতে আমরা যে কষ্ট পাই কালক্রমে তাহা আমাদের পক্ষে সহ্য হইয়া আসিতে পারে। আর যাহা কিছু আমাদের পক্ষে নুতন, তাহা আমাদের গুণ-কর কি অশুভকর হইবে তাহা আমরা প্রথমতঃ জানি না। হতবুদ্ধি তাহার প্রতি আমাদের

দেখাইতে পারি; যদি কোনরূপে তাহা হইতে আমরা বিপদ আশঙ্কা করি তবে তাহার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মিতে পারে। সমাজে যে সকল প্রথা অধিক কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে লোকে সে সকল প্রথায় অভ্যস্ত; প্রথমতঃ যখন সে সকল প্রথার বিপরীতাচরণ দেখা যায়, তখন তাহাতে লোকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে। সমাজ যতই পুরাতন হইতে থাকে তাহার মধ্যে প্রচলিত প্রথাগুলির সংখ্যাও অধিক হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই সকল প্রথা লোকে মান্য করিয়া চলে, অনেকের তাহার অনাথা করিতে ইচ্ছা হয় না; কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইলেও সেক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হ্রাস হইয়া আইসে, সমাজের প্রান্ত্রে স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্য দেখা যায়, সমাজের বর্জিতাবস্থার সামাজিক শাসনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রাজ্য হ্রাসমান হইতে দেখা যায়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োজন। মনুষ্যের জীবন কি? চতুর্দিশ ঘটনাবলীর সহিত মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যকরণ মাত্র। তাহার চতুর্দশ ঘটনায় যে সকল ঘটনা দেখা দিতেছে সেই সকল ঘটনার সহিত খীর শরীর ও মন এই দুয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া স্বকীয় অন্তিম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মনুষ্য যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছে সেই শক্তির প্রকাশকে কার্য বলে, মনুষ্যের কার্য সমূহই তাহার জীবন।

যখন আমরা দেখিতে পাই যে মনুষ্যের চতুর্দশ ঘটনাবলী ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ক্রমাগত অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, আলোক, উত্তাপ, তাড়িৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বল সমূহ ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে, ভৌতিক বস্তুগুলি পরস্পরের সহিত একে একে প্রকারে সংঘর্ষ, আবার পরস্পরে আর এক প্রকারে সংঘর্ষ, হইতেছে; যখন আমরা দেখিতেছি প্রকাণ্ড নাট্যালাসার মধ্যে দৃশ্য ও অভিনয়ের পরিবর্তনের ন্যায় এই বিশাল সংসার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রাকৃতিক বল সমূহের লীলাখেলা ক্রমাগত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতি ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি ধারণ করিতেছে, তখন মনুষ্যদিগের মধ্যে কে সাহস করিয়া বলিবে যে জীবনে কার্য-প্রথার পরিবর্তনে প্রয়োজন নাই? প্রকৃতি যেমন চলিতেছে, মনুষ্যেরও তেমনি চলিতে হইবে। প্রকৃতির আজ্ঞা “গতি ও পরিবর্তন”—এ আজ্ঞা বড় কঠোর আজ্ঞা, যে ব্যক্তি ও যে জাতি বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই আজ্ঞা পালন করিতে পারে সে ব্যক্তি ও সে জাতি উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে থাকে। আর যে ব্যক্তি ও যে জাতি তাহা না করিতে পারে—তাহার? তাহার সর্বনাশ, অধোগতি ও বিলস তাহার পরিণাম। দূরতীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, অন্যান্য বাজীদিগের সহিত সমবেলে চল, যদি তাহা না পার তুমি পশ্চাতে পড়িয়া থাক

কিবে, অন্ধকার আসিবে অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া কষ্ট পাইবে। তাই বলিতেছি সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত এক পক্ষে যেমন সামাজিক শাসনের প্রয়োজন, অপর পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও সেইরূপ প্রয়োজন। স্বৈচ্ছাচার দ্বারা অমঙ্গল সমূহ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সামাজিক শাসনের যেমন প্রয়োজন, চতুষ্পার্শ্ব ঘটনাবলীর পরিবর্তনের সহিত মনুষ্য জীবনের কার্য-পদ্ধতিগুলির পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও সেইরূপ প্রয়োজন। সকলেই যদি পুৰাতন প্রথা অনুসারে কার্য করে তবে প্রকৃতির নূতন মূর্তি দেখা দিলে নূতন প্রথা প্রচলিত করিবে কে? সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত, সমাজের উন্নতির নিমিত্ত, সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতদুভয়েরই প্রয়োজন ইহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। এক রাজ্যে দুই রাজ্য হইলে তাহাদিগের মধ্যে দেশ বিভাগের প্রয়োজন হয়। দেশ বিভাগ না হইলে রাজ্য রাজ্য সংঘর্ষণ হইয়া প্রজাগণের সম্পত্তিনাশ ও জীবননাশ হয়। সমাজ-রাজ্যে সামাজিক শাসনেরই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য করা উচিত আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য থাকা উচিত আমাদের এ-ক্ষেপে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইতেছে। কিন্তু এ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারিলে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা অপেক্ষা-

কৃত সহজ হইয়া আসিবে। আমরা সদা সর্বদা “আমি” “তুমি” “সে” এই কথাগুলির ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং আমরা মনে করি যে এই কথাগুলির অর্থ আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝি। কিন্তু আমিই বা কি ‘নেই’ বা কি ‘তুমি’ই বা কি এই প্রশ্ন গুলির অর্থ কে সহজ করিয়া বলিয়া দিতে পারে? আমি, তুমি ও সে ইত্যাদির সমষ্টিই সমাজ, এক্ষণে প্রশ্ন এই যে আমি তুমি ও সে লইয়াই সমাজ—না সমাজ হইতেই আমি, তুমি, সে। আমি, তুমি, সে ইত্যাদি ব্যক্তি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সমষ্টির নামই সমাজ না সমাজের বিশেষ বিশেষ অবতারই আমি, তুমি ও সে? এক কথায় ব্যক্তিও সমূহই সমাজ না সমাজের বিশেষ আকারের অস্তিত্বই ব্যক্তিও। প্রশ্ন বড় জটিল, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছি, বাহিরে, অন্ধকার দেখিয়া আমরা ভীত হইব না, সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পদবিক্ষেপ করিতে করিতে আমরা অবশেষে একটা পথ দেখিতে পাইব এরূপ আশা করা যাইতে পারে। আমি প্রথমতঃ আমার আমিও সম্বন্ধে কি জানি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক পরে ‘তুমি’ কি ‘সে’ কি ‘সমাজ’ কি তাহা বিবেচনা করা হইবে। আমি দেখিতেছি যে আমি কখনও বা সুখ অহুভব করিতেছি কখনও বা দুঃখ অহুভব করিতেছি কখনও বা আল্লাদ পাইবার আশায় আর কখনও বা কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আমি শক্তি প্রয়োগ করিতেছি।

আর কখনও বা ইঙ্গিতজাত বোধসমূহ ও তাহাদিগের কাল্পনিক প্রতিবিশ্বসমূহ হইতে জ্ঞানলাভ করিতেছি। আমার সম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা কেবল এই সকল অনুভূতি, এই সকল উদযমন, আর এই সকল জ্ঞান; আমি এইরূপ অনুমান করি যে এই সকল ঘটনার মূলে একটী অস্তিত্ব আছে, এই অস্তিত্বকে আমি “আমি” এই নাম দিই। আমি দেখি যে আমার মানসিক ঘটনা হইতে আমার কার্যের উৎপত্তি, আমি জ্ঞাতসারে যে সকল কার্য করি তাহা আমার মানসিক ঘটনার ফল মাত্র; আমি কষ্ট পাইতেছি এই কষ্টরূপ মানসিক ঘটনা হইতে উহার নিরাকরণো পযোগী কার্য্য সংসারে আবির্ভূত হইল। আমার কার্য্য সমূহ আমার মানসিক ঘটনা সমূহের চিহ্ন, আর এই সকল মানসিক ঘটনা হইতেই আমি আমার অস্তিত্ব প্রস্তাব করি। আমি যখন অন্য কোন পাত্রের আমার ন্যায় কার্য্য দেখি আর যখন দেখি যে সে কার্য্য আমার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না তখন আমি এই মনে করি যে তাহার অপর পার্শ্বে মানসিক ঘটনা আছে আর ঐ মানসিক ঘটনার মূলে অস্তিত্ব আছে। এই অস্তিত্বকে আমি অবস্থাভেদে কখন বা “তুমি” কখনও বা “সে” বলি। এইরূপে আমি আমার ন্যায় কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব প্রস্তাব করি, এই সকল অস্তিত্বকে আমি আমার চতুর্দিশার্ধ ব্যক্তি সমূহ বলি; আমি ও আমার চতুর্দিশার্ধ ব্যক্তিগুলিকে লইয়া আমার

সমাজ গঠিত। অতএব এই পক্ষে দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিসমূহই সমাজ, সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্তি প্রধান বিষয়, কারণ ব্যক্তি হইতেই সমাজ গঠিত। আবার অপর পক্ষে দেখা যাউক ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সামাজিক অস্তিত্বের প্রতি নির্ভর করে কি না। সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বারি-বিন্দু লইয়াই সমুদ্র; আবার সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বারিবিন্দুসমূহ সমুদ্রের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ; সমুদ্রের প্রত্যেক বারিবিন্দু হইতে সমুদ্র সমুদ্রের গুণাগুণ অবগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সমুদ্র ও সমুদ্রস্থ প্রত্যেক বারিবিন্দুর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, সমাজ ও সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেও সেই রূপ সম্বন্ধ। সত্য বটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লইয়াই সমাজ—আবার ইহাও সত্য যে সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি সমুদ্র সমাজের প্রতিকার্য্য মাত্র। সাধারণ দৃষ্টিতে তুমি ‘আমি’ ‘সে’ ইহারা ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু জানো ব্যক্তির স্বল্প দৃষ্টিতে ইহারা সকলেই একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবতারণা, এক শাখারই ভিন্ন ভিন্ন কুসুম, এক বৃক্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন ফল।

আমাদিগের সমাজ যে সকল বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত, আমাদিগের সমাজ যেদেশ যে জলবায়ু ও ঋতুসমূহের মধ্যে অবস্থিত, যে রূপ আচার ব্যবহার, ও যে রূপ নীতি দ্বারা পরিচালিত, ‘তুমি’ ‘আমি’ ‘সে’ আমরা সকলেই সেই সমুদ্র বিষয় হইতে উদ্ভূত। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে

অতি গুঢ় নৈকট্য সম্বন্ধ ; ব্যক্তি সমূহ লই- রেরও অমঙ্গল হয় ; একটি স্তরে যেন দুইটি
 যাই সমাজ, সমাজের অবতারণা ব্যক্তি। তার বাঁধা, একটি বেহুঁরো হইলে আর
 এই দুয়ের মধ্যে একের মঙ্গল হইলে অপ- একটিকেও যেন বেহুঁরো হইতে হইবে।
 রের মঙ্গল হয়, একের অমঙ্গল হইলে অপ- ক্রমঃ

হুগলীর ইমাম বাড়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

দেড়শত বৎসরেরও আগেকার কথা
 হইতেছে, এই সময় কোথা হইতে কেখানে
 এক সন্ন্যাসী আসিয়া হুগলী নগরে আবির্ভাব
 হইয়াছেন, ইহার নাকি অলৌকিক ক্রমতা,
 ইহার কৃপায় নাকি অন্ধে আঁখি পায়, বঞ্জ
 আরোগ্য হয়, ইহার আশীর্বাদে নাকি
 দুঃখ ক্লেশ দূরে চলিয়া যায়। লোকেরা
 ইহা কেমন করিয়া জানিল তাহা বলিতে
 পারি না, সত্য সত্য কোন কানো খোড়াকে
 তাহারা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছে কিনা
 কেমনে, কিন্তু চারিদিকে এইরূপ ত এক
 মহা গুজব উঠিয়াছে; হিন্দুরা তাহাকে মহা-
 প্রভু বলিয়া প্রণাম করিতেছে, মুসলমানেরা
 পীর বলিয়া পূজা দিতে যাইতেছে, ইহার
 কাছে হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে।
 সন্ন্যাসী সবে দুই চারি দিন আসিয়াছেন,
 দুই চারি দিন হইতে গঙ্গার ঘাটে, লোকে
 লোকারণ্য, কানো খোড়া, দীন দুঃখীর ভ
 কথাই নাই, কত ধনী, ক্রমতাশালী, ভাগ্য-
 বান তাহার দর্শন জন্য লালায়িত। তাহাকে

দেখিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত
 কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া থাকে,
 রাজ দর্শনেও বৃষ্টি এত লোকের সমাগম
 হয় না। আজও প্রত্যুষে নদীতীরের রাস্তায়
 লোক ধরিতেছে না, পঙ্গপালের মত কাঁকে
 কাঁকে দলে দলে লোক জমিয়া সন্ন্যাসী
 দর্শনে চলিয়াছে। সেই সময় সেই জন-
 তাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া একখানি
 বস্ত্রাবরিত শিবিকা স্বন্ধে করিয়া সুসজ্জিত

• গত পৌষ মাসের ভারতীতে প্রকা-
 শিত হুগলীর ইমাম বাড়ীর প্রথম দুইটি
 পরিচ্ছেদে, একটি বড় ভুল হইয়া গিয়াছে।
 ইহার নাম মহম্মদ মসীন হওয়া উচিত—
 তাহার অন্য নাম হইয়া, আর এক জন
 উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাতে
 পাঠকদিগের নিঃসৃত লাভিশয় লজ্জিত ও
 অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। এই ভুল
 শোধরাইবার জন্য ভারতীতে সেই দুইটি
 পরিচ্ছেদ পুনঃপ্রকাশ করা যাইতেছে।

এই সুযোগে একটি পরিচ্ছেদ নূতন
 বাড়াইয়া দিলাম।

বেশভূষাধারী বাহকগণ মহা প্রতাপভরে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে আট জন প্রহরী, তাহারাও মহানস্ত্রে হুকার ছাড়িয়া নিবপেক্ষ ভাবে আশে পাশের ভীক লোকদিগের উপর আপনাদিগের উদার যষ্টির করুণা বিস্তরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এতখানি করিবার যে বিশেষ আবশ্যক পড়িয়াছিল তাহা নহে, পালকিখানি কাছে আসিতে না আসিতে পথের লোকেরা আপনা হইতেই মহা ক্রান্তে ভয়ে ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। তবু সকলের অদৃষ্টে রেহাট ঘটিতে ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার এই সময় এক জন বুদ্ধা আসিয়া পালকীর সমুখ দিয়া রাস্তা পার হইতে চেষ্টা করিল, সে সম্রাস্তা দর্শনে যাইবে, ঘুরিয়া গেলে বিলম্ব হইয়া যায়—পালকীর কাছ দিয়াই সে ছুটিয়া যাইতে চাহে। ক্রুদ্ধ প্রহরী ভীমবলে বুদ্ধার হস্তধারণ করিয়া সেখান হইতে সরাইয়া দিল। বুদ্ধা আবার সরিয়া আসিয়া অতি কাতরে কাঁদিয়া “বলিল বাবা গো হোরা ছেড়ে দে, আমার ছেলে বাঁচে না, সম্রাস্তার পায়ের ধূলা আনতে যাচ্ছি, বাবা ছেড়ে দে” দুর্বল বুদ্ধা প্রাণের দায়ে সেই ভীমবল প্রহরীর হস্তকে তাক্ষিল্য করিয়া যাইবার জন্য যুঝাযুঝি করিতে লাগিল। বুদ্ধার সেই অসীম সাহস দেখিয়া অন্য লোকে শুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে সেই একজন অবলা রমণীকে পরা-জয় করিলে আট জন প্রহরী তাহার উপর আসিয়া পড়িল

একজন তরুণ যুবক আসিয়া বুড়িকে আশ্রয় দিয়া সমুখের প্রহরীকে পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন! “অবে কাপুরুষ, একজন বুদ্ধা নারীকে মারিয়া তোমাদের বীরত্ব,—এস বাছা এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে পছড়িয়া দিয়া আসি।”

যুবকের সেই তেজস্বী বীর মূর্তি দেখিয়া প্রহরীগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাহার দৌট দৃষ্টিতে যেন তাহাদের মত সহস্র প্রহরী ভয় হইয়া যাইবে, তাহার বাজর স্পর্শে যেন সহস্র ভরবান বিফল হইয়া পড়িবে। প্রহরীদের তরুণ গর্জনে মুহূর্তেই মধ্যে নিস্তদ্ধ হইয়া পড়িল, সিংহের নিকট মেঘের ন্যায় তাহারা বলহীন হইয়া নিস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক বুড়ির হাত ধরিয়া অনাথানে সেইখান দিয়া চলিয়া গেলেন, দর্শকেরা অবাক হইয়া রহিল, দু এক জন বলাবলি করিল “ধনি সাহস বলতে হবে—নবাব খাঁ জাহাঁব লোককে হারালে গো”। যুবক বুদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া এক জন খোঁড়া বলিল “বাবা গো আমার লাঠি গাছটি এক হুটে ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল—আমার হাতটি ধর বাবা, একবার প্রভু দর্শনে যাই।” একজন অন্ধ সে কথা শুনিয়া বলিল “কে তুমি গো জয় হোক, অন্ধ ভ্রাতৃকে ধর, কত কষ্টে আসিয়াছি বাবা, আর বুঝ পোছান হয় না।” একটা ছোট ছেলে যে অন্ধের হাত ধরিয়া আনিতেছিল বুদ্ধার গহিত প্রহরীর গুণগোল আরম্ভ হইতেই সে অন্ধের হাত ছাড়িয়া সেখানে দেখিতে ছুটিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আগে নাই, হয়ত

ভিড়ে লুকাইয়া পড়িয়াছে। যুবক তাহাদের নিকটে আসিয়া খোঁড়াকে কাঁধ ধরিতে বলিলেন— গোঁড়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার স্কন্ধ ধরিল, তিনি এক পাশে বুড়িকে লইয়া আর এক হাতে অন্ধের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া এক অপূর্ণ দৃশ্য দেখিলেন, এক স্থির নিশ্চল, দেবোপম কাস্তিসম্পন্ন পুরুষ রক্তকে গজ্জার ঘাটে একটি গাছের তলায় পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ইহার বেশভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীর মত নহে, এবং বেশ দেখিয়া হিন্দু কি মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যুবক তাহাকে স্বজাতি বলিয়াই স্থির করিলেন। সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় ইহার দেহ অনাবরিত নহে, এক টিলা অঙ্গবরণে গলদেশ হইতে পদ পর্যন্ত ইহার আচ্ছাদিত। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা কিম্বা ফটিক মালা কিছুই নাই, মুখমণ্ডল ভয় কিম্বা চন্দন চর্চিত নহে, পৃষ্ঠ-লম্বিত কেশ জটা, ও আবক্ষ বিস্তৃত অক্ষরাশি মাত্র তাঁহার শুভ্রশ্বেত অসামান্য জ্যোতি সম্পন্ন প্রশান্ত-গম্ভীর সহাসমুখের শোভা বর্ধন করিতেছে। কত শত সহস্র অনাথা, দীন দুঃখী, রোগ শোক, পাপ ভাপ, হুঃখ জালা হইতে মুক্ত হইবার কামনায় তাঁহার চরণ তলে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাহাকেও ঐশ্বর্য দিতেছেন, কেহ বা তাঁহার পবিত্র হস্তস্পর্শে মাত্র শান্তিলাভ করিতেছে। যাহার রোগ শোক প্রতিকার করা তাঁহার লাভ্যাতীত তাহাকেও এমন মেহের বাক্যে

দৈবরে নির্ভর করিতে শিখাইতেছেন যে সেও শান্তি স্নান অনুভব করিতেছে। এইরূপে কত নিরাশ হৃদয় আশা পূর্ণ হইতেছে—কত রোগী, পাপী, ভাপী, দীন, দুঃখীর বিষন্নমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। যুবক এমন দৃশ্য কখনও দেখেন নাই, শত শত লোকের স্নেহে তাহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তিনি পূর্ণ হৃদয়ে অভিভূত চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভক্তি উৎখলিত হৃদয়ে সন্ন্যাসীর শাস্ত্র গম্ভীর দেবশ্রীপূর্ণ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে বেলা অধিক হইল, দ্বিপ্রহরের বড় বিলম্ব নাই সন্ন্যাসীর ধানের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি গৃহে গমন করিবেন। ভাড়া কিছু কমিতে লাগিল, যাহারা অনেকক্ষণ আসিয়াছে তাহারা চলিয়া গেল, নবাগতেরা কেবল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্ন্যাসীর অপূর্ণ জ্যোতিশালী নয়নের দৃষ্টি তখন যুবকের উপর পতিত হইল—যুবক বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—“বৎস আমার সঙ্গে আইস” সে স্বর বতদূর গেল যেন শান্তি ঢালিয়া দিল। সন্ন্যাসী অগ্রগামী হইলে যুবক তাহার অনুসরণ করিয়া দুই জনে গঙ্গা তীরে একটি ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যুবকের নিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, নীহারমণ্ডিত মহান পুরুষ শিখরে চন্দ্র কিরণের ন্যায়, দিব্য মুহূর্ত্তে আপনাবিষমপ্রশান্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করি

১ “যেই বীর দে

দুর্ব্বলের রক্ষক, সেই পুরুষ, যে অসহায়ের সহায়, সেই মহাত্মা যে অত্যাচারের নিবারণক, আইস আমরা আলিঙ্গন করি, আজ হইতে তুমি আমার শিষ্য হইলে।” সন্ন্যাসী যুবককে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্শ কি পবিত্র, কি স্মরণজনক, তাহাতে যেন যুবকের মোহ হঠাৎ দূরে গেল, দিব্য-চক্ষু খুলিয়া দিল—কি এক দিব্য স্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল, যেন এই মহাপুরুষের পবিত্র মূর্ত্তি তিনি আজীবন দেখিয়া আসিতেছেন, কত নিস্তক গভীর রজনীতে, হৃৎকথাপে জরজর হইয়া যখন চারিদিক শূন্য দেখিয়াছেন, ঐ মহাপুরুষ অমৃতময় বাক্যে যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, কতবার যখন মোহের ছলনে অশান্তির তরঙ্গময় স্রোতে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যেন ঐ দিব্য মূর্ত্তি দেখা দিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। জাগন্তে, স্বপ্নে, স্মৃতিতে, ঐ এক মূর্ত্তি—ঐ এক দিব্য ছবি কতবার কতবার যেন—তাহার চোখের সমুখে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। যুবক পুলকে, বিশ্বাসে নিস্তকে তাহাকে অভিবাদন করিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাহাকে নিকটে বসিতে অহুমতি দিয়া আপনি একটি ব্যাজ-চন্দ্রের উপর বসিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইলে তেমনি সহাস আননে বলিলেন—‘বৎস, আমরা আপনাকে শিষ্য বাছিয়া লইয়া থাকি, উপযুক্ত হইলে গুরুর অন্য লাগায়িত হইতে হয় না, শিষ্য গৃহীত হইলে গুরুর কার্য্য তাহাকে শিক্ষা দান করা, শিষ্যের কার্য্য

শিক্ষার বিষয় মনোনীত করা। কোন শাস্ত্রে বৃত্তপত্তি লাভ করিতে তোমার অভিলাষ কোন বিদ্যায় পণ্ডিত হইতে তোমার আকাঙ্ক্ষা বৎস ?

যুবক অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে বলিলেন—দেব, যখন অহুমতি পাইয়াছি—তখন আমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিব—শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিতে আমি দাক্ষণ পিপাসিত, কিন্তু আজ আপনার যে বিদ্যা দেখিয়াছি—তাহার নিকট শাস্ত্র জ্ঞান অতি তুচ্ছ, প্রভু সর্ব্ব প্রথমে তাহা শিক্ষা করাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন—‘বৎস—ঠিক বলিয়াছ, শিক্ষা দ্বারা শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করায় তোমার আবশ্যক কি ? সে জ্ঞান তোমাতে স্বতঃই বর্ত্তমান। যাহার হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, যাহার ধর্মে বিধর্মে দ্বন্দ্ব নাই, যাহার প্রাণ আত্মপর সমান করিতে চায়, সে, সকল শাস্ত্রের অতীত, বেদ কোরাণ আর তাহাকে কি শিক্ষা দিতে পারে ? আর আমিই বা তবে তাহাকে কি শিখাইতে পারি। তুমি কি তবে জ্ঞান ছাড়িয়া স্মৃতিশাস্ত্রি লাভের বিদ্যা অধিকার করিতে চাও ? সত্য বটে তাহা শাস্ত্রের অতীত, পণ্ডিত হইলেই সকলের স্মৃতি শাস্ত্রি মিলে না, স্মৃতি শাস্ত্রির অন্যরূপ সাধনা করাচাই।’

সন্ন্যাসীর প্রশংসায় যুবক স্তান হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন এই পরীক্ষায় তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে,—সে কথায় কোন উল্লেখ না করিয়াবীরে বীরে বলিলেন—‘না

প্রভু আমি নিজের সুখশান্তি লাভের বিদ্যা চাহিতেছি না, আর অধিক কি বলিব ?”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“ধর্মই সকল সুখের মূল, পুণাই সকল শাস্তির আশ্রয়, আর ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম ও পুণ্যের উদ্ভেদক, তোমার এ সকলি আছে, এবিদ্যা তোমার আবশ্যকই বা কি ? তুমি কি তবে বৎস প্রকৃতিকে হস্তগত করিতে চাও ? প্রকৃতি বেশে আনিয়া তুমি কি দেবতুল্য অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে চাও ?”

যুবক অধোবদনে বলিলেন, “না গুরু আপনি জ্ঞানেন তাহা বলিতেছি না।”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“আমি জানি বটে সত্যই যাহার ব্রত, দীনেতে যাহার দয়া, কাম ক্রোধ যাহার বশীভূত, তাহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে—তাহার পক্ষে প্রকৃতি জয় করা অতি সামান্য কথা। বল বৎস তবে তুমি কি শিখিতেচাও, আমি বুঝিতে পারিলাম না ?” যুবক বুঝিলেন পরীক্ষা শেষ হইল, তিনি সাহসী-হৃদয়ে সবলকণ্ঠে বলিলেন—“যে বিদ্যার অঙ্গুত বলে আজ আপনি দীন হুংখীর অশ্রুজল মুছাইয়া তিন লোক মুক্ত করিয়াছেন, পরকে সুখী করিবার সেই বিদ্যা আমাকে কৃপা করিয়া দান করুন। চিরদিন ধরিয়া এই এক ইচ্ছা, এই এক আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণের মধ্যে আগিয়া আছে। অন্যের কষ্ট দেখিলে যখন আকূল হৃদয়ে তাহা উপশম করিতে বাঞ্ছা হইবে কেন প্রভু জাহাতে সকল হইতে পারি না ? আমি আর কিছু চাহি না, এই বিদ্যা

আমাকে দান করুন” রোমাঞ্চিত শরীরে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রাণ ভরিয়া যুবাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “আমি তোমাকে যত দূর উচ্চ, ভাবিয়াছিলাম, তুমি তাহা হইতেও উচ্চ। এ পর্যন্ত একরূপ বিদ্যা আমার কাছে কেহ শিখিতে চাহে নাই। হউক, তাহাই হউক, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমার প্রেমের অনন্ত ধারে পাপী ভাপা স্মৃশীতল হইবে। কিন্তু একেবারেই কোন কন্মে অসিদ্ধ হওয়া যায় না। আত্ম পর না মানিয়া ভাল বাসিতে আরম্ভ কর, ক্রমেই এই ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে থাক, ক্রমে যখন অভ্যাগে অভ্যাগে বিনা চেষ্টায় এই ভালবাসা অব্যাহত বেগে অহ-নিশি স্বতঃ উৎসারিত হইবে, যখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অনন্ত প্রেমকে ধরিতে পারিবে—যখন সেই ভালবাসায় স্বার্থের বিন্দুমাত্র থাকিবে না, তখনই অসিদ্ধ হইবে এখন নহে। যাও বৎস গৃহে গিয়া ইহার সাধনা কর,”

আনন্দের উচ্ছ্বাসে, যুবক হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি এত আনন্দ বুঝি কখনও পূর্বে অনুভব করেন নাই—যুবক কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন “আবার কবে আসিব” সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আর আসিতে হইবে না, যদি প্রয়োজন হয় আমাকে দেখিতে পাইবে”—বলিয়া অতি মিত্র হৃদয় কটাক্ষে যুবকের প্রতি চাহিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, যুবক দেহ সবল হইল, প্রাণ তেজস্বী হইল, হৃদয়

জুড়াইয়া গেল, ভক্তিতরে অভিবাদন পূর্বক
সেগান হইতে যুবা চলিয়া গেলেন।

পরদিন আর সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে
পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছবি।

যেদিনের কথা হইতেছে, সেই দিন
বিশ্রহরের পর নৌকা হইতে হুগলি সহ-
রের দিকে চাহিয়া দেখ—বস্পূর্ণ নূতন দৃশ্য
দেখিতে পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ গ্রহরীর
নায় শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি
সারি বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাইতে
ছেনা, প্রাসাদের আশে পাশে, ছোট বড়
গাছ গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে
সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানি-
কটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশি
জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি
করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত
হইয়া লতায় অটাজুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া
পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত
খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা
যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত,
আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট
ছোট পাতার কুটির গুলি উইচিবির মত
প্রকাশ পাইতেছে। কোথায় বা এক একটি
বড় বড় বট অশ্বখের রাশি রাশি পাতারফাঁক
দিয়া এক একটি পুরাতন ইষ্টক নিশ্চিত
বাড়ী অতি ধীন ধীন ভাবে উঁকি মারি
ছেছে, আকার কোথায় বা উপকূল ঘোড়া

এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টা-
লিকা, চারিদিকের ছোট কুটিরদিগকে
অবজ্ঞা করিয়া, আশে পাশের বড় বড় গাছ
গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া
সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর
এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি
ছোট সুন্দর মুখ কুটিয়া তাহার মধুররূপে
উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো কুটা-
ইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া
কি স্নেহের কাজ করিতেছিলেন, কাজ ক-
রিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুকি
ক্লাস্ত হইল, আনত মুণাল কণ্ঠ, বুকি বাথিত
হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি
নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের
স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে
একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির
বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে
কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আ-
লিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে
দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে,
একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে।
যুবতীর হৃদয়েও বহুস্ত চিন্তা আসিয়া নেই—
মেঘ পুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল।
এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে
আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল। মুন্না
চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি
আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্তের মধ্যে
আনন্দ হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, ‘বুকি-
য়াছি মসীন, চোখ ছাড়’ মসীনও হাসিয়া
চোখ চাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি

ছবি ধরিয়া বলিলেন, “কেমন বল দেখি” এইখানে ছবির কথা একটু বলিয়া লই। মহম্মদ মসীন সয়াসীর নিকট হইতে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসেন, পথে একজন ছবি-বিক্রিওয়ালা তাঁহাকে মহা দরিয়া পড়িল, তাঁহার ছবি কিনিবার কোনই ইচ্ছা কিম্বা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু যখন ছবিবিক্রি-ওয়ালা একখানি ছবির দুই টাকা দাম চাহিয়া শুক মুখে মিনতি করিয়া বলিল “মহাশয় গো সমস্ত বেলায় আজ একখানি ছবি বিক্রি করতে পারিনি, এখন যদি কিছু পাই তবেই ছেলে গুলো খেতে পাবে” তখন মসীন আর একটি কথা না কহিয়া দুই টাকার স্থলে দশটি টাকা দিয়া ছবিখানি তুলিয়া লইলেন। ছবিওয়ালা অবাক হইয়া রহিল।

ভ্রাতার হাত, হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিল। নামেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইহারা হিন্দু নহেন। মহম্মদ মসীন ও মুন্না দুজনে ভ্রাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহেন। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান মসীন। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। মসীন ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকিতেন, উহারা দুইজনে প্রায় সম-বয়স্ক বলিলেই হয়, দু-এক বছরের মাত্র ছোট বড়, সেই জন্য উহাদের মধ্যে মান্যের ব্যবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহারা পর-স্পরকে ভাল বাসেন। মসীন ষাটবৎসর বয়স হুবক, উন্নত ললাট পূর্ণায়তন নয়ন

উদার ভাবজ্যোতি পূর্ণ; নবীন শর-শোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অপচ সে তেজ, অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত, প্রশস্ত বক্ষ শালী স্তম্ভন বলিষ্ঠ দেহ, যেন শত শত দুর্জলের আশ্রয় নিকেতন। তাঁহার সেই স্নেহানুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্জল মুন্না কে তিনি যেন অতি গভীর রক্ষা করিতে চান।

মুন্না ছবিখানি দেখা হইলে একটুখানি হাসিয়া অর্ধ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল “এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?” মসীন বলিলেন, “কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া যায় না?”

মুন্না। “এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাহা জানতুম না।”

মসীন। “কেন ভাল জিনিসের কি আর দর আছে? এ পর্যন্ত তাহা দেখলুম না।”

মুন্না। “তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর।”

মসীন। “তুই ভাই আদরটা একবার দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,”

মুন্না হাসিয়া বলিল, “তোমার বেলায় ভাল জিনিসের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা।

মসীন। “বুঝি নে, এই হচ্ছে সেয়ানা লোকের কাজ,” মুন্না ছোট মাথাট নাড়িয়া, অলক গুচ্ছগুলি হলাইয়া একটু হু হু মধুর হাসিয়া বলিল--“ভূমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নীরোধ বুঝি,”

মসী।। “আনন্দেন জগতের অর্ধেক লোক
মেয়ে জাত। তাই ত তোর কাছে আগে বি-
ক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল ” বলিতে
বলিতে মসীন একটু হাসিলেন, সে হাসিতে
তাহার শুভ্র ললাটে ঈষৎ সরস বিক্রপময়
ভাবের বেন রেখা পড়িল, মুন্না বলিল,
“মরে ঘাই আর কি, উনি যা পেলেন কুড়িয়ে,
তাই আমি পরসাদ দিয়া কিনিব। এক কানা-
কড়িও না।” মসীন ছাড়নাড়িয়া বলিলেন—
তুমি কানাকড়িও দিলে না, কিন্তু এর মধ্যে
এর যে হাজার টাকা দাম উঠিয়াছে।” মুন্না
হাসিয়া বলিল, “এমন নিরর্থক কেনে?”

মসী।। “সে নিরর্থক আর কেউ না,
আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি সাদা উদ্দীন।”

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন
করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে
ক্রমে মিলাইয়া গেল। একথা শুনিলেই
মুন্নার কণ্ঠ হইবে, তাহা মসীন জানিতেন,
সেই সম্ভাবিত কণ্ঠটা উড়াইয়া দিবার
অভিপ্রায়েই প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার
ভাবে তিনি কথা পাড়িয়াছিলেন। মুন্নাকে
বিষয় দেখিয়া মসীন তামাসা রাখিয়া মুহূর্ত্ত
মধ্যে গভীর হইয়া বলিলেন, “আমি ঠাট্টা
করিতেছি না, সত্যই হাজার টাকার বিনি-
ময়ে সাদাউদ্দীন এইরূপ একখানি ছবি পাই-
য়াছেন, এরূপ করিয়া আর কদিন চলিবে,
অম — “যা সবত যায় যায়, তুমি কি
এক — “ব না।”

কহ

বলিলেন,
রিলে আমা.

কথায় সে স্বরে মসীনের সুন্দর মুখ কাল
হইয়া পড়িল, ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া
বাহির হইল—একটু পরে একটুখানি, কাষ্ঠ-
হাসি হাসিয়া মসীন বলিলেন “ধন কার?
তোমারি কি সব ধন নহে? তোমার মুখে
ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে।
সকল স্ত্রীলোকে যদি তোমার মত হইত
তবেত দেখিতেছি জগতের ধারা উলটাইয়া
যাইত”।

মুন্নার পিতার ঐর্ষ্যেই মুন্নার স্বামী
ধনী সত্য, কিন্তু মুন্না কখনো ও ভাবে তাহা
দেখে নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার
মনে হইত না, যে উহা তাহার স্বামীর নহে
মুন্নার নিজের ধন। ভ্রাতার কথায় মুন্না আ-
শ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্রুদ্ধ হইল, মুন্না বড়ই
অসন্তুষ্ট হইল। মসীন তাহা বুঝিতে পা-
রিলেন—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায়
বলিলেন “কিন্তু যার ধন সে যদি পাগল হইয়া
যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি
কেহ নিরস্ত করিবে না”—

তাত সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া
স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কত-
বার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত
করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল
হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার
ক্রক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না
কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে?
অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে
সম্মত তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই।

যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, যে নিরাশায় এগনো আশা, ভরসা দিতেছে, সে হৃদয়ে অভিমান আছে।—কিন্তু মুন্না অভিমান করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে সন্দেহে বিশ্বাসের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক দুঃখে, অধিক কষ্টে। মুন্না তাহার সমুখে যাতনার অশ্রু নদী বहाইয়াছে, তিনি একবার ভ্রক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপন্য হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মাহারা হইয়া মুমূর্ষু বাক্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেহের চক্ষে অশ্রুগ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। সেই অবধি যাতনার তীব্র অনগ্নে হৃদয় ভয়ীভূত করিলে,

হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস-গভীর নিশীথের বায়ু তরঙ্গে মুন্না মিশাইতে থাকে, উদ্ভাস্ত হৃৎকের অশ্রু লহরী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া ফেলে, তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ষ্টিভিতর স্বামীকে যে কথা কহিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে, তবে ইহাতে সন্দোচ কিসের? মুন্না তীক্ষ্ণ নিস্তেজ হৃদয় পাষণ্ড বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এ কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপন্য সর্পনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আন্তে আন্তে মণীনকে বলিল “তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব”—

রামমোহন রায় ।

সাধারণতঃ আমরা প্রতিদিন গুটিকতক করি ও ক্ষীত হইয়া তা—

আমাদের প্রতিদিন পূর্বদিনের পুনরাবৃত্তি মাঝে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন একটি ধারাবাহী উন্নতির কাহিনী নহে। সেই প্রতি দিবসের উদরপূর্তি প্রতিরাত্রের নিদ্রা—বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা ও ইহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিরই তিন শ পঁয়ষট্টিবার করিয়া পুনরাবর্তন এই ত আমাদের জীবন—ইহাতে আমাদের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না; অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের অভাব নাই বটে কিন্তু আপনাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নাই। একপ্রকার নিকৃষ্টজাতীয় জীবণ আছে সে কেবল গতিবিশেষ অবলম্বন করিয়া ঘুরিতেই জানে, সে সমস্ত জীবন একই ঘুরন ঘুরিতেছে, তাহার সহিত আমাদের বেশী প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমাদের আর্থিক গতি আছে বার্ষিক গতি নাই—আমরা নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছি নিজের নাভিকূণ প্রদক্ষিণ করিতেছি কিন্তু অনন্ত জীবনের কক্ষপথে এক পা অগ্রসর হইতেছি না। এই পরম কোতুকাবহ আত্ম-প্রদক্ষিণ-দৃশ্য চতুর্দিকে দেখা যাইতেছে—সকলে মাটির উপরে বিন্দুমাত্র চিহ্ন রচনা করিয়া লাটিমের ন্যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমির মধ্যেই জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রমণ নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। প্রতিদিন চারিদিকে ইহাই দেখিয়া মনুষ্যের উপরে আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া অমূল্যত্বের মনুষ্যের গুরুতর কর্তব্য একমুহুরি করিবার বল চলিয়া যায়। এই জন্য আমাদের প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা বলিলেন, নিঃসন্দেহ আবশ্যক।) মহাত্মাদের রিলে আমাদেবচনা করিলে মনুষ্য যে কি

তাহা বুঝিতে পারি, “আমরা মানুষ” বলিলে যে কতখানি বলা হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি, জানিতে পারি যে আমরা কেবল অস্থিচক্ষুনির্মিত একটা আহার করিবার যন্ত্র মাত্র নই, আমাদের স্মরণ্য কুল-মর্যাদার খবর পাইয়া থাকি। আমরা যে আমাদের চেয়ে ঢের বড়, অর্থাৎ মনুষ্য, সাধারণ-মানুষদের চেয়ে যে অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ইহাই মনের মধ্যে অনুভব করিলে তবে আমাদের মাথা ভুলিতে ইচ্ছা করে মৃত্তিকার আকর্ষণ হ্রাস হইয়া যায়।

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায় তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্য সকল দেখিয়া কেবলমাত্র সজ্জমমিশ্রিত বিশ্বাসের উদ্বেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদের যতই “আমার” মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্বেক হয় ততই তাঁহাদের কথা তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। তাঁহাদের লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদের শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদের “আমার” বলিয়া মনে করি। এই জন্য তাঁহাদের মহত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শ্রিত যেমন

মহত্ম বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিষ্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন “মিষ্টন, আহা তুমি যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতে। তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।” যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুগ্ধ চাহিবে, তাহার কি হৃদশা! কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও যে জাতি কল্পনার জড়তা হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ তাহার মহত্ব কোনমতে অনুভব করিতে পারে না তাহার কি হুর্ভাগ্য!

আমাদের কি হুর্ভাগ্য! আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে নিজেকে মন্তলোক মনে করিয়া নিজের পায়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছি, বাষ্পের প্রভাবে ক্ষীত হইয়া লঘু হৃদয়কে লঘুতর করিয়া তুলিতেছি। প্রতিদিনকার ছোট-ছোট মন্তলোকদিগকে, বঙ্গসমাজের বড় বড় ষশ-বৃদ্ধদিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মত পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ব পূজার স্থা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অহঙ্করণে কথার

কথায় সভা ডাকিয়া টাকা তুলিয়া মহত্ব-পূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি। এজলাষ হইতে জেম্‌স্‌ সাহেব চলিয়া গেলে হাটে তাহার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখি, জেম্‌স্‌ সাহেব আসিলে তাহার পায়ে পুষ্পমালা দিই। অর্থের বিনয়ের উদারতার অভাব দেখিতে পাই না; কেবল আমাদের যথার্থ স্বদেশীয় মহাপুরুষকেই হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মান করিবার ভার বিদেশীদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বসিয়া রহিয়াছি ও প্রতিদিন তিনবেলা তিনটে করিয়া নূতন নূতন মূর্ত্তপ্রতিমা নিম্নাণে নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া আছি।

✓ বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহনরায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাদী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নিশ্চিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে। আমাদেরিগকে যদি কেহ বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব রামমোহন রায় বাঙ্গালী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার আর একটি গুরুতর আবশ্যক আছে। (আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।) আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি “রামমোহন রায়, আহা তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গ-

দেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাকুশট্ট লোক—আমাদিগকে ভূমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মভরী—আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রথর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের গন্ধে ঘাড়া স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।)

রামমোহনরায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্ভা রসনার এত ত্রিযুদ্ধ হয় নাই সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আরেকটা কথা দেখিতে হইবে। একেকটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায় কাজের হাট বসিয়া যায়, অনেক মিলিয়া হোহা করিয়া একটা কাজের কারখানা বসাইয়া দেন, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যভঙ্গর নাট্যরঙ্গ জমাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষতঃ একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিম্বত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজের মত্ততা অস্থি ছিল না, অভ্যন্তর ব্যস্ত-সমস্ত হইবার ইচ্ছাশক্তি করিবার আনন্দ ছিল না, একাকী অপ্রমত্ত থাকিয়া ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন স্নগ-ভীর লবুদের মতো যেমন নীরবে অতি

ধীরে ধীরে দীপ নির্ধিত হইয়া উঠে, তাহার সন্ধান তেমনি অবিভ্রম নীরবে সুধীরে তাহার গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য আকারে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিত। ব্যস্ত-সমস্ত চটুল স্রোত-স্রোতে যেমন দেখিতে দেখিতে আঁধা চড়া পড়ে কাল ভাঙ্গিয়া যায়, —সেরূপ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কাজ যত না হউক খেলা অতি চমৎকার হয়,—তাঁহাদের সে কালে সেরূপ ছিল না। মহত্বের প্রভাবে হৃদয়ের অমুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোন প্রবর্তনাই তখন বর্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। রামমোহনরায়ের যশের প্রলেভন কিছু-মাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোন কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দামানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবি-শ্রাম বর্ধিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্বের মধোই তাঁহার হৃদয়ের ক্রিয় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য স্নগভীর প্রেম ছিল। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই; তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্ম-স্থলের সহিত আপনার সৃষ্টি যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদে-

শীঘ্র শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই । এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন । তিনি কি না করিয়াছিলেন ? শিক্ষা বল, রাষ্ট্রনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ? কোন্ কাজটাই বা তিনি কাঁকি দিয়াছিলেন ? বঙ্গবন্দোজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিষ্কৃততর হইয়া উঠিতেছে মাত্র । বঙ্গসমাজের সর্বত্রই তাঁহার অরণ্যস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে ; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বোজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহার বৃক্ষ হইয়া শাখা-প্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে । তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না ?

তিনি বাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ব প্রকাশ পায়, আবার তিনি বাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ব আরও প্রকাশ পায় । তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুই মধ্যে তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন নাই । তিনি যে আত্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন । তিনি যে সময়ে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছিলেন চেষ্টা করিলে একাদশ অবতারের পদ সহজে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন । তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম বানাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া পুৰাতন ধর্ম প্রচার করিলেন । তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া তিনি প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন । তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন । একপ আত্মবিলোপ এখনত দেখা যায় না । বড়-বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিদ্রের নামস্থখা পান করতঃ এক প্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষক পণ্য দ্রব্য হইয়া উঠে, ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুচ্ছ নামটা বিলাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তাণি করিবার সরঞ্জাম করি । স্তুতি কোলাহল ও দলহ লোকের অবিশ্রাম একমস্ত্রোচ্চারণ শব্দে বিভ্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোন বিষয়ের যথার্থ ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না ততটাই ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিহুংবেগে উল্লসিত পথে অগ্রসর হইতেছি ।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্বদা ভাবিতে হয় আপনাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। বাহ্যিক মাঝারী রকমের বড় লোক, তাহারা নিজের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড় বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়। সে ইত্যন্তঃ করিতে থাকে। কথায় কথায় তাহার পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু ভাল কাজ সে করিতে পারে কিন্তু সর্বসম্মত কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য স্থাপন করে সে স্থায়ীভিত্তির উপরে নিজের মজল সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্যের প্রতিষ্ঠা করে সেও যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়, যদি বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ঘুলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও স্থিতি পায় না। রামমোহন

রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের হাতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাহার সেই ইচ্ছা বস্তু ভিত্তি-তিনি বঙ্গসমাজের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি লঘু আত্মাই প্রবাহে ভাসিয়া উঠে ভাসিয়া যায়। বাহ্যিক আত্মার গৌরব আছে তিনিই প্রবাহে আত্মসম্মরণ করিতে পারেন। রামমোহন রায়ের এই আত্মধারণশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাহার অন্তরে বাহিরে কি সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহা নিশীথিনীকে মুহূর্তে দৃষ্ট করিয়া ফেলিয়া তাহার হৃদয়ে প্রথর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাহাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। সে ভেদ সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকার অজ্ঞারের খণিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কি কাণ্ডই উপস্থিত হয় ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহস্র জ্ঞানের নুতন উচ্ছ্বাস কয়জন ব্যক্তি সহজে ধারণ করিতে পারে? কোন বালক তাহা পারেই না। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত

মহৎ হিঁসন এই অন্য এই জ্ঞানের বনায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল, এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাৎস্য তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে প্রচলিত হইবে তাহা নির্দেশ করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্য রাখা যায় কি? আত্মিক কালে আমরাও ধৈর্য্য কাহাকে বলে জানি না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ততপ্রমাণ স্বপাকার ভয়ের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুঁ দিয়া দিয়া তাহাকেই প্রজ্জ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশলাই কাঠি জ্বালাইয়া যাজ্জগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন ভয়ের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে সে আর নিভিবে না। এত বল এত ধৈর্য্য নাহিলে তিনি রাজ্য কিসের? দিল্লির সম্রাট তাঁহাকে রাজ্যোপাধি দিয়াছেন কিন্তু দিল্লির সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজ্য করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষে বঙ্গসম্রাজের মধ্যে তিনি তাঁহার রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে আমরা কি তাঁহাকে সম্মান করিব না?

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কাল-রাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মারাবী

রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই। কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাই তাহাদের বল। আতবড় ভীষণ প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাদিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুক পত্রের শব্দ একটি ভূয়ের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নির্ভর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দল্ভভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিকৃপায় যেমন অসহায় এমন আর কোথায়! রামমোহনরায় যখন আগ্রত হইয়া বঙ্গসম্রাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসম্রাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন অশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল তাহার জীবন নাই অস্তিত্ব নাই কেবল অহুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে অশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে মাঠে: শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়ত ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্প বধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি বাসুসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দেশ্য অমঙ্গলের

আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে।

রামমোহনরায়ের সময়ে হিন্দু-

ভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সশস্ত্র বাস্তব-অমল

রোস্তর পরিবর্তমান বংশপরম্প-

প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে

শূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন-

রায় সমাজকে এই সশস্ত্র নাগপাশ বন্ধন

হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হই-

লেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অল্পরাগ-

বন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এই

জন্ম সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্তনাদ করিয়া

রামমোহনরায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল।

আজি আমাদের বালকেরাও সেই সকল

মৃতসপের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে,

আমরা তাহাদিগকে নির্দ্বিধ চোঁড়া সাপ

ধালিয়া উৎসাহ করি—তাহাদের অবিদ্যাপ্রতাপ,

ইহাদের চাক্ষুর মোহ আকর্ষণ, ইহাদের

হৃদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের কথা

আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্গুর করিতে আরম্ভ করিলে

একটা নেষা চড়িয়া যায়। স্বজনের যেমন

আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার

ভীষণ আনন্দ আছে। তাঁহারা রাজনারায়ণ

বাবুর “একাদশ সেকাল” পাঠ করিয়া-

ছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা

লাভ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রেরা যখন হিন্দু-

কালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহা-

দের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা

দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের

হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া

প্রকাশ্য পথে আত্মীয় খেলাইতেন। কঠোর

উত্থান ও নির্ভর উৎসবের কোলাহল তু-

য়া তখনকার আশান দৃশ্য তাঁহারা আরও

অগ্রসর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের

হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল কিছুই

হিন্দুসমাজের যে সকল

কঙ্কাল ও বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের

ভালরূপ সম্বন্ধে আর করিয়া শেষ ভয়মুষ্টি

গঙ্গার জলে নিঃসৃত করিয়া বিষম মনে যে

গৃহে ফিরিয়া আসিবেন প্রাচীন হিন্দু-

সমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও

শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের

অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় আশানের নর-

কপালে দিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে

উন্মত্ত হইত। সে সময়কার অবস্থা বিবে-

চনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া

যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই

ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙ্গিবার দিকে

মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বা-

ড়িয়া উঠে। সে সময়ে থানিকটা খারাপ

লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা

খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে।

কিন্তু বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয়

উচ্ছাস সর্ব প্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া

দিলেন—সেই রামমোহনরায়—তাঁহার ত

এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি ত স্থির-

চিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া-

ছিলেন। তিনি তখনকার অন্ধকার হিন্দু-

সমাজে আলোক জ্বালাইয়া দিলেন কিন্তু

চিত্তালোক ত জ্বালান নাই। ইহাই রাম-

মোহনরায়ের প্রধান মহত্ব। কেবলমাত্র

বাহ্য অস্থিষ্ঠান জীবনহীন তত্ত্বমন্ত্রের মাধ্যমে

জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার ক'লেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া ঐ ধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল, যে জড়পাষাণ স্তূপে পিষ্ট হইয়া ধর্মের হৃদয় হতাশতন হইয়াছিল। রামমোহনরায় সেই মৃতভার সেই জড়পাষাণের ভিত্তি প্রচণ্ডবলে আঘাত করিলেন, আশ্রয়মস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার বিপুলায়তন নবদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুত্বের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পুরাতন মন্দির জীবন হইয়া প্রাণের দেব-প্র-পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম, কেবল তিনা আঁচ দেখা যাইতেছিল স্তূপ উচ্চ মন্দিরকেই কাঠলোঠা পুলিস্ত পত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছেদনানি-বিধ সন্ন্যাসপগণ গুহা নিয়োগ করিতেছিল, তাহার ইতস্ততঃ প্রতিদিন বন্যাকাশীর্ণ গুল্ম সকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নুতন নুতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে ছিল। হিন্দুসমাজ এই দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পার্শ্বত প্রমাণ জড়স্তূপের তলে পড়িয়া প্রতিদিন হারা হইতেছিল। রামমোহনরায় সেই ভগ্ন মন্দির ভাঙ্গিলেন সকলে বলিল তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এই জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীবন হইয়া

১৮০০

১৮০০

হইতেছিল; ১৮০০

হইতে মাক খানে

। তিনি যে বাঁধ নি

দিলেন খ্রীষ্টিয় বিশ্বব সেখানে আদিয়া প্রতি-
হত হইয়া গেল। যে সময়ে তাঁহার মত
মহৎলোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে
হিন্দু সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্রাণ
উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা
সম্মুখে হয়ত স্নেহকটী কথা উঠিতে পারে।
ভগ্নস্তূপের মধ্যে কবিরের হৃদয়জাত যে
অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল ভগ্ন উড়াইয়া দিয়া
তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু

এত কারবার এক প্রয়োজন ছিল? তিনি
এত ভাষা জানিতেন, এত ধর্ম আলোচনা
করিয়াছিলেন, এবং সকল ধর্মের সম্ভার
প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ও অমুরাগ ছিল—তিনি
ত বিদেশ হইতে অনায়াসে ধর্মগি আহারণ
করিতে পারিতেন; তবে কেন তিনি স-
ক্লীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য সকল ধর্ম
ফেলিয়া ভারতবর্ষেই ধর্ম ভারতবর্ষে প্রতি-
ষ্ঠিত করিলেন? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞান
দর্শনের ন্যায় ধর্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের
বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অমুভব করিবার
লাভ করিবার সক্ষম করিবার বিষয় না
হইত, ধর্ম যদি গৃহের আলঙ্কারের ন্যায়
কেবল গৃহভিত্তিতে ছলাইয়া রাখিবার
সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক
ক্ষুদ্রকাণ্ডের প্রবর্তক নিবর্তক না হইত

তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত। তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম না কি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাছে ব্যবহার করিবার জন্য, দূরে রাখিবার নহে, এই জন্যই স্বদেশের ধর্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোন দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেকোন ভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতা-মহদের অনেক সাধনার ধন, সমস্ত সংসার বিপর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোন জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এই জন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে

সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার কল কি আমরা ইচ্ছা পূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না চাহিও না কিন্তু অবস্থা ও সাধনা বিশেষের গুণে ইহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মধর্ম হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষেরই নিকটে ঋণী। আমি যদি উদারতাপূর্বক বলি, ধর্মের ব্রাহ্মধর্ম আছে, মুসলমান ধর্মের ব্রাহ্মধর্ম আছে, তবে উদারতা নামক পরম শ্রুতিমধুর শব্দটার গুণে তাহা কানে খুব ভাল শুনাইতে পারে কিন্তু কথটা মিথ্যা কথা হয়। সূত্রান্ত সত্যের অনুরোধে মিথ্যা উদারতাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম ঋণীদেরই ব্রাহ্মধর্ম, সমস্ত জগতে ইহাকে প্রচার করিতে হইবে এই জন্য সর্বাপেক্ষে ভারতবর্ষে ইহাকে বিশেষরূপে রোপন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের তদারিদ্রের অভাব নাই, জীবন্ত ঈশ্বরকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ক্রমাগত হীনতার অন্ধকূপে নিমগ্ন হইতেছে, আমাদের পৈতৃক সম্পদ যে ভাণ্ডারে প্রচুর আছে রামমোহন রায় সেই ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন, আমরা কি গৌরবের সহিত মনের সাথে আমাদের দারিদ্র্য জুখ দূর করিতে পারিব। আমাদের দীনদীন জাতিকে এই একমাত্র গৌরব হইতে কোন্ নিষ্ঠুর বঞ্চিত করিতে চাহে? আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মকে পাইয়া কি আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না?

আমাদের ব্রহ্ম কি কেবলমাত্র নীরস দর্শন-
শাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি
ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মেতে
নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের
সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া
নির্মাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি
বিদেশী ধর্মে আছে, আমাদের ধর্মে নাই?
না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসোবৈ সং।
তিনি রস স্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দ-
স্বরূপ। কোহোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ
আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হেবানন্দ-
রাতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ
করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া
আনন্দ। এই জন্য পুষ্পে আনন্দ সমীরণে
আনন্দ। এই জন্য পুত্রের মুগ দেখিয়া আনন্দ,
বধূর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ
এই জন্যই আনন্দ ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি
কদাচন—এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে
না, আনন্দের অবসান থাকে না। এত পাই-
য়াও কি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে?
এমন অণীম আনন্দের আকর ঋষিরা
আবিষ্কার করিয়াছেন ও আমাদের জন্য
রাখিয়া গিয়াছেন, তবে কিসের জন্য
অন্যত্র যাইব? ঋষিদের উপার্জিত, ভারত-
বর্ষীয়দের উপার্জিত আমাদের উপার্জিত
এই আনন্দ আমরা পৃথিবীময় বিতরণ
করিব। এই জন্য রামমোহন রায় আমা-
দিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম দিয়া গিয়াছেন।
আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর
আত্মা হইতেও আত্মীয়তর এমন আর কোন
দেশের ঈশ্বর নহেন, রামমোহন রায় ঋষি-

প্রদর্শিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের
সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদেরগকেও সেই পথ
দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি স্পর্ধিত
হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিতেন তবে
আমাদেরগকে কতদূরেই ভ্রমণ করিতে হইত—
তবে আমাদের হৃদয়ের এমন অণীম পরি-
তৃপ্তি হইত না, তবে সমস্ত ভারতবাসী বি-
খান করিয়া তাঁহার সেই নূতন পথের
দিকে চাহিয়াও দেখিত না। তিনি যে ক্ষুদ্র
অভিমাণে অথবা উদারতা প্রভৃতি ছই
একটা কথার প্রলোভনে পুরাতনকে পরি-
ত্যাগ করেন নাই, এই তাঁহার প্রধান মহত্ব।

বাস্তবিক, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা
যায় জ্ঞানের কথায় আর ভাবের কথায়
একই নিয়ম খাটে না। জ্ঞানের কথাকে
ভাষান্তরিত করিলে তাহার ভেদন ক্ষতি হয়
না, কিন্তু ভাবের কথাকে ভাষা বিশেষ হ-
ইতে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভাষান্তরে
রোপন করিলে, তাহার ক্ষুণ্ণি থাকে না,
তাহার ফল হয় না ফল হয় না, সে ক্রমে
মরিয়া যায়। আমি ভারতবাসী যখন ঈশ্ব-
রকে দয়াময় বলিয়া ডাকি তখন সেই দয়া-
ময় শব্দ সমস্ত অতীত ও বর্তমান ভারত-
বাসীর বিাট হৃদয় হইতে প্রতিক্রিয়ািত হইয়া
সমস্ত ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা কুড়াইয়া লইয়া
কি সুগভীর ধ্বনিতে ঈশ্বরের নিকটে গিয়া
উথিত হয়। আর অজ্ঞান করিয়া তাঁহাকে
যদি Merciful বলিয়া ডাকি তবে Webster's Dictionary-র গোটা কতক গুণপত্রের
মধ্যে সে শব্দ মর্শ্বর করিয়া উঠে মাজ।
অতএব ভাবের দৃষ্টে সম্পূর্ণ উদারতা

থাটে না। আজকালকার অনেক ধর্ম প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে ইংরাজি "Faith" শব্দকে অনুবাদ করিয়া "বিশ্বাস" নামক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় যে হৃদয়ের অভাব-বশতঃ স্বদেশীয় ভাষার অমূল্য ভাবের ভাঙার তাঁহাদের নিকটে রুদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বাস শব্দের বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রয়োগ আছে, কিন্তু ভক্তি শব্দের স্থলে বিশ্বাস শব্দের প্রয়োগ অসহ্য। অলীক উদারতার প্রভাবে স্বদেশীয় ভাবের প্রতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি জন্মিলে এই সকল উপদ্রব ঘটয়া থাকে। আমাদের দেশে যদি সস্তা কাপড় সহজে কিনিতে পাওয়া যায় তবে তাহার উপরে মাসুল বসাইয়া সেই জিনিষটাই আর এক আকারে বিলাত হইতে আমদানি করাইলে দেশের কিরূপ ক্ষীণকি করা হয়! সর্ব সাধারণে কি সে কাপড় সহজে পরিতে পায়? এক হিসাবে বিলাতের পক্ষে উদারতা করা হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাকে প্রকৃত উদারতা বলে না! আমি নিজের গৃহ নির্মাণ করিতেছি বলিয়া কি সকলে বলিবে আমি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ পরের সহিত স্বতন্ত্র হইতেছি? স্বগৃহ না থাকিলে আমি পরকে আশ্রয় দিব কি করিয়া? রামমোহন রায় সেই স্বগৃহ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। অথচ স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পরের প্রতি তাঁহার বিশেষ ছিল না। তাঁহাকে অনুদার বলিতে চাওত বল! উদ্ভিজ্জ ও পশু মাংসের মধ্যে

যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত কবিত্তে পারি তাহার কারণ আমাদের নিজের জীবন আছে বলিয়া। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নুতন প্রাণ উপার্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদের দিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত চিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই তবে পারদীক মৃত দেহের ন্যায় আমাদের মৃত ভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন খৃষ্টধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু, তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সভ্য আশ্রয় করিতে পারিব। তাও যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সম্পূর্ণ করিতে পারিব এমন ভরসা নাই। আমাদের জঠরানলেরও যেমন এমন সার্বভৌমিক উদারতা নাই যে সমস্ত খাদ্যকে সমান পরিপাক করিতে পারে আমাদের হৃদয়েরও সেই দশা, কি করা যায় উপায় নাই। এই জন্যই বলি প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের অন্ননাম উচ্চারণ করিয়া আগে আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই তাহার পরে

সার্বভৌমিকতার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্ম ভারতবর্ষের গৃহদেবতা তিনি ভারতবর্ষের পিতা। তিনি ভারতের হৃদয়ের যত নিকটবর্তী তিনি ভারতের অভাব যত বুঝিবেন এমন আর কেহ নহে। ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা, জিহোবা গড অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশতঃ ইহা বুঝিয়াছিলেন। সক্ষীর্ণ দৃষ্টি হইলে ভারতের এ মর্যাদাসিক অভাব হয় ত তাঁহার চক্ষু পড়িত না। [তামঃ ঋষিরা

যে ব্রহ্মকে বহু সাধনা দ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমাদের হীনতা অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী অরণ্য স্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা আগে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে এক দর্শন লালদায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া ভারত ভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে ঋষিদের জয়ে সত্যের জয়ে ব্রহ্মের জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রাবলী ।

“A thing of beauty is a joy for ever” Keats.

১

কদম কাননে কে মরি! সজনি,
বাশরী বাজায় রাতে।

সুরেতে সুরেতে ছাব এক থানি
এঁকে দেয় ছদি-পাতে!
বাশরী বাজায় রাতে।

২
কি স্নরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে
চঞ্চল যমুনা-জল !
চেউয়েতে চেউয়েতে ভাঙা ভাঙা চাঁদ,
মুখে আধ' কল কল !
কূলে কূলে চল চল !

৩
কূলেতে দাঁড়ায়ে কদম তরুটি,
একটু প'ড়েছে হেলে,
ছায়াটি, জলেতে ধরিতে চাঁদেরে,
আকুলি ব্যাকুলি খেলে !

৪
পুট পুট ক'রে একটি আধটি
খসিছে পল্লব কূল।
থেকে থেকে থেকে শিহরে সমীর,
হইয়া সৌরভাকূল !

৫
কি স্নরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে—
পূর্ণিমা শরৎ-চাঁদ !
মুখেতে হাসিটি পড়িছে লুটিয়া,
চ'খে আধ' যুম-ছাঁদ !

৬
পাতলা মেঘ-গুলি, হেলি হুঁলি হুঁলি,
ভাসিয়া ভাসিয়া যায় !
ব'সে ব'সে ব'সে ছোট তারা-গুলি
আধ' যুম-ঘোরে চায় !

৭
কি স্নরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে—
কে যমুনা-জীয়ে আসি,

কদম-তলায় যোহন মুরতি
দাঁড়ায়ে, বাজায় বাঁশি !

৮
মধুর অধরে মন্দির হাসিটি,
উছলি উছলি করে !
তরল নয়নে চমক চাহনি,
চমকে গো কার তরে !

৯
ঘেরি চারিদিকে অবাক নয়নে
দাঁড়ায়ে গোপিনী-কূল।
কারো হাতে মালা, কারো বা চন্দন,
কারো বা হাতেতে ফুল !

১০
পায়ের কাছেতে প'ড়েছে শুইয়া
বিবশ্য হরিণী-কূল ;
দূরেতে কোঁচিল ডাকিছে ভুলিয়া,
খসিছে কদম-কূল !

১১
অধরের কাছে গুঞ্জে ভ্রমর ;
সমীর বহিছে দীরে ;
নাচিছে শিখিনী ছড়ায় পেগম ;
যমুনা উলি উঠিছে তীরে !

১২
তরুলতা পাতা নাচিছে মৃদল ;
জ্যোছনা প'ড়েছে শুয়ে।
প্রেমের তড়িৎ বেড়ায় গেলিয়া,
অলখিতে হৃদি ছুঁয়ে !
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে !
শ্রী অক্ষয় কুমার বড়াল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।



গৃহলক্ষ্মী । (যথা প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে যে সকল গুণ শিক্ষার আবশ্যক স্ত্রীর সহিত কথোপকথনচ্ছলে স্বামীর তদ্বিষয়ক উপদেশ) শ্রী গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত ।

পুস্তক খানির প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ গিরিজা বাবুর লেখা নহে, ইহার কোন বন্ধুর লেখা । এই তিনটি পরিচ্ছেদ বাদ দিলেই ভাল হইত, ইহাতে শিক্ষার মত কিছুই দেখিতে পাই না, কৃশিক্ষাই প্রায় সব । ভরসা করি পুনঃ মুদ্রাক্ষনের সময় লেখক একবারে এই তিনটি পরিচ্ছেদ উঠাইয়া দিবেন ।

উক্ত তিনটি পরিচ্ছেদ ছাড়া বইখানি সুন্দর হইয়াছে, ইহার উপদেশ গুলিই যে কেবল সারগর্ভ এমন নহে, নাটক্যাংশেও বইখানি প্রশংসনীয় । স্ত্রী যে কখনো একটু অভিমান করিয়া, কখনো একটু লজ্জার ভাবে স্বদয়ের প্রেম ভক্তি ঢালিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতেছেন সে কথায় রমণী-স্বদয়ের সৌন্দর্য যেমন কুটিয়াছে তাহাতে তাহার বাঙ্গালিহও তেমনি বজায় আছে,

তাহার কথা বার্তা পড়িলে-বাঙ্গালি-স্বরের মেয়ের একটি পরিষ্কৃত ছবি আমাদের চোখে পড়ে । লেখকের সহিত একটি বিষয়ে আমাদের মতের অনৈক্য হইতেছে, তিনি স্ত্রীলোকদের দগ্ধীত শিক্ষা করিতে বলেন । আমাদের দেশের মেয়েরা যে গান গাহিতে জানেন না এমন নহে, আড়াল হইতে শুনিয়া শুনিয়া, কিম্বা স্বামী ভাই প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনের কাছে শুনিয়া শুনিয়া, তাহারা আপনা হইতেই গান গাহিতে শিখেন । পাঁচ জন মেয়ে একত্র হইলে গানটা তাহাদের না গাহিলে একবারে চলে না, আর স্ত্রী গাহিতে জানিলে স্বামীর কাছে যে না গাহেন তাহাও বোধ হয় না । ইহার পর নুতন করিয়া শিক্ষার কথা বলিলে গায়কের কাছে শিক্ষা করা বুঝায়, কিন্তু সমাজের পক্ষে তাহা কতদূর উপযোগী বলিতে পারি না । বিশেষ স্বস্তুর খাণ্ডি গুরুজন এরূপ শিক্ষা কতদূর পসন্দ করিবেন সন্দেহ, স্ত্রী-ভরাং এরূপ স্থলে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে অবাধ্যতা শিক্ষা করিতে হয় ।



গৌড়গীত ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

নীলবিল বীণা, গীত থামিল লিঙ্গোব ;
 সস্তাষিল উচ্ছে লিঙ্গো রিকদ বাফসে ।
 বলিল রিকদ, “ভাল প্রত্যারিত তুমি
 কবেছ মোদিগে, এস, দেও আলিঙ্গন ।”
 আলিঙ্গিয়া বৃদ্ধে লিঙ্গো সাদরে বলিল,
 “নমি আমি খুড়া তোমা ।” হাত ধরাধরি
 বলিল উভয়ে তবে আশুনের পাশে ।
 জিজ্ঞাসিল রক্ষ “কোথা হতে বাপু তুমি,
 আসিয়াছ হেথা ?” “এসেছিল ভাই মোর
 অগ্নির উদ্দেশে হেথা, গ্রাসিতে তাহারে’
 তুমি করেছিলে তাড়া ; যদ্যপি গ্রাসিতে,
 কোথা পাইতাম তারে এজনমে পুনঃ ?”
 উত্তরিল খুড়া “হয়ে গেছে যা হবার,
 কবেছিলু ভুল, আছে কন্যা সাত মোর,
 লয়ে যাও তাহাদিগে দিহু অল্পমতি ।”
 সস্তাষি রিকদে লিঙ্গো হইয়া বিদায়,
 চলিল যথায় ছিল কন্যা সাত তার ;
 বাহিরিয়া গৃহ হতে আসি লিঙ্গো-পাশে
 প্রস্থিল সকলে তারে, “কে তুমি যুবক ?
 আসিয়াছ কোথা হতে, বলতা মোদিগে ।”
 “পিতা তোমাদের খুড়া নবদে আমায়,
 নাম মোর লিঙ্গো, ভৃত্য দ্বয়ের আমি ।
 অগ্নির উদ্দেশে আমি এসেছিহু হেথা ;
 কুখ্য পীড়িত ভাই চারি জন মোর,
 রহিয়াছে সন্নিধ্যের দ্বারে প্রত্যাশায় ।”
 “ভাই তুমি আমাদের ? উত্তর লবহ ।

কেমনে ছাড়িয়া চলি যাবে ভগ্নীদিগে ?
 লবে না মোদিগে সঙ্গে ? মোবাও যাইব ।
 “আসিবে যদ্যপি তবে এস শীঘ্র ক’বে ।”
 চলিল ভগিনী সাত লিঙ্গোর পশ্চাৎ ।
 লিঙ্গোর প্রতীক্ষা করি গোড় চারি ভাই
 আছিল বসিয়া পথ নিরীক্ষণ করি ;
 দেখি দূর হতে তাকে, বলিল সানন্দে, —
 “ভাই লিঙ্গো, আসিতেছে ;” উঠিল সকলে,
 চাহিল লিঙ্গোব দিকে, চমকি উঠিল ;
 “কে ওরা লিঙ্গোর সাথে ? স্ত্রীর উহাবা !
 কার কনাগণ সনে আসিতেছে লিঙ্গো ?
 দেয় যদি উহাদিগে, কবিব বিবাহ ।”
 সম্বোধি সকলে লিঙ্গো বলিলেন তবে, —
 “তনয়া ইহারা শুন খুড়ার আমার ;
 রাঁধিয়া যতনে সেবা কর ইহাদের ।”
 জ্বালাইয়া অগ্নি তবে গোড় চারি ভাই,
 করি মাংস পাক, স্নেহে থাইল সকলে ।
 ভোজনান্তে বলিলেক লিঙ্গো ভগ্নীগণে,
 “এবে ফিরি নিজ গৃহে যাও দ্ববা করি ।”
 উত্তরিল ভগ্নী সাত, “যাইবে যথায়,
 যাইব তথায় মোরা, না ফিরিব ঘরে ।”
 এত শুনি বলিলেক গোড় চারি ভাই, —
 ভালত বলিছে এরা, স্বীকারিলে তুমি,
 ভাই, লিঙ্গো, মোরা হবে বিবাহ করব ।
 লও বাছি সকলের স্ত্রীরী যে হয় ;
 যবে বাকি যারা, মোরা করিব বিবাহ

তাহাদিগে ।” বলিলেন লিঙ্গো “শুন ভাই,
নাহক কাসনা মোর বিবাহ করিতে ;
ভাতা মোর তৈয়া হবে, ভগিনী উহারা,
দেখিব মাতার ন্যায় আমি উহাদিগে !
বয়সে তোমরা বড়, সর্ব্বছোট আমি ;
যতন আমারে ওরা করিবে নিশ্চয় ;
আনি দিবে জল, খাদ্য, করিবে প্রস্তুত
শয্যা, করাইবে স্নান, বস্ত্রাদি ধুইবে ।”
“কেমনে বিবাহ লিঙ্গো করিব আমরা ?
ভাই মোরা চার, কিন্তু ভগ্নী সাত জন ।”
“জ্যেষ্ঠ তিন কর বিয়ে প্রত্যেক হুজনে,
করিবে কনিষ্ঠ এক কন্যাকে বিবাহ ।”
চলিল সকলে তবে কাচিকোপাগ্রাসে ;
না ছিল পুরুষ তথা, না ছিল রমণী ।
হরিদ্রাদি বাটি লিঙ্গো মাখাল সকলে ;
নিখিল মণ্ডপ এক, সাজাইল ভায়
গাঁথি বহু পর্ণ মালা । একরূপে সমাপ্ত
তবে হইলে বিবাহ, বলে জ্যেষ্ঠ ভাই,—
‘কত উপকার লিঙ্গো করেছে মোদের ;
বিবাহের তরে আনি দিয়াছে তনয়া ;
পিতৃবৎ সম্মানিব তাহাকে আমরা ;
আহরিয়া ফলফুল আমি দিব তারে ;
শীকার আমিও ঘোর অরণ্য হইতে ;
দোলানায় শুয়ে স্থখে থাক লিঙ্গো ঘরে ।’
বাহিরিল চারিভাই ভীরধনু হাতে,
শীকার উদ্দেশে, ঘন আঁধার অঙ্গলে ;
দোলনায় শুয়ে লিঙ্গো স্থখে নিদ্রা যায় ;
গৌড়পত্নী সাত জন দোলার তাহারে ।
এইরূপে কয়দিন হইল অতীত ।

একদা গিয়াছে বনে গৌড় চারিজন ;
নিদ্রাবায় দোলনার, লিঙ্গো গুরুতর ;

ভাবিল ভগিনী সাত—নাহি হাসে লিঙ্গো !
নাহি কভু কহে কথা আমাদের সনে !
না চায় মোদের পানে ! কহাইব কথা
তাকে আমাদের সনে ; হাসাইব তাকে ;
আমোদ প্রমোদ মিলি করিব সকলে ।
কেহ হস্ত—কেহ পদ ধরিল লিঙ্গোর ;
কেহবা দিইল টান ধরি তার গাত্র ।
তথাপি না দেখে লিঙ্গো মেলিয়া নয়ন ।
অবশেষে বলে লিঙ্গো ভগ্নী সাত জন,
“হেন ব্যবহার কেন কর মোর সনে ?
ভগিনী তোমরা মোর নাহি কি স্মরণ ?
দাস আমি দ্বিষরের,—যায় যাক প্রাণ,
হাসিব না তবু আমি তোমাদের সনে ;
চাহিব না তবু আমি তোমাদের পানে ।
এত শুনি জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বলিল সকলে,—
“চাহিবে না লিঙ্গো তবে আমাদের পানে ?”
এত বলি আক্রমিতে অগ্রসর তারা ।
কুপিত হইল লিঙ্গো, আপাদ মস্তক
ক্রোধে হইল পুরিত ; উত্তরিল লিঙ্গো
দ্রুত দোলনা হইতে । সম্মুখে মুকার
ছিল পড়ি, লয়ে তাহা প্রহারিল তবে ।
প্রহারিত ভগ্নী সাত ব্যার পলাইয়া ।
দোলনায় কিরি লিঙ্গো পুনঃনিদ্রা যায় ;
নিজ নিজ গৃহে কিরি গেল ভগ্নী সাত ।

মধ্যাহ্ন সময়ে আসে গৌড় চারি ভাই ;
মেরেছে হরিণ কেহ কেহ ধরগোস,
ময়ুর কেহ বা, ফুল আনিয়াছে কেহ ;
আপন আপন ঘোষা তারা নামাইয়া,
বলিল সকলে “চল, জিকোকে মোদের
ভেটিব আমরা, দিব উপহার ফুল ।
দোলনায় নিদ্রাবায় দেখিয়া লিঙ্গোকে,

আপন আপন ঘরে ফিরিল সকলে।
করিয়া নিস্তার ভাণ আছিল শুইয়া
ভগ্নী সাতজন, যেন জড়সড় ভয়ে।
জিজ্ঞাসিল সবে “কেন নিদ্রিত তোমরা?
কেন না দোলাও সবে লিঙ্গের দোলনা?”
উত্তরিল তারা:—“শুন, বলি তবে শুন,
সে পোড়া লজ্জার কথা—লিঙ্গের আচার
হায় কি লজ্জার কথা। কতদিন আর
লুকায়ে রাখিব মোরা? ছিহ্ন এত দিন
চূপ করি—কত দিন স’ব অপমান?
এক দ্বীপ ছই স্বামী সন্তবে কি কভু?
এইদণ্ডে পিতৃগৃহে ফিরি যাব মোরা।”
এত শুনি জ্বলি ক্রোধে বলে যত গোঁড়;
“বলেছিহু মোরা ‘লিঙ্গো’ করহ বিবাহ
সপ্ত ভগিনীর মধ্যে যারে সাধ যায়;
বলিল তখন ভণ্ড, পাষণ্ড, পামর,
‘দেখিব ওদিকে আমি মাতার সমান;
শঠ লিঙ্গো প্রতারিত করেছে মোদিগে।
বন মধ্যে ছলে ধুর্ভে যাইব লইয়া;
নাশি তথা তাকে, চক্ষু লইব কাটিয়া।
মারিয়াছি এত দিন হরিণ খরগোশ;
নুতন শীকার মোরা করিব আজিকে।
মারিয়া তাহারে, ছিড়ি নিব চক্ষু দুটী;
খেলিব সে চক্ষু লয়ে আমোদে আমরা।
এ প্রতিজ্ঞা যতক্ষণ নাহিক পুরিবে,
জলম্পর্শ ততক্ষণ কেহনা করিবে।”

চলিল সকলে তবে লিঙ্গের সদন;
“উঠ লিঙ্গো উঠ ভাই” বলিল সকলে।

উত্তরিল লিঙ্গো তবে, “কি হয়েছে ভাই?
কোথা ফুল? কোথা জন্তু? খালি হাতে কেন?”
বলিল তাহারে, “এক দেখিয়াছি জন্তু
প্রকাণ্ড-শরীর, বহু মারিলাম তাহে,
পড়িল না তবু, কিন্তু না যায় পলায়ে।
ক্রান্ত হয়ে শেষে মোরা এলাম চলিয়ে।
উঠিয়া বসিল লিঙ্গো, ভাইদের পানে
বলিল চাহিয়া—‘আমি মারিব সে জন্তু।’”

লিঙ্গো সনে চারি গোঁড় অরণ্যে চলিল
অবেশিল চারিদিকে, মিলিল না জন্তু;
সম্বোধি তাদিগে তবে বলিলেন লিঙ্গো,
“গিয়াছে চলিয়া যদি, ক্ষতি নাহি তায়।”
বৃক্ষ মূলে বসে লিঙ্গো বিশ্রাম আশয়ে।
বলিল তাহারে, “বস, ভাই, হেথা;
আনি দিব জল তোমা,” চলি কিছু দূর,
ছুড়িল চারিটী তীর আড়াল হইতে
গোঁড় চারি জন তবে লিঙ্গো লক্ষ্য করি।
সে আঘাতে বাহিরিল লিঙ্গোর পরাণ।

ছিড়িলয়ে চক্ষু দ্বয় শবদেহ হতে,
সন্ধ্যাকালে গোঁড় চারি ফিরিল আবাসে।
বলিল সম্বোধি পত্নী তবে এক জন,
“জ্বল অগ্নি শীঘ্র করে, জ্বলহ প্রদীপ
খেলিব আমরা সবে মিলি কুতূহলে।
হরিষে সকলে তবে হাঁটু গাড়ি বসি,
আরস্তিল খেলিবারে চক্ষু দুটী লয়ে।

(ক্রমশঃ)

ক্রীতমথনাথ বহু।

(বিএস্ সি লগুন)

আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

মাঘ মাসের ভারতীর ৪৪০ পৃষ্ঠার পর।

ব্রহ্মা (হরিবংশ মতে ধন্বন্তরি) অয়ুর্বেদকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করেন—তদ্যথা, শল্য, শালাক্য কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমার-ভূতা অগদতন্ত্র রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণ তন্ত্র।

১। শল্যশাস্ত্র (বা অস্ত্র চিকিৎসা)।
বিবিধ প্রকার ভূণ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধূলি, লৌহ লোষ্ট্র, অস্থি, নখ, পুষ্প প্রভৃতি দেহের মধ্যস্থ হইলে তাহাদিগকে শল্য কহে। যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার অগ্নি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া দেহস্থ শল্য বাহির করিবার উপায় এবং ত্রণ নির্ণয়ের নিয়ম এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

২। শালাক্য—উর্দ্ধজক্রগত রোগ, অর্থাৎ চক্ষুরোগ কর্ণরোগ, মূত্ররোগ, দন্তরোগ এবং নাসিকাসংস্থরোগ প্রভৃতির শাস্তির নিমিত্ত এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। কায়চিকিৎসা—সর্কাসংস্থত রোগ সমূহের অর্থাৎ জ্বর, অতিশয়, রক্তপিত্ত, শোথ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতির শাস্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। ভূতবিদ্যা—দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস পিতৃগণ, পিশাচ, নাগ, এবং গ্রহ প্রভৃতি কর্তৃক উপস্থিত মনুষ্যাদিগের নিমিত্ত শাস্তিকর্ম, বলিহরণাদি গ্রহশাস্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৫। কৌমার, ভূতা (খাত্তী-বিদ্যা)। পুত্র পালন, খাত্তীর তন্য হুৎনের দোষশোধন

এবং দুই গ্রহ সমুখিত ব্যাধি সমূহের শাস্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৬। অগদ তন্ত্র (বা বিব চিকিৎসা)। সর্প, কীট, মাকড়শা, বৃশ্চিক, ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নিরূপণ, বিবিধ বিষসংযোগজ্ঞান এবং সর্পাদি দষ্ট ও বিবিধ বিষোৎপন্ন রোগ সকলের শাস্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৭। রসায়ন তন্ত্র—বয়স্থাপণ, আয়ু মেধা ও বল বর্দ্ধন এবং রোগ হরণ প্রভৃতির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৮। বাজীকরণ—অন্ন, হৃষ্ট অশুদ্ধ ও ক্ষীণ শুক্রের আপায়ণ উপচয় প্রভৃতির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

প্রচলিত সূত্রত, চরক, হারীত, বাভট, ভাবপ্রকাশ চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে আয়ুর্বেদে শারীর-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক জ্ঞান, শরীরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধনির্ণয় শুক্রশোণিত-সম্বন্ধ নির্ণয়, শুক্র পরীক্ষা, আর্তব (ঋতু শোণিত) পরীক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, নেত্রপরীক্ষা, শ্রিহা পরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা, মলপরীক্ষা, গর্ভরক্ষা, শিশুপালন, স্তন্যদুগ্ধ-পরীক্ষা প্রভৃতি খাত্তী-বিদ্যা, দিনচর্যা ঋতুচর্যা প্রভৃতি বাবতীর স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগনির্ণয়, রোগোৎপত্তির কারণ, রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়, ঋতু ও বলাবল পরীক্ষা, ঋতুর ক্রিয়া, দেশ

কাল পাত্র ভেদে খাদ্য ও ঔষধাদির নির্ণয়, জল বায়ু প্রভৃতির গুণাগুণ নির্ণয়। উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, দ্রব্য নিরূপণ, দ্রব্য-গুণ ও ক্রিয়া, মিশ্রদ্রব্যের গুণ, সংযোগ প্রয়োগ বিজ্ঞান, বিষ নিরূপণ, দ্রব্য গ্রহণ ও ঔষধ প্রস্তুতের নিয়ম, শরীরের সহিত ঔষধের এবং ঔষধের সহিত ব্যাধির সম্বন্ধ নির্ণয়, বলবীৰ্য্যাদি বৃদ্ধি হইবার উপায়, শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া, শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃত দেহের পরীক্ষা, অস্ত্র চিকিৎসা, বিবিধ প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্রের ব্যবহার প্রণালী, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, রোগানুসারে ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী, বন্ধন বিরেচন, পিচকারি প্রয়োগ প্রভৃতি পঞ্চকর্ম, স্নেদবিধি, অগ্নিপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ, জ্বলোকাবিধি, শূল প্রভৃতি নানা যন্ত্রযোগে রক্তমোক্ষণ প্রণালী, রাসায়নিক ক্রিয়ার নিমিত্ত নানা-বিধ যন্ত্র নির্ণয়, ষাটু প্রভৃতির জারণ মাৰ্ণের নিয়ম, স্থপ-শাস্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসোপযোগী অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে।

এই আয়ুর্বেদে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিভিন্ন মতের চিকিৎসা প্রণালী প্রবিষ্ট হইয়াছে—

১। বৈদিক চিকিৎসা।—ব্রহ্মসংহিতা, আশ্রয় সংহিতা, সূক্ষ্মত, চরক, হারীত সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পাচন, তৈল, মৃত, অবলোহ প্রলেপ প্রভৃতি প্রাচীনতম ঔষধাদি বৈদিক চিকিৎসা সম্বন্ধ।

২। ভাস্কর চিকিৎসা—শিবোক্ত ভাস্করদেব ষোড়শমস্ত চিকিৎসা প্রণালী, বটিকা রস সংযুক্ত ঔষধ প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

তাহাই ভাস্কর চিকিৎসা সম্বন্ধ। অতি-পূর্বে (বৈদিক সময়ে) কেবল তৈল মৃত পাচন প্রভৃতি দ্বারাই চিকিৎসা করা হইত। সূক্ষ্মত, চরক, হারীত প্রভৃতি গ্রন্থ, কেবল ঔষধাদিতেই পূর্ণ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তন্ত্র সম্বন্ধ বটিকা ও রস সংযুক্ত ঔষধাদি ব্যবহৃত হয়।—

৩। অবধূত চিকিৎসা।—যেবণ সংহিতা যোগতরঙ্গিনী গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ, গঙ্ঘানাথ প্রভৃতি অবধূতবরদিগের ঔষধাদি, অঙ্গুরীয় ধারণ, মাজুলী ধারণ প্রভৃতি এবং সন্যাসী প্রদত্ত ঔষধাদির অধিকাংশ অবধূত চিকিৎসা সম্বন্ধ।

৪। পঞ্চাদি চিকিৎসা—অম্বায়ুর্বেদ গম্ভায়ুর্বেদ গবায়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ ও তদ্রূপ ঔষধাদি পশু চিকিৎসা সম্বন্ধ।

৫। Simila Semilicus Curantur সমঃ সমঃ শময়তি অথবা বিষস্যবিষমৌষধং প্রভৃতি মতকে যদি হোমিওপ্যাথিক মত বলা যায়, তবে আয়ুর্বেদমতেও অনেক রোগেই প্রায় হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসা বিদ্যমান আছে। আয়ুর্বেদোক্ত নিদান স্থানের উপশয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হোমিওপ্যাথিক মতের লক্ষণাদি বর্তমান রহিয়াছে।

অস্ত্রচিকিৎসা, মজ্জাদিচিকিৎসা প্রভৃতি বৈদিক চিকিৎসার অন্তর্গত স্মৃতিরূপে এই সমস্ত চিকিৎসাকে আর স্বতন্ত্র মতের চিকিৎসা বলা যায় না।

যাহারা আয়ুর্বেদ সম্পর্কে কোনরূপ অজ্ঞানত্ব রাখেন না তাহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বর্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য

চিকিৎসা শাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছে সে তুলনায় আয়ুর্বেদ অনেক অসম্পূর্ণ। তাঁহাদের মতে শারীর বিদ্যা (Anatomy) এবং অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ কিছুই নয়। কিন্তু তাঁহাদের এ সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা আয়ুর্বেদীয় প্রাচীন সংহিতাগুলি দেখিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে।

আয়ুর্বেদে যে সকল বিষয় আছে আমবা উপবে তাহার একটি অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছি। তদ্বারাই জানা যায় চিকিৎসোপযোগী সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই আয়ুর্বেদে নিবেশিত আছে। ধ্বজবি প্রভৃতি অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ধ্বজবির শিষ্য সূক্ষ্মত ওরস্ত্র প্রভৃতি কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে আর্ধ্যগণ অস্ত্রচিকিৎসা ও শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের এতদ্বিব্যক জ্ঞানের নিকট তাহা কোনমতেই হীন নহে।

শুষ্কতমতে আর্ধ্যচিকিৎসকগণ শবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে শারীরস্থানের উপদেশ দিতেন। বাহারা শবচ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন তাঁহারা কৃতান্ত স্বরূপ। ডাক্তার ওয়াইজ ভৎকৃত “Hindu System of Medicine” নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, আয়ুর্বেদীয় শারীরস্থান বর্ণনায় শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অস্ত্রচিকিৎসকগণ যুদ্ধকালে, নৃশস্তি-

দিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং অস্ত্রবিদ্ধ সৈন্যদের অঙ্গে পটি বান্ধিয়া রক্ত-স্রাব নিবারণ, অস্ত্রাদি বাহির করণ প্রভৃতি চিকিৎসা করিতেন।—বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন চিকিৎসা বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা এই উভয় বিদ্যাতেই হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল ও নানারূপ ভূষি প্রস্তুত করিতে জানিত। ধাতুসেবন কবিতা পীড়া আরোগ্য করা তাহারাই প্রথমে জ্ঞাবিকার করে। হিন্দুদিগের অতি পূর্বকালেই ১২৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ছিল ও তাহার নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতেও পারিত। বসন্ত রোগ নিবারণার্থ টিকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে।”(১১) অতি পূর্বকালেই তাহার অস্ত্রচিকিৎসা ও ধাতুবিদ্যার নিমিত্ত যে সমুদয় অস্ত্র ও যজ্ঞ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এত উন্নতির পর সংখ্যাত অধিক হইলেও একেবারে নূতন রকমের যজ্ঞাদি বড় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই।—আর্ধ্যগণ অতি পূর্বকালেই রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে জানিতেন। এই বিদ্যাবলে তাঁহারা পারদকে এত নিদোষ করিয়া (রসসিন্দুর কঙ্কলী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া) প্রায় সমস্ত রোগেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যে সেরূপ কোন ছদ্ম কৌশল আজ পর্যন্তও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এদেশীয় চিকিৎসকগণ পারদ

১১ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ভারত-বর্ষের ইতিহাস ৫১ পৃষ্ঠা।

ব্যবহার করিলে কোনও ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু ডাক্তারদের ব্যবহৃত পারদে অনেক প্রকার বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। অতিপূর্বকালেই হিন্দুগণ গন্ধকদ্রাবক প্রভৃতি বহু প্রকার দ্রাবক প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া অল্পসারে নানা প্রকার ধাতু দ্বারণ ও নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন।

তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে আধুনিক চিকিৎসা পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ই যেরূপ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত, এক্ষণকার প্রচলিত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাদিতে অনেক বিষয়েই সেরূপ বাহুলা বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু টীকাকার প্রভৃতির মন্তব্য পাঠ করিলে সে ক্রটিও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। আধুনিক আয়ুর্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থাদি অল্প বুদ্ধি চিকিৎসকদিগের নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণও অল্পের মধ্যে চিকিৎসক হইতে পারিয়া বহু বিস্তীর্ণ সংহিতা প্রভৃতির অধ্যয়ন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই জন্যই এক্ষণে প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থগুলি প্রায় লোপ পাইবার মধ্যে গিয়াছে। প্রচলিত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়াও আমরা বলিতে পারি, ভারতীয় আর্থাগণ আয়ুর্বেদ-রূপ যে সুপ্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার এক একটি শাখা হইতে এক একটি কলম লইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এক একটি বৃক্ষ গড়াইয়াছেন মাত্র। অথবা আয়ুর্বেদের এক একটি ফটোগ্রাফির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা এক একখানি

বড় চিত্রপট চিত্রিত করিয়াছেন। শাখায় যে উপাদান, কলমে তদপেক্ষা অধিক কিছুই থাকে না। ফটোগ্রাফে যাঁহা থাকে তদবলম্বন করিয়া যে চিত্রপট আঁকা যায় তাহাতেও তাহাই থাকে। চিত্রপটের সমুদয় অবয়বই ফটোগ্রাফে পাওয়া যায়, তবে সূক্ষদৃষ্টি না থাকিলে সকলে ফটোগ্রাফির সমুদয় অংশ দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহার ক্ষমতা এবং সূক্ষদৃষ্টি আছে তিনি ফটোগ্রাফ দেখিয়াই একখানি বড় চিত্রপট আঁকিতে পারেন। যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি আয়ুর্বেদের এক একখানি ফটোগ্রাফ অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে একটী কথাতে দশ রকম দৃষ্টান্ত দিয়া, একখানি শুভ্র বসনে শতটী ফুল আঁকিয়া বিস্তৃতরূপে চিত্রিত করিলে, অন্য উপাদান ব্যতীত, কেবল তদ্বারাই এক একখানি প্রকাণ্ড চিত্রপট অঙ্কিত করিতে পারিবেন। যাঁহারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কে একেবারে নিরক্ষর নছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে বিশদ ও বিস্তারিত রূপ বর্ণনা করিলে অনেক স্থলে আয়ুর্বেদের একটী শ্লোক অবলম্বনেই শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত একখানি পুস্তক লেখা যাইতে পারে। বাস্তবিক বর্তমান সময়ের জন্য আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাদি পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণালী অনুসারেই নানা দৃষ্টান্ত ও নানা মত সংগ্রহ করিয়া বিস্তারিতরূপে লেখা কর্তব্য। নচেৎ মুনিদিগের সেই সারকথাগুলি আর এক্ষণেই এক কথায় আধুনিক লোকদিগের মস্তক ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীযাদবানন্দ ওপ্ত।

বাল্যবিবাহ।



মুখে যে যাহাই বলুন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের দেশে আজকাল ধর্ম, সমাজ, ও রাজনীতি বিষয়ে যে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহই ন্দেহ করিতে পারেন না। ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় আন্দোলনের বাহলাই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বহু লোককে কোন বিষয়ে আন্দোলন করিতে দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে তাহারা সেই বিষয়টি বেশ বুঝিয়াছে অথবা সম্যক রূপে বুঝিতে এবং অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে—অন্ততঃ সে বিষয়ে তাহাদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের ইহা একটা দ্রব সত্য যে কোন বিষয়ে সাধারণের মন আকৃষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে উন্নতি কেবল সময়-সাপেক্ষ—উপযুক্ত সময়ে হইবেই হইবে। প্রোটেষ্টাণ্ড ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বের ধর্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লবের পূর্বের সমাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি শত শত উদাহরণ দ্বারা এই ঐতিহাসিক সত্যটি প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে আজকাল যে ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে বহুবিধ আন্দোলন হইতেছে ইহা অবশ্যই দেশের পক্ষে একটা কল্যাণকর চিহ্ন। নিম্নলিখিত লোকে এখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ম্যাটিনি বালকের

চীৎকার, সমাজিক আন্দোলনকে বাতুলের প্রলাপ, এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনকে বড় উপন্যাস লেখকের নূতন খেয়াল ইত্যাদি যাহাই বলুন না কেন এগুলি যে দেশের পক্ষে শুভ চিহ্ন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

শিশু দৌড়াইতে পারে না বলিয়া তাহার প্রথম হাঁটবার চেষ্টাকে বিজ্ঞপ করা, তাহার শত শত পদস্থলন দেখিয়া ব্যাকুল করা, যুক্তি সিদ্ধ নহে। হাঁটিতে না শিখিয়া কেহ দৌড়াইতে পারে নাই—পদস্থলিত না হইয়া কেহ হাঁটিতে শিখে নাই। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে ‘Nine falls make a rider’ নয়বার না পড়িলে কেহ ঘোড়-সোয়ার হইতে পারে না—এ কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু যে কোন আন্দোলনই করা যাউক না কেন উহাতে সম্পূর্ণ এক-দেশ-দর্শিতার ভাব থাকিলে তদ্বিষয়ে সম্যক উন্নতি অসম্ভব। কোন প্রশ্নের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দিকের তর্ক উত্থাপিত হইলেই তাহার দোষ গুণ সম্যকরূপে বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা যায়। আরও, কোন অস্থিষ্ঠানের প্রতি-রোধ না থাকিলে তদ্বিষয়ে অস্থিষ্ঠান কর্তাদেরও সম্পূর্ণ উৎসাহ আকৃষ্ট হয় না। এই জন্যই উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অস্থিষ্ঠানগুলির কৃতকার্য্যতা কতক পরিমাণে রক্ষণশীল

সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সূচরু কার্যকারিতার বিশেষ কারণ এই যে তথায় রক্ষণশীল (Conservative) সম্প্রদায় ও উন্নতিশীল (Liberal) সম্প্রদায় সর্বদাই প্রায় সম-প্রভাব। ফ্রান্সের রক্ষণশীল সম্প্রদায় অতি ছীন বীর্য্য; উন্নতিশীল সম্প্রদায় সর্ব বিষয়ে চিরকালই একেধর। তাহার বিষময় ফল হইতেই ফ্রান্সে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ গতিমাত্রেরই নিয়ামক regulator থাকা ভাল—না থাকিলে অনেক নময় নিজের গতিতে নিজেই হুচট খাইতে হয়। রোমের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি বলিয়াছিলেন 'রোমের এখন দুর্দশা আরম্ভ হইল কারণ রোমের বীরত্ব বাধা জন্মায় একরূপ জাতি আর রহিল না'। তিনি বাস্তবিকই একজন পাকা রাজনীতিজ্ঞ।

আমার এতগুলি বুঝা কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রায় এইরূপ যে তাঁহাদের মতের ভিন্ন মত কেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে তাঁহার তৎক্ষণাৎ মূর্থ, old class, fool ইত্যাদি ঠাণ্ডাইয়া রাখেন। এমন কি, তাহার প্রতি স্মরণ ও বিদেহ প্রকাশ করিতেও ঋতি করেন না। বাস্তবিক এইরূপ ব্যবহার 'সাম্প্রদায়িক গোড়ামি' মাত্র। কোন প্রকার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে বাহাই বলুক উপযুক্ত তর্ক থাকিলে তাহাকে নিন্দিত না করিয়া তাহার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করা ও তাহার প্রত্যুত্তর

থাকিলে তাহা দেওয়ার চেষ্টা করাই প্রকৃত নীতিজ্ঞের কার্য্য।

আমি সে দিন কোন এক সুহৃদসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। সমিতির সভাগণ সকলেই শিক্ষিত। সমিতির উদ্দেশ্য দেশের কুরীতি ও কুসংস্কার দূরীকরণ। দেশের কুরীতি ও কুসংস্কার বলিতে গেলে সর্বাগ্রেই বালাবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার অবিবাহ, মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি আসিয়া পড়ে, এবং এইগুলির উচ্ছেদই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতিতে ইহার প্রত্যেকগুলির অবৈধতা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইল। কিন্তু কেহই ইহার কোনটির পক্ষে একটা কথাও বলিলেন না। তন্মধ্যে দুই একজন প্রচলিত দুই একটা রীতির স্বপক্ষে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু হাস্যাম্পদ হওয়ার ভয়ে তাহারাও নির্দীক্ রহিলেন। বোধ হয় অধিকাংশ সমাজসংস্কারক সভাতেই এইরূপ ঘটয়া থাকে; নচেৎ মালবারির পত্রোত্তরে রাজেন্দ্রলাল বাবু যা দুই এক কথা বলিয়াছিলেন তজ্জন্য খবরের কাগজ ওয়ালারা তাঁহার উপর একরূপ খজাহস্ত হইবেন কেন?

অন্য আমরা বালাবিবাহ প্রথার দোষ ও গুণ উভয়ই দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভরসা করি পাঠকগণ বালাবিবাহের কোন গুণ আছে ইহা শুনিয়াই একেবারে ভেলে-বেঙনে জলিয়া উঠিয়া এই কানেই পড়া বন্ধ করিবেন না। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে—'বালাবিবাহ' বলিলে আমরা দেশে

এখন সচরাচর যে বয়সে বিবাহ হয় তাহাই বৃদ্ধি, অর্থাৎ মেয়েদের ১০ হইতে ১৪ ও ছেলেদের ১৬ হইতে ২২ বৎসরের মধ্যে বিবাহ ।

বালাবিবাহের দোষ কীর্তন করীগণ বালা-বিবাহের প্রধানতঃ যে সমুদায় দোষ উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ।

তাঁহারা বলেন বালা-বিবাহ দ্বারা বালক দম্পতী সশ্রদ্ধে এই কয়েকটি অনিষ্ট ঘটয়া থাকে ।

১। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পতি বা পত্নী বাছিয়া লওয়া যায় না । সুতরাং অনেক সময় মনোমত পতি বা পত্নী না হওয়ায় রাসায়নিক অসঙ্গিলনের ন্যায় দম্পতীর মধ্যে কোন দিনই একতা জন্মিতে পারে না ।

২। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পতি বা পত্নীর কর্তব্য বুঝিতে পারা যায় না । সুতরাং পতি পত্নীর প্রতি এবং পত্নী পতির প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না । তজ্জন্য পরিশেষে অনেক সময় পতি পত্নীমধ্যে অপ্রণয়ের কারণ হইয়া উঠে । ক্রমে পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে এবং কালে দম্পতীর মূখ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ।

৩। বালা-কালে বিবাহ হইলে বালক পতি ও বালিকা পত্নী উভয়েরই শরীর সঙ্গে সঙ্গে মনও শীঘ্র রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে । তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সম্যক বিকাশ পায় না ; তাহাদের

শরীর ও মনের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায় ; এবং তাহারা শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য-জীবন ভাগ করিয়া ভবলীলা সম্বরণ করে ।

৪। বালাবিবাহের দরুণ দম্পতী শীঘ্রই সংসারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় । এবং বালাকাল হইতেই সংসারের সুখে দুঃখে লিপ্ত হওয়ার তাহাদের জ্ঞানোপার্জন-ও জীবনের কর্তব্যাদি শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে ।

উপরের লিখিত অনিষ্টগুলি স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্বন্ধেই ঘটয়া—থাকে । এতদ্ব্যতীত স্বামীর পক্ষে আরও দুইটি অনিষ্ট ঘটে :—

৫। বালক স্বামী আশৈশব এক গল-গ্রহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে কখনই সম্যক উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না । ধনসম্পদ তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে ; কিন্তু আমাদের স্বীয় যত্নদ্বারা স্বীয় উন্নতি সাধন পক্ষে ধন-সম্পদ একটী প্রধান সহায় ।

৬। অনেক বালক স্বামী অভিভাব-
কতার পর সংসারে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ যোগাইতে অক্ষম হইয়া চিরকাল দুঃখে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় । অনেক সময় হয়ত আত্মহত্যাও করিয়া ফেলে । একরূপ ব্যক্তি বালাকালে বিবাহিত না হইলে সম্ভবতঃ বিবাহ নামক উচ্চ অঙ্গের বাবুগিরিটার প্রতি একবার লক্ষ্যও করিত না এবং কোমর কমে সুখে সম্বন্ধে জীবন যাত্রা মিস্কাই করিতে পারিত ।

স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর পক্ষেও—আর দুইটি প্রধান অনিষ্ট লক্ষিত হয় :—

৭। আশৈশব একজনের অধীন থাকিয়া তাহার মন যোগাইয়া কাষ করিতে করিতে জীর্ণের মনের স্বাধীন ক্রিয়া একেবারে লোপ পায়। তাহার একটা যন্ত্র বিশেষ হইয়া পড়ে। “যেমনি করাও তেমনি কবে, যেমনি চালাও তেমনি চলে।”

৮। আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই সুতরাং বিবাহিতা শিশু-বালিকারা অনেক সময় বিধবা হইয়া—ইহ জীবনে সমস্ত সুখ হারায। বালদম্পতীর সন্তান সন্ততি সম্বন্ধেও একটা ঘোরতর অনিষ্ট লক্ষিত হয়। এ অনিষ্টটির গুরুত্ব অতি অধিক, কাবণ ইহার উপর সম্পূর্ণ-রূপে জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

৯। বালদম্পতীর সন্তানগণ সাধারণতঃ দুর্বল, ক্ষীণকায় ও ক্ষীণমনা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়। এই সন্তানগুলি অনেক সময়ই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বাঁচিয়া থাকিলেও অনেক সময় কেবল অকর্মণ্য দুর্বল জীবন বহন করিতে থাকে। ফলতঃ কোন জাতি মধ্যে অধিক দিন বাল্য বিবাহের রীতি প্রচলিত থাকিলে সে জাতি শেষে শারীরিক ও মানসিক লিলিপট (Lilliput) ময় হইয়া উঠে।

১০। বাঙ্গালার লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; এখন অথবা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেওয়া সুক্তি সঙ্গত নহে। বাল্য বিবাহে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তাহাতে আবার লোক গুলি শুল্ক ও অসুস্থ হয় না। সুতরাং খাদ্যের জন্য মুখ ঝাড়ে, কিন্তু কাজ করি-

বার জন্য হাত বাড়ে না। ইহাতে জাতীয় দরিদ্রতা ও দুর্দশা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এ গুলি ছাড়া বাল্যবিবাহের আরও কতকগুলি আত্মযজ্ঞিক দোষের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে গুলির গুরুত্ব অতি অল্প বলিয়া বিশেষ উল্লেখ নিষ্পয়োজন।

বাল্য বিবাহ বিবোধীগণেব এই সমুদায় তর্কের সুক্তি কত দূর তাহা সমালোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাউক, উপরে লিখিত অনিষ্ট গুলি নিবারণের জন্য তাহারা যে যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন তদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ অনিষ্ট গুলি নিবারিত হয় কি না, এবং সে গুলি নিবাবিত হইলেও উহা দ্বারা নূতন কোন প্রকার অনিষ্টের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কি না। বাল্যবিবাহ বিরোধীগণ অনেকে বলেন রাজকীয় কোন আইন বা সামাজিক কোন বিধি দ্বারা তাহাতে বাল্য-বিবাহ বহিত হয় তাহা কবা সর্বতোভাবে কর্তব্য। এইরূপ কোন উপায় দ্বারা বাল্য-বিবাহ নিবর্তিত করিলে তাহাতে বাল্যবিবাহের অনিষ্ট নিবাবিত হয় কি না এবং নূতন কোন অনিষ্ট আবির্ভাব হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার কারণ কি তাহা অগ্রে দেখাউচিত। অসভ্য সমাজে প্রায়ই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই। আমাদের অসভ্য পূর্ব পুরুষগণের মধ্যেও বোধ হয় বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। আদিম আর্ধ্যদিগের মধ্যে যে বাল্য বিবাহের রীতি ছিল না তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তবে আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ কোথা

হইতে আসিল? অববোধ প্রণালী সম্বন্ধে আমরা অনেকটা মুসলমানদের দৌরাঙ্গা, মুসলমানদের অনুকরণ, ইত্যাদির দোহাই দিয়া রেছাই পাইতে পারি, কিন্তু এ বিষয়ে সেই "ছুরাচার স্বেচ্ছ" দিগের ক্ষেত্রে অণু-মাত্রও দোষ চাপাইবার উপায় নাই। বরং মুসলমানদের মধ্যে পূর্বে বালা-বিবাহের রীতি ছিল না—আমাদের দেখাদেখিই শেষ তাহারা কতকটা শিখিয়াছে। তবে এ কুপ্রথাটি কোথা হইতে আমাদের দেশে প্রবেশ করিল? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে রাজকীয় আইন বল আর সামাজিক বিধিই বল আপনা আপনি দেশে কখনই প্রচলিত হয় না। দেশে কোন অভাব বর্তমান থাকিলে তন্নিবারণার্থেই এগুলি সৃষ্ট হয়। দেশে ডাকহিত না থাকিলে ডাক-ইতিদিকে শাস্তি দিবার আইন হইবে কেন? গোমাংস ভক্ষণে ভয়ানক অনিষ্ট না দেখিলে তৎ বিরুদ্ধে সামাজিক কোন বিধি প্রচলিত হয় না। বস্তুতঃ সমাজ আপনিই আপনার রোগের চিকিৎসা করে। সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা হইল কি কোন অভাব হইল, তখন দুই একটা করিয়া লোকের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্রমে সমাজের অধিকাংশ লোকে যখন তজ্জন্য ক্রোধ অনুভব করিতে থাকে—তখন সকলেই তন্নিবারণার্থ উপায় অবলম্বন করে। যদি সমাজের অধিকাংশ লোকে একরূপই উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ক্রমে সে উপায়টি সামাজিক রীতি হইয়া দাঁড়ায়, ও সময়ে তৎসম্বন্ধে নিয়মাদিও বিধিবদ্ধ

হয়। এইরূপেই সমুদায় সামাজিক রীতির ও সামাজিক বিধির সৃষ্টি। বালা বিবাহের অনেক অনিষ্ট দেখিতেছি বলিয়াই আজ আমরা ইহার বিরুদ্ধে এইরূপ চেষ্টাচেষ্টা করিতে বলিয়াছি। যখন বালা বিবাহ দ্বারা সমাজ উৎশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে তখন বালা-বিবাহ উঠিয়া যাইবেই যাইবে; কোন শাস্ত্রীয় বিধিরই ক্ষমতা থাকিবে না যে বালা বিবাহ বজায় রাখে। উপরের যুক্তিটি যদি সত্য হয় তবে অবশ্য সমাজের কোন অভাব দূরীকরণার্থেই দেশে প্রথম বালা বিবাহের বিধি প্রচলিত হয়। বোধ হয় মনু-আদি ধর্মশাস্ত্রের বহু পূর্ব হইতেই দেশে বালা-বিবাহ প্রচলিত। মনু মেয়েদের বালা বিবাহ সম্বন্ধে বড় কড়াকড় নিয়ম করিয়াছেন। এস্থলে বলা আবশ্যিক যে অনেক বালা বিবাহ বিরোধীগণ মনুর বাকাটি যে কেবল 'পুস্তকের কথা' প্রকৃত দেশের প্রচলিত রীতির কথা নহে ইহা প্রতিপন্ন কারবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদি পুরাণ হইতে দেকালে অনেক বয়েসে যে সকল মেয়েদের বিবাহ হইয়াছিল তাহাদের এক তালিকা দেখাইয়া থাকেন। কুমারপ্তব পাঠের কালে পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদিগকে "স্তনৌ তথা প্রযুক্তৌ" ইত্যাদি শ্লোকটি মুখস্থ করিতে বলিয়া থাকেন কারণ পরীক্ষার প্রশ্ন থাকিতে পারে যে 'কালিদাসের সময় যে বালা বিবাহ প্রচলিত ছিল না ভদ্রীয় গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ দাও'। কিন্তু এইরূপ তর্কের দোঁড় আমি ভুলটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেকালে হই

একটি মেয়ের যুবতী অবস্থায় বিবাহ হইত, অথবা সঙ্গ্রহ বিবাহ হইলে কেহ দোষ মনে করিত না—ইহা দ্বারা তখন দেশে বালা বিবাহ দিবার রীতি ছিল না একথা কিপ্রকারে প্রতিপন্ন হইল? বরং পুরাণাদি পাঠে ইহাই জানা যায় যে আদৌ বালাবস্থায় বিবাহের রীতি ছিল না, পরে ছুই একটি বালা বিবাহ হইত কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যুবতী বিবাহ, আর পরে যুবতী বিবাহের সংখ্যা অল্প, বালা বিবাহই অধিক, এবং সর্বশেষে হিন্দু রাজত্বের শেষকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সর্বত্রই বালা বিবাহ, যুবতী বিবাহ আদবে নাই, অথবা নিতান্ত দোষনীয়। এইরূপে দেখা যায় যে সমাজ ক্রমশই বালা বিবাহের দিকে অগ্রসর হইয়াছে ও এই রীতিটি প্রচলিত করিয়া লইয়াছে। বালাবিবাহের কোন না কোন প্রকার আবশ্যকতা থাকাতেই উক্ত রীতিটি এই প্রকারে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বোধ হয় আর্যগণ শীতপ্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিবার পর তাহাদের বালক বালিকাগণের তরুণ বয়সেই বিবাহের আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং ভিন্নবন্ধন ক্রমে ক্রমে সমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হয়। সমাজও ক্রমে ক্রমে বালাবিবাহ প্রচলিত করিয়া সামাজিক সামঞ্জস্য স্থির রাখিতে যত্নবান হয়। কাজে কাজেই এখন দেশে বালাবিবাহ সর্বত্র প্রচলিত। এখন যদি সমাজের স্বতঃচেষ্টা ব্যতীত কোন প্রকার আইন অথবা তরুণ কোন বিধি দ্বারা

কোন প্রকার হাতগড়া উপায়ে (artificial means) বালাবিবাহ প্রথা রহিত করা যায় তবে পূর্বোক্ত অহিতাচরণ গুলি পুনর্ব্বার দেশে আবির্ভূত হইবে কি না তদ্বিষয়ে বালাবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলন-কারীগণের বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। বালা-বিবাহ জোর করিয়া উঠাইয়া দিলে দেশে গুপ্ত প্রণয়, আর্থিক সম্বন্ধ, পরিত্যক্ত সন্তানাদি এবং আরো অনেক প্রকার অনিষ্টের সংখ্যা বাড়িবে কি না এটা কি বিশেষ ভাবনার কথা নহে।

আর একটি বিষয়ে বালা বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনকারীগণের বিশেষ মনোযোগ করা কর্তব্য। কোন একটি হাতগড়া উপায়ে বালা-বিবাহ উঠাইয়া দিয়া সমাজের এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা উচিত কি না। স্বাধীনতা কথাটা বারবার করিয়া আমি বড় মুগ্ধিলে পড়িলাম। আজকাল অনেকেই স্বাধীনতা স্বাধীনতা করেন—কিন্তু কথার অর্থটার প্রতি বড় দৃষ্টি রাখেন না। দেশের রাজা স্বজাতি হইলে দেশবাসী স্বাধীন; বিজাতি হইলে তাহারা ‘অধীন’ এ বিশ্বাস অনেকেরই আছে এবং সেই জন্য হয়ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বালা বিবাহের সঙ্গে স্বাধীনতা অধীনতার সম্পর্ক কি? ‘স্বাধীনতা, অধীনতার ঠিক দুইটি ভিন্নার্থবোধক বিপরীত অবস্থাকে বুঝায় না। ‘স্বাধীনতা’ ‘অধীনতার’ নানা ভিরেক আছে। কোন দেশ অল্প স্বাধীন কোন দেশ অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীন, কোন দেশ আরও অধিক স্বাধীন ইত্যাদি। ইচ্ছা-

রূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে রাজকীয় বাধা যে দেশে যতকম সেই দেশ তত স্বাধীন। স্বজাতি রাজ্য হইয়াও দেশান্তর লোকে হাতে পায় বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, আর বিদেশীয় রাজ্যও অনেক বিষয়ে প্রজাকে স্বাধীনতা দিতে পারেন। এমত অবস্থায় প্রথম দেশকে স্বাধীন বলা ও দ্বিতীয় দেশকে অধীন বলা, কথা বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা মাত্র। সমাজের শৃঙ্খলা, শাস্তি, ও উন্নতির জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে সর্ব-বিষয়ে ইচ্ছারূপ কার্য্য করিতে দেওয়া যায় না। কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। এই বাধা গুলিই দেশের 'আইন,' বিধি ইত্যাদি। স্ত্রীনিয়ম ও স্ত্রীশৃঙ্খলা দ্বারা যে সমাজ (স্বীয় উন্নতি ও শাস্তির পথ রোধ না করিয়াও) যত অধিক বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে ইচ্ছারূপ কার্য্য করিতে দিতে পারে—সে সমাজ তত অধিক স্বাধীন। অর্থাৎ সে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা Individual liberty যত অধিক সে সমাজ তত স্বাধীন। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত রাজ্যের জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এই জন্যই নেপালিয়েরা স্বদেশী রাজ্যের অধীনে থাকিয়াও আনাদের অপেক্ষা পরাধীন এবং ইটালীর রাজ্য ভিন্ন দেশীয় লোক হইলেও ইটালী স্বাধীন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যখন বলি নেপাল বা তুরস্ক স্বাধীন তখন বুঝিতে হইবে আমরা তথাকার রাজ্যের কথা বলিতেছি, প্রজার কথা বলিতেছি না। এখন বোধ হয় অনেকে বুঝিয়াছেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

সমষ্টি (অবশ্য সংখ্যা ৩ গুরুত্ব) উভয়ই বিবেচনা করিয়া সমাজের বা দেশের স্বাধীনতার পরিমাণ। এখন আমাদের দেশে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বালা-বিবাহ করা না করা এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আইন দ্বারা বালা বিবাহ রহিত করিয়া এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু হরণ করা উচিত কি না তদবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি বলেন যে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকার সমাজের এতই অনিষ্ট হইতেছে যে এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই আবশ্যক, কিন্তু বাস্তবিক কি বালাবিবাহ জনিত অনিষ্টের গুরুত্ব এতই অধিক? এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বালা বিবাহের ন্যায় অনিষ্টকর কিন্তু কেহই সে সমুদায় বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করেন না। আমি একটা উদাহরণ দিতেছি। কে না জানে আমাদের দেশের জমিদারগণ শারীরিক পরিশ্রমে নিতান্ত বিমুখ। তন্নিবন্ধন তাহাদের শরীর ও মন নিতান্ত ব্যাধিগ্রস্ত থাকে; তাহাদের সন্তানসন্ততি জীর্ণমনঃকায় হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অকালে মৃত্যুপ্রাপ্তে পতিত হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজের উচ্চতম আশের এই অহিতাচরণ দ্বারা সমাজের কতই অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য এরূপ জমিদারগণ প্রত্যহ এত ঘণ্টা করিয়া সরকারী কারখানায় কাজ করিবেন এরূপ আইন করা বোধ হয় কেহই যুক্তি সঙ্গত মনে করিবেন না। অবশ্য

আমি বালা-বিবাহ ও জমিদারদের শ্রমপরা-
জুপতা একই শ্রেণীতে স্থাপিত করিতে
চাই না তবে এই মাত্র বুঝাইতে চাই যে
বালাবিবাহের অনিষ্টের গুরুত্ব বিশেষ পর্যা-
লোচনা করিয়া আইন দ্বারা তদ্বিষয়ক
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা উচিত নহে।
আজ কাল স্বাধীন বাণিজ্য, স্বাধীন মুদ্রা
যন্ত্র, স্বাধীন শিক্ষা ইত্যাদি স্বাধীনতার দিন
পড়িয়াছে এখন ব্যক্তিগত এই স্বাধীনতা
লোপ করিবার পূর্বে মেয়েদের অধিক
বয়সে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রাতি-
বন্ধক আছে তাহা রহিত করিয়া স্বাধীন
বিবাহ প্রবর্তিত করার চেষ্টা করা উচিত।
বিবাহ সম্বন্ধে বয়সের কোন বাধা না থা-
কিলে যার ইচ্ছা সে নিজ সুবিধামত অল্প
বা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারে।
পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন অধিক বয়সে
বিবাহিত হইবার বাধা রহিত করা ও বালা-
বিবাহের প্রথা রহিত করা একই কথা
নহে।

এখন আমরা বালা-বিবাহ-বিরোধীগণের
তর্কগুলির সমালোচনা করিব। এবং সেই
সঙ্গে বালা-বিবাহ রহিত হইলে বর্তমান
কতকগুলি ইষ্টের যে ব্যাঘাত হইবে তাহাও
দেখাইব অর্থাৎ বালা-বিবাহের গুণগুলিও
বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১ম তর্ক। বালাবিবাহে পতি পত্নীর এবং
পত্নী পতির মনোমত হয় না ইত্যাদি।

আপাততঃ বোধ হয় বটে যে যুবক
যুবতী মনোমত সহচর বাছিয়া লইতে পারে,
খালুক বালিকা তাহা পারে না; এবং

তজ্জন্য যৌবনবিবাহ বালাবিবাহাপেক্ষা
দম্পতীর পক্ষে অধিক সুখকর, কিন্তু প্রকৃত
প্রস্তাবে তাহা ঘটে না। উপযুক্ত সহচর
পসন্দ করিয়া লইবার ক্ষমতা যৌবন কালে
জন্মায় না। মনুষ্যের বৃদ্ধ বয়সেই প্রকৃত
প্রস্তাবে সেই জ্ঞান জন্মে। যাহারা নিজে
ভোগিয়াছে এবং অপরকে ভোগিতে দেখি-
য়াছে তাহারই কেবল বলিতে পারে যে
কোন রূপ বিবাহের চরম ফল কি দাঁড়ান
সম্ভব। যুবক প্রথম সংসারে প্রবেশ কালে
সংসারের সর্ব বিষয়েই অমভিজ্ঞ। এবং
কিরূপ সহচরী গ্রহণ করিলে চিরকাল সুখে
কাটাইতে পরিবে সে বিষয়েও তাহার জ্ঞান
অন্যান্য সাংসারিক জ্ঞানের ন্যায় সল্প।
অনেক সময় অভিরঞ্চিত নাটক নভেল
হইতে যুবক এ সম্বন্ধে জ্ঞান অথবা অ-
জ্ঞানতা লাভ করে। যদিবা এ বিষয়ে কিছু
মাত্র জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেও স্বাভাবিক
প্রেমেচ্ছা প্রথম উন্মুক্ত হইবার কালে তাহার
বেগে তাহাদিগকে একরূপ অভিভূত করিয়া-
ফেলে যে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়।
যুবক এবং যুবতী সাধারণতঃ প্রথম যে স্তন্দর
বা স্তন্দরীকে দর্শন করে তাহাকেই মন
প্রাণ সমর্পণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে।
এরূপ অবস্থায় পিতা মাতা সন্তানের স্বেচ্ছা-
রূপ বিবাহ বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব-
কথিত অল্পযুক্ততার জন্য দম্পতী শীঘ্রই
কষ্ট ভোগ করেন। আর পিতা মাতা বিবাহ
বন্ধ করিতে পারিলেও সন্তান অতৃপ্তপ্রেমের
জ্বালায় চিরকাল জ্বলিয়া মরেন। যৌবন-
বিবাহে যে প্রায়ই এইরূপ প্রথমে পিতা

মাতা আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ, পবে দম্প-
তীর নিজের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা
ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের "চম্পট বিবাহের
(Elopement Marriage) প্রাবল্য, প্রত্যা-
খ্যান, ব্যভিচার, ইত্যাদির মকদ্দমার আ-
দিক্য দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ
যুবক যুবতীর মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গঠিত
হওয়ায় বিবাহের পব পূর্বের গঠন ভাঙ্গিয়া
উভয়ের মানসিক গঠনের একতা সম্পাদিত
হওয়া প্রায়ই দৃশ্য। এবং তজ্জনাই বিবা-
হের কিছুকাল পবে অর্থাৎ রূপভঙ্গা ও
যৌবনমদ কথঞ্চিৎ শমিত হইলে অনেক
স্থলে স্ত্রী পুরুষে অনৈক্য হইয়া উঠে। ক্রমে
এই অনৈক্য বৃদ্ধি ও বিধেয়ে পবিণত হয়।

কিন্তু বালাবিবাহে বালক স্বামী ও
বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে এক-
প্রকার শিক্ষা পাইতে পাইতে তাহাদের
উভয়ের মন এক ভাবেই গঠিত হইতে
থাকে। তজ্জন্য যৌবনে তাহাদের মধ্যে
প্রায়ই অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। উভয়ের মধ্যে
একজনের কোন দোষ থাকিলে, অন্যজনে
ছেলে বেলা হইতে উহা দেখিতে দেখিতে
উহাতে একরূপ অভ্যাস হইয়া যায় এবং
শেষে আর এইরূপ দোষের তীব্রতা অনুভব
করিতে পারে না। লোকে বলে দেখতে
দেখতে সমতানকেও সূক্ষ্ম দেখায়, বাস্ত-
বিকই সে কথা সত্য এবং সেই জন্যই বালা
বিবাহের দম্পতীর আশ্রয় কলহ, যৌবনে
বিবাহিত দম্পতীর আশ্রয়কলহের ন্যায় বি-
ষয় হয় না।

এদিকে বালা-বিবাহ প্রবীন পরিপক্

বুদ্ধি পিতা মাতা কর্তৃক সংঘটিত হওয়াতে
প্রায়ই দম্পতীর মধ্যে কোন প্রকার অশু-
পযুক্ততা থাকে না এবং তজ্জন্য যৌবনে
দম্পতি মধ্যে কলহ হইবার বিশেষ কোন
কারণও বর্তমান থাকে না।

স্মৃল কথা দম্পতীর সুখ ধরিতে গেলে
বালা-বিবাহ যৌবনবিবাহ-পেক্ষা নহস্ত-
ত্ত্বে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের জন্য বালা বিবাহের আবও
একটি গুণ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে
একান্নভুক্ত পরিবারের প্রথা প্রচলিত।
এ প্রথা শীঘ্র যে উঠিয়া যাইবে এরূপ
বোধ হয় না কারণ অনেকে এখনও ইচ্ছা
বিলক্ষণ পক্ষপাতী। যৌবনে বিবাহিতা
স্ত্রী আসিয়াই কখনও স্বামীর পিতা মাতা
ভাই বন্ধুকে স্বীয় পিতা মাতা ইত্যাদির
ন্যায় জ্ঞান করিয়া উঠিতে পাবে না। তা-
হাব আচরণে তাহার মনের ভাব অবশ্যই
কিছু না কিছু প্রকাশ হয়। স্ত্রীত্ব স্বামীর
আত্মীয়বর্গ নুতন বধূর ব্যবহারে বিবর্ত হইয়া
যান। স্ত্রীও সেই কারণে স্বামীর আত্মীয়-
বর্গের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। এইরূপে
পরিবার মধ্যে ভয়ানক আশ্রয়কলহের সূত্র-
পাত হয়। বালা-বিবাহিত স্ত্রী স্বপুত্রালয়ে
আসিলে সে ছেলে মাহু বালিয়া স্বামীর
আত্মীয়গণ তাহার কোন প্রকার আচরণেই
প্রায় অসন্তুষ্ট হন না অন্ততঃ অনেকটা মাপ
করিয়া লন। এবং তাহার প্রতি ঘৃণা ও
ভালবাসা দেখাইতেও ক্রটি করেন না।
সেও তাঁহাদিগকে পিতা মাতা ভ্রাতা ইত্যাদি
দির স্থানীয় করিয়া লয়। এইরূপে পরিবার

মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রণয় স্থাপিত হয়। বাস্তবিক যৌবনবিবাহ ও একাম্রভুক্ত পরিবার কখনই এক সমাজে একত্র প্রচলিত থাকিতে পারে না।

২য় তর্ক। বাল্যবিবাহে স্বামী জীর প্রতি ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। তজ্জনা তাহাদের মধ্যে অস-মিলনের কারণ হয়। উঠে—ইত্যাদি—

এই তর্ক প্রথম তর্কের একটা শাখা মাত্র। এবং তাহার যে উত্তর দেওয়া গিয়াছে এ সম্বন্ধেও প্রায় সেই উত্তর দিলেই চলে। ছেলেবেলা হইতে একত্র থাকায় স্বামী জীর চরিত্র এবং স্ত্রী স্বামীর চরিত্র শিক্ষা করিতে বেশ সময় পায়। সুতরাং যৌবন কালে তাহার পরস্পরের মন যোগা-ইয়া কাজ বেশ করি- কম হয়। এ বিষ-য়েও বাল্য-বিবাহ যৌবন বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩য় তর্ক। বাল্য বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন ক্লম হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

অনেক সময় বাল্য-বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন ক্লম দৃষ্ট হয় লক্ষ্যেই নাই। কিন্তু এ বিষয়ে দোষটা বাল্য-বিবাহের না বাল্য-দম্পতীর অভিভাবকগণের ভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

শাস্ত্র সমত বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলে নব্বয়তঃ 'নৈমিত্তিক' বাল্য-বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। কিম্বা আরো নানা রূপ মন কল জন্মাইবে এবং তজ্জনা বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকা অবস্থায় মালিক বালিকার মন ও শরীর ক্লম হইয়া যেরূপ কথা ছিল

তখনও প্রায় সেইরূপ হইতে থাকিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বোর্ডিং স্কুল ও কলেজের ছেলেদের যেরূপ চরিত্রের কথা শুনিতে পাই তাহা হইতে আমাদের দেশের বাল্যকালে বিবাহিত ছেলেদের স্বভাব সহস্রগুণে ভাল। যদি বল অভিভাবকগণ যত্ন লইলেই এ সকল নিবারণ হইতে পারে, আমি বলি অভিভাবকগণ যত্ন লইলে বাল্য-বিবাহেও কোন হানি হইতে পারে না?

৪র্থ তর্ক। বাল্য বিবাহে দম্পতী উপ-যুক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি।

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশের বিবাহিত ছাত্রেরা—কি ইংলণ্ডের অবিবাহিত ছাত্রদের অপেক্ষা শিক্ষা বিষয়ে কম পটুতা ও যত্ন দেখাইয়া থাকে? বরং দেখা যায় অনেক ছেলে যাহারা নিজে পাঠব্যয় কুলাইতে অনন্যম তাহার শ্রমের সাহায্যে মার্জ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এরূপ মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ছেলেটা বিবাহে মাটি হইয়া যায়। 'বৌ' ধরেই 'বই' ছাড়ে। "এদিকে মা লক্ষ্মীও ঘরে এলেন ওদিকে মা সরস্বতীও বিদায় হইলেন"। অন্য পক্ষে বৌএর মুখ ছোট হইবে, বৌকে গজনা দিবে এইরূপ ভয়ে ছেলেরা বিশেষ মনো-যোগের সহিত পড়িয়া বেশ উন্নতি দেখা-ইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কি পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত গুলি অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক নহে? যাহালাব ছাত্র জীবন যদি কেহ বিশেষ করিয়া সাচনা করিয়া থাকেন তিনি

অবশ্য আমার সহিত একমত হইবেন।
আমর প্রকৃত পক্ষে বিবাহ করিয়া ছেলে
মাটি হওয়া অনেকটা অভিভাবকগণের গুণে
ঘটিয়া থাকে।

বালিকাগণের অল্প বয়সে বিবাহ হও-
য়ার অনেক সময় তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত
লুপ্ত হয় বটে কিন্তু তাহার প্রকৃত কারণ
স্বী শিক্ষার প্রতি অনাস্থা, বাল্য বিবাহ
মহে।

৭ম ও ৯ষ্ঠ তর্ক। বাল্য-বিবাহে ধন-
সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয়। বাল্যকালে বিবা-
হিত স্বামী অনেক সময় স্ত্রী পুত্রকে ভরণ-
পোষণ করিতে সক্ষম হয় না ইত্যাদি।

এ অনিষ্টগুলিও কতক পরিমাণে অ-
ভিভাবকগণের ক্রটিতে ঘটিয়া থাকে।
যে অভিভাবক পুত্রকে একরূপ বিত্ত দিতে
না পারেন যে তদ্বারা সে সম্বন্ধে পরিবার
প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে, সে
অভিভাবকের পক্ষে পুত্রকে বাল্য বিবাহ
দেওয়া অপরিণামদর্শীর কার্য। কিন্তু অল্প
লোকে নির্লক্ষিত্য যে অনিষ্ট ঘটায় তাহা
নিবারণ জন্য একেবারে বাল্যবিবাহ রহিত
করিয়া ধনী ও বিবেচক পিতা হইতে
পুত্রের বিবাহের এই স্বাধীনতা হরণ করা
কি যুক্তি-সঙ্গত ?

আবার এইরূপ ঘটনাই অধিক সময়
দেখা যায় যে অবিবাহিত পুরুষ নিতান্ত
অমিতব্যয়ী, ধন সঞ্চয় করিতে আদবেই
সক্ষম নহে। বিবাহ করিয়াই যেন তাহাদের
মতি ফেরে, সর্ব বিষয়ে বেশ মনোযোগী
হয়, ও ধনসঞ্চয়ে বরগান।

দিগের অবিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত পুরুষ-
দের চরিত্র ঘাহারা পর্যালোচনা করিয়া-
ছেন তাহারা এবিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-
বেন। যত দিন বিবাহ না করিবে তত দিন
যেন ইংরাজ পুরুষের কেন্দ্র স্থির হয় না।
মতিগতি নিতান্ত যেন ছড়ান থাকে। বাল্য-
বিবাহিত স্বামীকে প্রায়ই একরূপ দোষে
দোষী দেখা যায় না। সুতরাং অনেক
সময় ধনসঞ্চয়ের পক্ষে বাল্য-বিবাহ প্রতী-
কূল না হইয়া বরং অমুকূলই হইয়া থাকে।

৭ম তর্ক। বাল্যবিবাহে স্ত্রীদিগের ম-
নের স্বাধীন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি।
আমাদের সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে
এটা মঙ্গল কি অমঙ্গল ঠিক বলা যায় না।
সমাজে রীতিমত একরূপ কোন উপায় নাই
যাহা দ্বারা স্ত্রীলোকের স্বাধীন ভাবে
জীবন নির্বাহ করে। তাহাদিগকে কা-
হার না কাহার গলগ্রহ হইতে হইবেই
হইবে। একরূপ অবস্থার স্বামীর (অথবা
অভিভাবকের) সহিত সর্ব বিষয়ে এক মত
থাকাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়। স্ত্রীলোকের
মনের স্বাধীন ভাব আছে একরূপ কথা শু-
নিতে বড় মধুর বটে কিন্তু সমাজের বর্তমান
সামর্থ্য বড় সঙ্কট নহে। যখন Fox এবং
Burke এর ন্যায় বিত্ত ব্যক্তি বিদে-
শীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় ভিন্নমত প্রকাশ
করিলে কালের বহুবল কুলিয়া ফেলেন এখন
অতি নিকট সমাজের ও কথার আমাদের
'মাতৃ' ও 'পিতৃ' পুত্র পুত্র ভিন্ন মত হ-
ইবে যে তাহাদের মধ্যে ঐক্যমতি হইবে
ইহা বিচিন্তনীয়। বর্তমানের স্ত্রীলোকের

মন প্রাণ স্বামীতে অর্পণ করিয়াছে (কথা শুনা একটু তলাইয়া বুঝিবেন—অর্থাৎ যে স্ত্রী সর্ব বিষয়ে স্বামীর অধীন হইতে ও নিজের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ করিতে শিখিয়াছে) সেই স্ত্রীই আমাদের আদর্শ স্ত্রী। সেই আমাদের ‘গৃহ লক্ষ্মী’। দ্রৌপদীর কতকটা স্বাধীন মত ছিল—সেই জন্যই ‘অ-হলা দ্রৌপদী’ ইত্যাদি শ্লোক থাকিলেও আমরা তাঁহাকে সত্যিই জেনা বড় মন খুলিয়া ভক্তি করিতে প্রস্তুত নহি। আর সীতার কি না স্বাধীনতা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহার নাম সুনীবা মাত্রই আমাদের অন্তরায়। যেন গলিয়া আইসে।

৮ম তর্কে উপস্থাপিত অনিষ্ট নিবারণার্থ বাল্যবিবাহ রহিত করার ফল কিছু মাত্র নাই। বরং তজ্জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা কর।

৯ম তর্ক। বাল-স্ত্রী প্রস্তুত সন্তান ও ক্ষীণকার হয় ইত্যাদি।

আমাদের দেশের পণ্ড পক্ষী গুলির সন্তান, বৃক্ষ লতাদির ফলও অতি অল্পবয়সে হইতে দেখা যায়। এবং সে গুলিও প্রায়ই কৃশকায় ও অপূর্ণ। কেনা দেখিয়াছে তিমি বছরের মারিকেলের গাছে বেশ গুটী ধরে, কিন্তু ফলে পরিণত না হইতে হইতেই শুকাইয়া যায়। এক্ষণ হওয়ার কারণ কি? আমাদের পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও কি বাল্যবিবাহ প্রবেশ করিয়াছে? বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে অল্প বয়সে সন্তান হওয়ার ও বহুতন কীর্তিকার হওয়ার বাল্য বি-

বাহ বাতীত অন্যান্য কারণও থাকে সম্ভব। * আর বাল্যবিবাহের এ সম্বন্ধে কোন দোষ থাকিলেও দোষের গুরুত্ব এত অধিক নহে যে তজ্জন্য বাল্যবিবাহ একেবারে রহিত করা উচিত। †

আমাদের দেশের লোককে সবল ও পূর্ণকায় করিতে ইচ্ছা হইলে বিবাহের ক্ষেত্রের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা কর। যাহাতে অন্তর্জাতিক বিবাহ (inter marriage) প্রচলিত হয় তজ্জন্য যত্নবান হও। আর বিবাহের ক্ষেত্রের আয়তন বর্দ্ধিত হইলে এখন অনেক সময় দায়ে চৈকিয়া যে সমুদায় নিন্দনীয় বাল্য বিবাহ ঘটয়া থাকে তাহার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। বাল্য বিবাহ রহিত করিয়া বিবাহের সম্বন্ধে নূতন একটা অধীনতা সৃষ্টি করা অপেক্ষা বিবাহের স্বাধীনতা আর একটু বর্দ্ধিত হইতে চেষ্টা কর। অধীনতা শৃঙ্খল পরা স্ত্রী স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হও। তাহা হইলেই লোকে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিজের ইচ্ছা দ্বারা লাইতে যত্নবান হইবে এবং ক্ষেত্র বিস্তৃত থাকায় অনেক পরিমাণে তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইবে।

১০ম তর্ক। বাল্যবিবাহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

* সম্ভব থাকিলেও বাল্যবিবাহ না হইলে বাল্যকালে সন্তান জন্মবার আর আশঙ্কা থাকে না।

† ইহা হইতে বাল্যবিবাহের দোষের আর কি অধিক গুরুত্ব হইতে পারে বুঝিতে পারি না। ভাং সং

এ তর্কটি বস্তুতঃ বড় ঠিক নহে। এ বিষয়ে সুভাব একটি সুন্দর উপায় দ্বারা নিজের প্রভাব বজায় রাখেন। দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে যে স্ত্রীর অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় তাহার কোন দুই সন্তানের বয়সের ব্যবধান, যে স্ত্রীর দীর্ঘ বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় তাহার কোন দুই সন্তানের বয়সের ব্যবধান অপেক্ষা দীর্ঘ। আবার যে স্ত্রীর অধিক বয়সে সন্তান হয় সে যত বয়স পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম, যে স্ত্রীর অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় সে তত বয়স পর্য্যন্ত সন্তানোৎপাদনে সক্ষম নহে। এইরূপে বালাবিবাহিতা স্ত্রী ও যৌবনে বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান সংখ্যা প্রায় গড়ে সমান। এই জন্যই আমাদের দেশের মহিলাগণের প্রসূত সন্তানের সংখ্যা গড়ে ইংলও প্রভৃতি দেশীয় মহিলাগণের প্রসূত সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক নহে। আমাদের দেশে অল্প বয়সে সন্তানের মৃত্যু সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। তাহাতেও লোক সংখ্যার বৃদ্ধি সংযত হয়। অনেকে বলেন এরূপ মৃত্যুর আধিক্যের কারণ বালাবিবাহ। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বাল-স্ত্রীর অল্প বয়সে প্রসূত সন্তানদ্বয়ের বয়সের ব্যবধান হইতে যুবতী স্ত্রীর প্রসূত সন্তানদ্বয়ের বয়সের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হওয়ায় উভয়ের সন্তানই প্রায় একরূপ সবল ও সুস্থকার্য্য দৃষ্ট হয়। এজন্য বোধ হয় আমাদের দেশে শৈশব মৃত্যুর আধিক্যের বালাবিবাহ ব্যতীত

অন্যান্য কারণ আছে। বাহা হউক এ বিষয়ে বালাবিবাহের কোন বিশেষ দোষ থাকিলেও বাহাতে অল্পবয়সে সন্তান না হয় তদ্রূপ চেষ্টা করিলেই সে দোষ নিরাকৃত হইতে পারে।

পূর্বে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকার দুইখণ্ডে প্রকাশ করিলে বিষয়টি সম্যক্রূপে আলোচনা হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য সমুদায় বিষয়ই আমাদের সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আইন দ্বারা বালাবিবাহ রহিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়া বাহাতে যৌবন বয়সে রমণীগণের বিবাহে কোন সামাজিক দোষ না থাকে, ও বাহাতে অসমবর্ণ ও অসমজাতি বিবাহ দেশে প্রচলিত হইতে পারে তৎ

বিবাহের দোষগুলি বাহাতে সাধারণে বেশ বুঝিতে পারে তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে অবস্থানুসারে যে খেতাব সুবিধা বিবেচনা করিবে সে তদনুসারে বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে। অনেকে হয়ত বালাবিবাহের দোষটুকু ভাগ করিয়া তাহার গুণটুকু গ্রহণ করিয়াও বালাবিবাহ করিতে সক্ষম হইতে পারে।

ইদানীং আমাদের দেশে ইউরোপীয়দের দেখাদেখি এক সম্প্রদায় লোক আবিষ্কৃত হইয়াছেন এবং তাহাদের সংখ্যাও বিয়ল নহে তাঁহারা স্বাধীন বিবাহেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা স্বাধীন প্রণয় Free-love প্রণয়

করিতে যত্নবান। তাঁহারা বলেন সভ্য সমাজে স্বাধীন প্রণয়ই সর্বাপেক্ষা মঙ্গল-কর। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বলিতে গেলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিয়া যৌবন বিবাহ প্রচলিত

করাই শ্রেয়। কারণ একটু অসুখাবশ করিলেই বুঝা যাইবে যৌবন বিবাহ প্রচলিত হইলে স্বাধীন প্রণয় শীঘ্রই প্রচলিত হওয়ার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীসিকলাল সেন।

সমন্য।



আজকাল প্রায় এমন দেখা যায় অনেক বিষয়ে অনেক রকম মত উঠিয়াছে, কিন্তু কাছের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। এমনও দেখা যায় অল্প বয়সে যাঁহারা পরমোৎসাহে সম্পূর্ণ নুতন করিয়া সমাজের পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কক্ষিৎ অধিক বয়সে তাঁহারা পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র ভাবে সংসার যাত্রা নিরীক্য করিতেছেন। অনেকে ইহাব কারণ এমন বলেন যে বাঙ্গালীদের কোন মতের বা কাছের উপরে যথার্থ অকৃত্রিম স্নেহভীর অস্থির নাই—মতগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য হৃদয়ের যতটা বলের আবশ্যক তাহা নাই। একথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা নহে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কতগুলি কারণ ছুটিয়াছে।

সমাজ ধ্বংস সমন্য হইয়া দাঁড়ায় তখন মস্তিষ্ক সবল কাজ করিতে পারে না, বখন তখন পাঁচটি গর্তের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া বাঁশ কৌশল রাখিয়া তারিরা পাওয়া যায় না তখন প্রত্যেকেরে ঢলি অলম্বব। কিবা

যখন মাথা টলমল কবিতোছে কিন্তু পা শক্ত আছে, অথবা মাথা ঠিক আছে কিন্তু পায়ের ঠিকানা নাই—তখন যদি চলিবার বিশেষ বাধ্যতা হয় তবে জমির দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বলসমাজ নামক যে মাকড়বার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে আমাদের আসমানগামী মতের ডানা দুটো পোলনা আছে বটে কিন্তু ছটা পা জড়াইয়া গেছে। ডানা আফালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোন সুবিধা হইতেছে না। এখানে ডানা দুটো কেবল কঠোরই কারণ হইয়াছে।

যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না—জ্ঞানের উপর বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ আরম্ভ করিলাম পদে পদে তাহার উর্দ্ধা উপস্থিতি হইতে লাগিল সে কাজ আর গা লাগে না।

আমাদের সমাজ যে উত্তরোত্তর অটল সমন্য হইয়া উঠিতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছে বিধবাবিধাহ

ভাল কেহ বলিতেছে মন্দ, কেহ বলিতেছে
বালা-বিবাহ উচিত কেহ বলিতেছে অসুচিত,
কেহ বলে পরিবারের একান্তবর্তিতা উঠিয়া
গেলে দেশের মঙ্গল কেহ বলে অমঙ্গল,
আসল কথা, ভাল কি মন্দ কোনটাই বলা
যায় না—কোথাও বা ভাল কোথাও বা
মন্দ।

বর্তমান বঙ্গসমাজ যে এতটা ঘোলাইয়া
গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রা-
চীনকালে জী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ
শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ন্যূনত্ব ছিল বটে
কিন্তু শিক্ষার সাম্য ছিল। সকলেরই বিশ্বাস,
লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, কৃতি, ভাব এক প্রকারের
ছিল। সমাজ-সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উঁচু-
নীচ অবশ্যই ছিল কিন্তু তেলে তেলের মত
একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে
বিতর্কিতা ছিল তাহার ভিতরেও জাগ্রততা-
বের একটি ঐক্য ছিল, সুতরাং একতর সমাজে
জটিলতার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে
সমাজ সবল ছিল কি দুর্বল ছিল, কণ্ঠ ছিল
কি অলস ছিল, সে কথা হইতেছে না, কিন্তু
তাহার সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ছিল অর্থাৎ তাহার
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল; কিন্তু
এখন সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেছে। সেই
জন্য বী কাণ এক শোনে ডান কাণ আর
শোনে, ভূমি মাথা নাড়িতে চাহিলে, ভো-
মার হুই পারের হুই বৃদ্ধ আতুল নড়িয়া
উঠিল, এক করিতে আর হয়।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত ও
অশিক্ষিতের মধ্যে বিজাতীয় প্রভেদ দাঁড়াই
রাছে। সুতরাং জী পুরুষের মধ্যে, উচ্চ

নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে অর্থাৎ
বাপে বেটায় এক প্রকার জাতি ভেদ হই-
য়াছে। যেখানে জাতিভেদ আছে অথচ
নাই, সেখানে কোন কিছুই হিসাব ঠিক থাকে
না। দুই বৃক্ষ দুই দিকে যদি মুখ করিয়া
থাকে তাহাতে উদ্ভিদরাজ্যের কোন ক্ষতি
হয় না—কিন্তু যেখানে ডালের সঙ্গে গুঁড়ির,
আগার সঙ্গে গোড়ার মিল হয় না সেখানে
ফুলের প্রত্যাশা করিতে গেলে আকাশ-কু-
সুম পাওয়া যায় এবং ফলের প্রত্যাশা ক-
রিতে গেলে কদলীও মিলে না।

আমাদের সমাজ যদি গাচপাকা হইয়া
উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা
হইলে জাতিতে গোঁসাতে এত মনান্তর, ম-
তান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দু-
সমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে
বল পূর্বক পাকান হইতেছে। ইহার একটা
আশু উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই
পাক ধরে, গাছে পাঁচ দিনে বাহা হয় এই
উপায়ে একদিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজেও
তাহাই হইতেছে। বঙ্গসমাজের যে অংশে
ইংরাজী সভ্যতার ভাত লাগিবে সে
খানটা দেখিতে দেখিতে সাল হইয়া
উঠিতেছে, কিন্তু শামল অংশটুকুর সঙ্গে
তাহার কিছুতেই বনিতেনে না। একতর
ফলের মধ্যে সহজ নিরম আর খাটে না।

পুরুষদের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষা ব্যাপ্ত
হইয়াছে, জীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শি-
ক্ষার প্রভাবে পুরুষেরা স্থির করিয়াছেন
বালা-বিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক—
ইহাতে সমাজ দুর্বল হয়, অলস বরষে বর-

পরিবাবের ভায়ে সংস'র সাগরের অশ্রুপূর্ণ
লোনাঙ্গলে হাবুডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি ।
এই শিক্ষাব গুণে তাঁহারা আত্মসংযম পূর্বক
নিজের ও দেশের দুব মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করি-
বাব পক্ষে উপযোগী হন । কিন্তু স্ত্রীলোকেরা
একপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে
বিবাহ করিবাব জন্য প্রস্তুতও হন নাই ।
তাঁহারা অন্তঃপুবেব পুৰাতন প্রথার মধ্যে,
ঠাট্টাব সম্পর্কীয়দেব চিবন্তন উপহাস বিক্র-
পের মধ্যে, বিবাহ প্রভৃতি গৃহ কণ্ঠেব নানা
বিধ আত্মযজ্ঞিক অমুষ্ঠানের মধ্যে আশৈশব
লালিত পালিত হইয়াছেন । আপিষের অ-
ম্মের ন্যায় প্রভূষেই তাঁহাদিগকে খবতাপে
চড়ান' হইয়াছে, এবং ক্রমাগত গবর্ম'মসলা
পড়িতেছে--চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ,বড়
জোর সাড়ে দশের আগাই রীতিমত 'ক'নে'
আকারে তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে
দেওয়া যাইতে পারে । সুতরাং স্ত্রীলোকদেব
বালাবিবাহ আবশ্যক । কিন্তু পুরুষেবা অধিক
বয়সে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে মেয়ে-
দের বর লীজ জুটবে না—তাঁহাদিগকে
দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা কবিতে হইবে ।
তাঁহা ছাড়া অধিক বয়স্ক পুরুষেরা নিতান্ত
অল্প বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিতে সঙ্কতও
হইবেন না । অথচ বহু দিন অপেক্ষা করি-
বার মত অবস্থা ও শিক্ষা নহে—বিশেষতঃ
প্রাচীনারা কন্যার বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া
রিয়াহের আবশ্যকতা সঙ্কে রীতিমত আ-
জ্ঞান করিয়া বেড়াইতেছেন । অনেকে
বলিবেন স্ত্রীশিক্ষাও ত প্রচলিত হইয়াছে ।

কিন্তু সে কি আর শিক্ষা ? গোটা দুই ইং-
রাঙ্গি প্রাইমার গিলিয়া, এমন কি এন্ট্রেন্সের
পড়া পড়িয়াও কি কঠোর কর্তব্যকর্তব্য
নির্ণয়ের শক্তি জন্মে ? শত শত বৎসরের
পুরুষানুক্রমবাহী সংস্কারের উপরে মাথা
তুলিয়া উঠা অল্প শিক্ষা ও অল্প বলের কাজ
নহে । রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া
ও অন্তঃপুবেব চিরন্তন আবহাওয়ার পরি-
বর্তন-হওয়া এখন অনেক দিনের কথা ।
অথচ বালা বিবাহের প্রতি বিদেহ আজই
জাগিয়া উঠিয়াছে । এখন কি করা যায় ?

একান্নবর্তী পরিবাবের মধ্যে বাস কবি-
তেছি অথচ বালা বিবাহ উঠাইতে চাই ।
একান্নবর্তী পরিবাবের মধ্যে অধিক বয়স্ক
নূতন লোক প্রবেশ করিতে পাবে না ।
চবিত্ত গঠনের পূর্বেই উক্ত পরিবাবের স-
হিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন
লোক অচর্কিত কঠিন খাদ্যেব ন্যায় পরি-
বাবের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে ।

এই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া
গেল তেমনি আরেক শ্রেণীর আরেকটা
উদাহরণ দওয়া যাক । ইংরাজি শিক্ষা-
সঙ্গেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন
যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত
নহে । বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন
করিয়া থাকার অপেক্ষা মহত্ব আর কি হইতে
পারে ? ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটি
পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

যখন আজন্মকালের শিক্ষা ও
শের প্রভাবে বঙ্গনারী স্বামী'

জ্ঞান করিত—স্বামীকেই স্ত্রীলোকের চরম-
গতি, পবন-মুক্তির কারণ বলিয়া জানিত,
তখন বিধবাদের ব্রহ্মচর্যা পালন করা স্বাভা-
বিক ছিল, এবং না করা দুঃখ ছিল। কিন্তু
সে শিক্ষা, সে উদাহরণ, সে ভাব চলিয়া
যাইতেছে, তবে ব্রহ্মচর্যা ত্রুত কিসের বলে
ধাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া কেবল একটা
বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করার কোন ফল নাই,
তাহার আভ্যন্তরিক ভাবেই তাহার মহত্ব।
এককালে আমাদের সমাজ ভক্তি ও স্নেহের
সুত্রেই গাঁথা ছিল। তখন পুত্র পিতাকে,
শিষ্য গুরুকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, সমস্ত
স্নেহাস্পদেরা সমস্ত গুরুজনদের অসীম ভক্তি
করিত। সমাজের সে অবস্থায় স্ত্রীও স্বামীকে
দেবতা জ্ঞান করিত। সমাজের সমস্ত সুর
এক হইয়া মিলিত। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার
প্রভাবে সমাজের মধ্যে জোষ্ঠ কনিষ্ঠ একা-
কার হইয়া আসিতেছে। এখন বড় ভাইকে
ছোট ভাই, গুরুজনদিগকে স্নেহাস্পদেরা,
এমন কি, পিতাকে পুত্র তেমন ভাবে দেখে
না, তেমন করিয়া মানে না—ইহা কেহই
অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সংক্রা-
মক ভাব যদি সমাজের সর্বত্রই আক্রমণ
করিয়া থাকে তবে কি কেবল পতি-পত্নীর
সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে
পারে? তাহাদের মধ্যেও কি সামান্য
প্রবেশ করে নাই অথবা ক্রতবেগে করি-
তেছে না? চারিদিকের উদাহরণে এই

অভাব কি মনে হইতে শিথিল হইয়া
আগেকার বউরা খাণ্ডড়িকে
করিত এখনকার বউরা কি

তেমন মান্য করে? খাণ্ডড়ির প্রতি যে
কারণে ভক্তির লাঘব হইয়াছে সেই কার-
ণেই কি স্বামীর প্রতিও ভক্তির লাঘব হয়
নাই? তবে কিরূপে আশা করা যায়
পূর্বে যেরূপ অচলা নিষ্ঠার সহিত বিধবারা
ব্রহ্মচর্যা পালন করিতেন এখনও তাহার
সেইরূপ পারিবেন? এখন বলপূর্বক সেই
বাহ্য অনুষ্ঠান অলব্ধন করাইলে কি সমাজে
উত্তরোত্তর গুরুতর অধর্মাচরণ প্রবেশ করিয়া
দারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিবে না?

বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে আরও একটা
কথা আছে। আমাদের সমাজে একান্নবর্তী
পরিবারের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে।
গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি ও আশ্রয়
বিসর্জনই একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠা-
স্থল। এখন সামান্যতঃ সমাজে বন্যার মত
আসিয়াছে, কোঠা বাড়ি হইতে ককির বেড়া
পর্যন্ত উঁচু জিনিষ যাহা কিছু আছে সমস্তই
ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া শি-
ক্ষাও যত বাড়িতেছে মতভেদও তত বাড়ি-
তেছে। দুই সহোদর ভ্রাতার জীবন যাত্রার
প্রণালীও মতে মিলে না, তবে আর বেশী
দিন একত্র থাকা সম্ভবে না। একান্নবর্তী
পরিবার-প্রথা ভাঙিয়া গেলে স্বামীর মৃত্যুর
পর একাকিনী বিধবা কংহাকে আশ্রয় ক-
রিবে? বিশেষতঃ তাহার যদি ছোট ছোট
দুই একটি ছেলে থাকে তবে তাহাদের
পড়ান শুনান রক্ষাব্যবস্থা কে করিবে?
আজ কাল যেরূপ অবস্থা ও সমাজ বৈদিকে
যাইতেছে তাহারই উপযোগী পরিবর্তন ও
শিক্ষা হওয়া কি উচিত নয়।

কিন্তু যতদিন একান্নবর্তিত একেবারে না ভাঙ্গিয়া যায় তত দিনই বা বিধবাবিবাহ সূচ্যক্ৰ রূপে সম্পন্ন হইবে কি করিয়া? স্বামী ব্যতীত স্বশ্রুতালয়ের আর কাহারও সহিত যাহার ভেদন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না সে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিয়া স্বশ্রুতালয়ের সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে তাহাতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে স্বশ্রুতালয়ে স্বামী ছাড়াও কত শত বন্ধন। অতএব স্বামীর মৃত্যুতেই স্বশ্রুতালয় হইতে ধর্ম্মতঃ মুক্তি লাভ করা যায় না। এত দিন যাহাদের সহিত রোগে শোকে বিপদে উৎসবে অহুষ্ঠানে সুখ দুঃখের আদান প্রদান চলিয়া আসিয়াছে, যাহাদের গৌরব ও কলঙ্ক ভোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, যেখানকার শিশুরা ভোমার স্নেহের উপরে নির্ভর করে, সমবয়স্কেরা ভোমার মমতা ও মাস্তনার উপর নির্ভর করে, গুরুজনেরা ভোমার সেবার উপর নির্ভর করে, সেখান হইতে তুমি কোন ক্রমে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। তাহা হইলে ধর্ম্ম থাকে না, পরিবারে অশান্তি থাকে না। সমাজের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ বিধবার যদি সম্মান থাকে, তাহাদিগকে এক বংশ হইতে আর এক বংশে লইয়া গেলে পরিবারে অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়, যদি না লইয়া যাওয়া হয় তবে সম্মানহীন মাতৃহীন হইয়া থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে, যে, জীলোকদিগকে অন্তঃপুরের বাহির করা উচিত হয় না, তাহাতে তাহাদের

-অন্তঃপুরস্থলভ কমণীয়তা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথাই সত্যমিথ্যা গুণ-গুণ লইয়া আমি বিচার করিতে বসি নাই। পূর্বেই এক প্রকার বলিয়াছি সমাজের বর্তমান বিপ্লবের অবস্থায় কোন্ কাজটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী কোন্টা নয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

বঙ্গনারীদের মুখপদ্ম যদি দুর্ভাগা স্থ-
 য়ের ভূষিত নেত্রপথের অন্তরাল করাই
 অভিপ্রেত হয়, তবে, বর্তমান বঙ্গসমাজে
 তাহার কতকগুলি বাধা পড়িয়াছে, আমি
 তাহাই দেখাইতে চাই। একটা দৃষ্টান্ত
 দেখিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে। প্রা-
 চীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তে-
 মন সুবিধা ছিল না—ব্যয় অধিক এবং পথে
 বিপদও অনেক ছিল। এই জন্য তখনকার
 রীতি ছিল “পথে নারী বিবর্জিত।” এই
 জন্য পুরাকালের পথিকগণের বধূজন বি-
 লোপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন
 সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। রেলের প্র-
 সাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথে বিপদও
 নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজ
 কর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প,
 কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রী পুত্রের বিরহ
 কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক-
 একটা গাড়ি একলা অধিকার করিতে পা-
 য়েন এমন সঙ্গতিও অল্প লোকের আছে।
 এই জন্য আজ কাল প্রায় দেখা যায় পর-
 পুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন ক-
 রিয়া অনেক ভ্রমলোকের পরিবার রেল-
 গাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উদ্ভয়োত্তর

এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারবার পুনিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআঁটি তত গুরুতর নহে। অস্ত্রপুত্র হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায় তাহা হইলে সমাজ নিয়মের বাধা আর বড় কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে হয়—পূর্বে অবদোষপণ্য সর্ববাদীনস্কৃত ছিল স্তব্ধতা তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান কেহ বা যান না। বাহ্যিক না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। স্তব্ধতা স্বভাবতই বাহিরে যাওয়া মাত্রই তাঁহাদের ভেতন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহলও জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার একদিকবিশনে যত পুরনারী সমাগম হইয়াছিল, বিশ্ববন্দর পূর্বে ইহার শিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্তনের প্রবলপ্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করা বুঝা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবেই—তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে যাত্রা করেন অথচ তাঁহাদের

বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অস্ত্রপুত্রের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাত্রা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর সে তোমার কচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—রীতিমত ভদ্রবেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের ভদ্র বেশ পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষেরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্রসমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যন্ত্রে সঙ্গরণীয় সাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিগর্হিত ব্যাপার যে ঘটতেছে তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই, একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অস্ত্রপুত্র হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয় অথচ আনিতেও হইবে—এই জন্য অত্যন্ত অশোভন ভাবে কার্যা নির্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্বজনসমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্কৃতদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান' অভ্যাস করাও, তবে তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিতে পার—নজুবা উচ্চা মত বা উপস্থিত স্থিতির খাতিরে এরূপ ভদ্রজননিকর্মান্বিত ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিতে সমস্ত

ভদ্র বঙ্গ-সমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয় ।

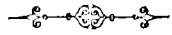
এক দল লোক আছেন তাঁহারা আধা-আধি রকম সমাজ সংস্কার করিতে চান । ভারতীর পঞ্চম খণ্ডে “একচোপো সংস্কার” নামক প্রবন্ধে তাঁহাদের সংস্কার কাণ্ডের বিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছিলাম । উক্ত প্রবন্ধে লিখিত একটি উদাহরণের পুনরুল্লেখ করা যাক । অনেকে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নহেন, অথবা সমাজশাসন লঙ্ঘন করিয়া বিধবা বিবাহ দিতে অপারক, কিন্তু বৈধবা ব্রতচরণে যে সকল কঠোর নিয়ম আছে সে সকল তাঁহারা দূর করিতে চান । স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পত্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবিষয়ে তাহাদের সংশয় নাই কিন্তু পৃথিবীর স্মৃতি হইতে বিধবাদিগকে বঞ্চিত করা তাঁহারা নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করেন । তাহারা নিজের পরিবারেও হয়ত এই মত কিয়দংশে প্রচলিত করেন । কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর স্মৃতি মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা । যদি বিধবাদিগকে বিধবা রাখাই শ্রেয় জ্ঞান কর তবে তাহার কঠোর উপায়গুলিও অবলম্বন কর । বিধবাদিগকে অকারণে পীড়ন করিয়া কেবল মাত্র দানব স্বত্ব লাভ করিবার জন্য সমাজ নিষ্ঠুর খেয়াল অনুসারে এই সকল কঠোর নিয়মের সৃষ্টি করে নাই । বৈধবা ব্রত রক্ষার পক্ষে উপযোগী বলিয়াই অগত্যা এই সকল কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়াছে । অতএব একটাকে ছাড়িয়া আর

একটা রাখিতে গেলে ঘাড়কে ভাঁটিয়া মাথা রাখিতে গেলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় । একটি উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এমন অনেক বিষয়েই প্রাচীন সমাজনিয়মের সহিত রক্ষা করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সমাজের নানা দিকে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে ।

এমন জটিল সমস্যার মধ্যে বাস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অহুরোধে বাকি বিশেষের সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গৌড়ামির কার্য । যদি কোন সাম্প্রদায় এমন আইন জারি করেন, তাঁহাদের দলের সমুদয় লোককেই অবস্থা নির্দিষ্টারে বালাবিবাহ পরিহার করিতেই হইবে, বিধবা বিবাহ দিতেই হইবে, অবরোধপ্রথা ভাঙিতেই হইবে, তবে তাহাতে সমাজের অপকার হইতে পারে । মূল ধর্মনীতি সমূহের ন্যায় সমাজনীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে । পরিবার বিশেষে বালা-বিবাহ উঠিয়া গেলেও হানি নাই, কিন্তু সকল পরিবারেই একথা খাটে না । পরিবার বিশেষে বিধবা-বিবাহ হইবার সুবিধা আছে কিন্তু সকল পরিবারে নাই । স্ত্রীবিশেষ স্বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল স্ত্রী নহে । যাঁহারা বলপূর্বক সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যতই স্কীত হউন না কেন তাঁহাদিগকে সমাজের গর্ভে একটি স্তম্ভরূপে বসিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । সকল অবস্থাতেই আইন পূর্বক বালা-বিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশস্ত পাইতে পারে । অসহ্য নির্দিষ্টারে বিবাহাধিনী

বিধবা মাত্রেই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্য-প্রকার গৌয়ারতমি গৌড়ামি পরিত্যাগ জনক উচ্ছ্রলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী কর। শাস্ত সংঘতভাবে সমাজ সংস্কারের মাত্রেই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয়-প্রতি মন দাও। বাঁধন ছিঁড়বার উপলক্ষে সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়। অতএব এই ভুক্ততর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পক্ষ-সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ করিয়া এক দেহ জড়াইয়োনা।

সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।



এক্ষণে আমরা পূর্বের প্রশ্নে ফিরিয়া আসি—সমাজে সামাজিক শাসনেরই বা কোন কোন বিষয়ে আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই বা কোন কোন বিষয়ে আদিপত্য থাকা উচিত?

কেহ যদি রাস্তার মধ্যে কোন একজন মাননীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অপমান করিয়া কথা বলে অথবা কোন একজন রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রহার করে, তাহা হইলে তাহার পার্শ্ব-বর্তী লোকে তাহাকে কি বলিবে? সে সকল লোকের যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে তবে তাহারা উক্ত ব্যক্তিকে ভৎসনা করিবে অথবা অন্য প্রকারে দণ্ড দিবে। কোন প্রধান কর্মচারী যদি তাহার নিম্নস্থ কর্মচারীদের প্রতি গর্জিত ব্যবহার করেন কিম্বা অন্তর্চিত কর্তৃত্ব দেখান তবে সমাজের লোকে তাহাকে কি বলিবে? তাহার নিন্দা করিবে, তাহাকে মর্যাদাহীন আদর করিবে না। কোন ব্যক্তি যদি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে লোকে তাহাকে কি করিবে? তাহাকে বিশ্বাস করিবে না

তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবে। কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীলোকের প্রতি যথোচিত সম্মান না দেখায় কিম্বা কোন স্ত্রীলোক যদি তাহার স্বাভাবিক মর্যাদা রাখিয়া না চলে তবে সমাজে সে ব্যক্তিকে বা সে স্ত্রীলোককে কি করিবে? সভ্য সমাজে সুশিক্ষিত সমাজে সে ব্যক্তি কিম্বা সে স্ত্রীলোক নিন্দার পাত্র হইবে। এই সকল উদাহরণ হইতে একটা এই সাধারণ নিয়ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যেরূপ কার্যো সমাজের অঙ্গ হইতে পারে আর যেরূপ কার্যো সমাজের অপাতত অঙ্গ না হইলেও সমাজে সুনীতির শাসন শিথিল হইতে পারে ও তন্নিমিত্ত ভবিষ্যতে অমঙ্গল সম্ভাবনা, সামাজিক শাসন দ্বারাই সেরূপ কার্যের দণ্ড বিধান হয়। আমরা যদি সকল পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেও সামাজিক শাসনের প্রয়োগ সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম ভিন্ন আর কোন নিয়ম যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। যে কার্যদ্বারা সমাজের অমঙ্গল হইতে পারে অথবা সমাজের মধ্যে

স্বনীতির বন্ধন শিথিল হইতে পারে, আইন দ্বারা সে কার্যের নিরাকরণ করা কঠিন হইলে কিসা পরামর্শ যোগা না হইলে সামাজিক শাসন দ্বারা তাহার নিরাকরণ হওয়া আবশ্যিক। এইত দেখিলাম সামাজিক শাসনের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিয়ম, এখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নিয়ম আছে কি না? আমি যদি রাতে আমার সমুদয় কর্তব্য কার্যা করিয়া দিনমানের অধিকাংশ সময় নিদ্রা যাই তবে লোকে আমায় কি বলিবে? লোকে যদি আমায় সম্ভবিত্ব বলিয়া জানে, তবে আমাকে বিশেষ কিছুই বলিবে না। আমি দেখি যে অন্য লোকের মস্তকের কেশ দীর্ঘ হইলে তাহার কতক অংশ কাটিয়া ফেলে, কিন্তু আমি যদি তাহা না করি আমি দীর্ঘ কেশ ধারণ করি, লোকে তাহা হইলে কি আমার নিন্দা করিবে? বোধ হয় না, আমাকে একটু অসাধারণ বলিয়া মনে করিবে মাত্র। আমি যদি আমার ভৃত্যকে আমার অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিতে দিই, আমি যদি আমার পালিত কুকুরকে উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, উৎকৃষ্ট বসন, উৎকৃষ্ট শয্যা দিই সমাজ কি তাহা হইলে আমায় সেরূপ কার্যে বাধা দিবে? কখনই না। তুমি যদি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ কর আর অপর অর্দ্ধ দ্বারা সাধারণের কোন উপকার কর, সাধারণের ব্যবহারে আসিতে পারে এমন একটা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেও, সমাজে ভাণ্ডা হইলে তুমি প্রশংসার পাত্র হইবে না নিন্দার পাত্র হইবে? অবশ্য প্রশংসার পাত্র। এই স-

কল উদাহরণ হইতে আমরা এই নিয়ম বাহির করিতে পারি;—যে রূপ কার্যের ফলাফল * কেবল তাহার কর্তারই ভোগ করিতে হইবে যে রূপ কার্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, সে রূপ কার্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা উচিত। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্বন্ধেও এই নিয়মে আসিয়া উপস্থিত হই। সামাজিক শাসনের উদ্দেশ্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ সাধন করা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় সুখ সাধন করা। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যদি সুখ সাধন হয় তবে তাহা হইলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সে সুখের কিছু অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা—আবার সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি অন্যের ক্ষতি না করিয়া স্বস্থ সুস্থ অন্বেষণ করে, তবে সমাজস্থ সমুদয় ব্যক্তির সুখী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যখন সমাজ এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আসে—যখন এই অনধিকার চর্চার প্রবেশ করে—তখন আপনার অমঙ্গল কুড়াইয়া আনে, তবে সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে যখন অতি গূঢ় নিকট সম্বন্ধ, রহিয়াছে তখন সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ

* এস্থলে 'কেবল' কথাটি স্থূলঅর্থে বুঝিতে হইবে। সুস্থ বিবেচনার মূহুর্ষ এমন কোন কার্য করিতে পারে না বাহার ভরস সমাজের অন্য কোন ব্যক্তিকে যাইয়া লাগিবে না।

ভাব উপস্থিত হইলে মঙ্গল সম্ভাবনা নাই, অতএব এই দুয়ের মধ্যে সর্বতোভাবে ঐক্য রাখিয়া আমাদের চলা আবশ্যক আর সে নিমিত্ত যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আধিপত্য কিছু সম্ভব হইয়া আইসে তাহাও ভাল । যেমন যদি একরূপ দেখা যায় যে সমাজের কোন একটা বিশেষ শুভ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘ কেশ ধারণ করা আবশ্যক তাহা হইলে সাহাদিগের দীর্ঘ কেশ ধারণ করিতে অনিচ্ছা হয়, তাহাদিগেরও সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত সে অনিচ্ছা দমন করা উচিত । কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক শাসন ন্যায়পথে চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্তই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া চলিবে । গৃহস্বামী যতক্ষণ তাঁহার মর্যাদা রাখিয়া চলেন ততক্ষণ গৃহস্থিত পরিজন বর্গ তাঁহার সম্মান করে, রাজা যতক্ষণ প্রজার হিতকামনায় রাজকার্য্য নিৰ্বাহ করেন, প্রজারা ততক্ষণ তাঁহাকে ভক্তি করে, সূর্য্য গন্তক্ষণ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে ততক্ষণই পৃথিবী তাহার চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিবে, যে মুহূর্ত্তে সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতে নিরস্ত হইবে সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভাগ করিয়া অনন্ত আকাশে অনন্তপথে ধাবমান হইবে । সেইরূপ যতক্ষণ সামাজিকশাসন তাহার ন্যায় পথে চলিবে, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কার্য্য করিবে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার সহিত মিত্রতা রাখিবে—আর যে দণ্ডে যেক্ষণ সামাজিক শাসন কোন বিশেষ

ব্যক্তি বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিবে সে দণ্ডে সেক্ষণে উহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে । যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সম্প্রদায় তাহার স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে সামাজিক শাসনের সাহায্যে সমাজে কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করে, তখন সমাজস্থ প্রত্যেক মনুষ্যবিশিষ্ট মনুষ্যই সে নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় ।

অন্যায় সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন—যখন কোন স্বার্থপর ব্যক্তি কিবা সম্প্রদায় সামাজিক শাসনকে কুপথে ঢালায় তখনই যে কেবল সামাজিক শাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হয়, এমত নহে । অনেক সময়ে একরূপ দেখা যায় যে সমাজের পূর্ব্বের কোন অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন সে নিয়মগুলি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরই ছিল—এখন অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে, এখন সে সব নিয়মে সমাজের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না, অথচ দীর্ঘ অভ্যাসের এমনই প্রভাব যে সে সকল নিয়ম এখনও সমাজের মনোরঞ্জন করিতেছে । এখনও সামাজিক শাসন সে সকল নিয়মের পক্ষ সমর্থন করিতেছে । একরূপ স্থানেও সামাজিক শাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে । কিন্তু যে স্থলে সামাজিক শাসন সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অগ্রিয় পাত্র হইয়া পড়িয়াছে, সে স্থলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

সংগ্রাম করা সহজ—আর যেস্থলে সামাজিক শাসন সমাজের অপকারী হইয়াও তাহার হৃদয়মনে আধিপত্য করিতেছে সেস্থলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষে দুঃসাহস ব্যাপার। একপক্ষেও মনুষ্যের অনুরোধে অপকারী সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ পাওয়া অতিশয় আবশ্যক। কুসংস্কারাপন্ন সমাজে পুরাতন অশুপযোগী পন্থার পরিবর্তে নূতন উপযোগী পন্থা প্রবর্তিত করা সহজ নহে, কিন্তু তাহা হইলেও অন্ততঃ কেবল একটী আদর্শ দণ্ডায়মান করিবাব উদ্দেশ্যে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তার করিতেই হইবে,—নহিলে সে দেশের কখন উন্নতি হইতে পারে না।

প্রবন্ধটির আয়তন বড় বাড়িয়া পড়িয়াছে, যাহা হউক প্রবন্ধটি শেষ করিবার আগে, সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দুয়ের মধ্যে পরিণামে কি সম্বন্ধ দাঁড়াইতে পারে এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সরের মতটি বলিয়া লই। তিনি বলেন যে কালক্রমে সমাজের একরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে যে তাহার নিজের কার্যক্ষেত্র অতিক্রম না করিয়া যে সকল বাসনা সকল করা যাইতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই সকল ভিন্ন অন্য কোন বাসনা থাকিবে না, আর কার্যের যে সকল প্রতিবন্ধক প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মান্য করিয়া চলিবে সে সকল ভিন্ন সমাজে অন্য কোন প্রতিবন্ধক নিয়ম থাকিবে না।

অর্থাৎ সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দুয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহা কি প্রকারে হইবে। উত্তরে আমরা তাঁহাকে বলিব যে মনুষ্য পরিবর্তনশীল, মনুষ্যের শরীর ও মন এই দুয়ে ক্রমাগত পরিবর্তন চলিতেছে আর এই পরিবর্তন দ্বারা মনুষ্য তাহার নিজের অবস্থা চতুঃপাশ্চাত্য ঘটনাবলীর সহিত ঐক্য করিয়া লইতেছে। দিন যায় রাত্র আইসে, মনুষ্য কাজ কর্ম শেষ করিয়া বিশ্রামার্থে নিজা যায়, গ্রীষ্ম যায় শীত আইসে, মনুষ্য স্বাস্থ্য বস্ত্র পরিভাগ করিয়া স্থূল বস্ত্র পরিধান করে, মিত্র যায় শত্রু আসিল, প্রদারিত ক্রয়বস্তুর পরিবর্তে মনুষ্য কুপিত ক্রয়ধারণ করিল, শীত প্রধান দেশের লোকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিল অথবা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকে শীত প্রধান দেশে আসিল, উভয়ের অভ্যাস, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিবর্তন দেখা গেল; ধর্ম গোড়া পিওরিট্যানদের পরিবর্তে ইংলণ্ডে আমোদপ্রিয় দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব আসিল, ইংরেজরা তাম্রমি পরিভাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার প্রিয় হইল। মুসলমান রাজত্বের পরিবর্তে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইল, বঙ্গবাদীগণ পারস্যভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার চর্চা আরম্ভ করিলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মনুষ্য তাহার নিজের অভ্যাসসমূহকে চতুঃপাশ্চাত্য ঘটনাবলীর সহিত ঐক্য করিয়া লয়। যতদিন পর্য্যন্ত কোন

বিষয়ে বাহিরের অবস্থা এক থাকে, তত-
দিন পর্যন্ত মনুষ্যের ভিতরের অবস্থাও, সে
বিষয়ে মনুষ্যের মনের গতিও এক থাকে,
বাহিরের অবস্থা পরিবর্তন হউক, মনুষ্যের
মনের গতিরও পরিবর্তন ঘটিবে। তবে
কেন নময় সময় একরূপ দেখা যায় যে বাহি-
রের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে অথচ মনু-
ষ্যের অভ্যাসের পরিবর্তন হয় নাই। সে
কেবল সময়ের অল্পতা বা মূর্খতা বা গোঁ-
ড়ামি বা ভণ্ডামির জন্য। কিন্তু প্রকৃতি বড়
কঠিন জননী, তাহার যে সন্তান চতুষ্পাশ্বস্থ
ঘটনাবলীর সহিত স্বীয় জীবন ঐক্য ক-
রিয়া লইতে পারে সেই সন্তানই তিষ্ঠাইয়া
থাকে আর যে সন্তান তাহা পারে না সে
বিষয় প্রাপ্ত হয়, সে অকালে কালকবলে
পতিত হয়। মনুষ্য জীবনের একটা প্রধান
প্রশ্ন এই যে কি প্রকারে আমরা প্রত্যেকে
অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষে না আসিয়া
নির্ধিক্ষে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে পারি,
কি প্রকারে চলিলে আমিও সুখী হইতে

পারি আমার চতুষ্পাশ্বস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ
ও সুখী হইতে পারে, আমরা সকলেই জ্ঞাত
পারেই হউক অজ্ঞাতপারেই হউক এই প্র-
শ্নের মীমাংসার ব্যাপৃত রহিয়াছি, দিব্যরাত্র
এই প্রশ্নের অনুশীলন করিতেছি। দিব্যরাত্র
সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য
সংস্থাপনের উৎসোগ হইতেছে। সমাজ
ক্রমাগত ব্যক্তির উপর আধিপত্য করিতেছে
ব্যক্তিও সমাজের উপর লক্ষ্যভাবেই হউক
আর অলক্ষ্য ভাবেই হউক প্রভুত্ব করি-
তেছে, সমাজকে পরিবর্তিত করিতেছে।
আমি তোমাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার
করিতেছি, তোমরাও আমার কোন কোন
বিষয়ে আমার কথা গুনিয়া চলিতেছ,
আমার ইঙ্গিত অনুসারে কার্য করিতেছ।
এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অবশেষে যে সামা-
জিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়ের
মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে তাহা
কেবল দর্শন শাস্ত্রের স্বপ্নমাত্র নহে।

ত্রীকণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বি, এন্স, সি, লওন।

উপকথা ।

—*—

মেঘের আড়ালে বেলা কখনু যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্জ-পাখা পাখীগুলি
গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তকে ভিজিছে তরুলতা।

বসিয়া আঁধার ঘরে
বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
কভু মনে লয় হেন
এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।

উড়ন্ত মেঘের মত
ঘটনা ঘটত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে ।
বাজ পুত্র অবহেলে
কোন দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু পাব ।
সবোবর ঘাট অ'লা
মণি হাতে নাগ বালা,
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভাব ।
সিন্ধুতীরে কত দূবে
কোন বাফসেব পুবে
ঘুমাইত রাজাব ঝিয়ারি ।
হাসি ভাব মণিকণা
কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবাণি ।
সাত ভাই একস্তবে
চাপা হয়ে ফুটিত বে
এক বোন ফুটিত পাক্রন ।
সম্ভব কি অসম্ভব
একনে আছিল সব
জুটি ভাই সত্য আব ভুল ।

বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা
না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধি বিধান,
হাসি কান্না লঘুকাষা
শব্দের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ ।
আজি ফুবায়েছে বেলা,
জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো-অঁধারের দিন ।
আব ত নাইবে ছুটি
মেঘ বাজ্য গেছে টুটি
পদে পদে নিখম অধীন ।
মধ্যাহ্নে ববিব দাপে
বাড়িবে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে হবে চাষ ।
ঘবে হয়ে প্রাণপণ
কবে তাহা সমাপন
খেলাবই মতন ভেঙ্গে যায় !

শ্রীববীক্ষনাথ ঠাকুর ।

সিন্ধু-কাহিনী ।

ভাই—

তুমি আমাকে আমার বোম্বাই প্রবাসের
বিবরণ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ কিন্তু
কি লিখি কোথায় আরম্ভ করি তাহা আমি
ভাবিয়া পাই না । প্রথমে কোন এক নূতন
দেশে আসিয়া উপস্থিত হইগে অনেক নূতন
ছবি চ'খে পড়ে—নূতন ভাব মনে উদয়
হয় । লোকদের চালচলন রীতিনীতি

সদৃশ অনেক কথা বলিবার থাকে । কিন্তু
আমার চক্ষে এদেশের নূতনত্ব নাই—আমি
এখনকার একজন প্রাচীন বাসেন্দার মধ্যে
গণ্য হইতে পারি । বিশ বৎসর ধরিয়া
আমি এ প্রেসিডেন্সিতে কাজ করিতেছি,
ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রদ-
ক্ষিণ করিয়াছি । স্বল্পভূমিই যে আপনার
দেশ তাহা নহে, যে প্রদেশে জীবনের অধি-

কাংশ ও সারভাগ কাটাইয়াছি, যে লোক-
দের মধ্যে এত কাল বাস করিয়াছি ও
যাহাদের কার্যে আমার শরীর ও মনের সমু-
দয় শক্তি ব্যয় করিয়া কৰ্মক্ষেত্রে প্রাপ্ত
ভাগে আশ্রিয়া পৌছিয়াছি--সেই দেশ ও
লোকদিগকে আপনার বলিয়া বরণ করাই
স্বাভাবিক। আমি ত বোম্বাইকেই নিজের
দেশ মনে করি—এ দেশ আমার হাড়ে
মাসে জড়িত—তাই মনে হয় যেম নতুন
কিছুই লিখিবার নাই, সকল পুরাণে কথা।
তবে এখানে দেখিয়া শুনিয়া আমার যে
জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহা আগড়ম্ব বাগড়ম্ব
বকিয়া যাইতে পারি--তা যদি তোমার
ভাল লাগে।

ভাষা অল্পসামান্য এ প্রেসিডেন্সি সামা-
ন্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে,
গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও সিদ্ধু দেশ।
শেষ থেকে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধুদেশের
কথা পাড়া যাক। সিদ্ধুদেশ ব্রিটিশ রাজ-
পরিবারের নবোদা বধু—ইহা ব্রিটিশ রাজ-
ভুক্ত হইবার পর এখনো অর্দ্ধ শতাব্দী অতি-
বাহিত হয় নাই। ম্যাপে দেখিলে এ প্র-
দেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মনে
হয় না—পঞ্জাবের অঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান
হয়। মধ্যে মধ্যে সিদ্ধুদেশকে পঞ্জাবের
সহিত যোগ করিবার প্রস্তাবও শুনা যায়,
কিন্তু বোধ করি সিদ্ধিদের তাহা ইচ্ছা নহে—
তাহারা বোম্বাই গবর্ণমেন্টের অধীনে হুখে
আছে। এ দেশের ভাষা সিদ্ধি। মারাঠী
গুজরাটীর সঙ্গে ভাষায় সৌম্যমুখ দেখা
যায়—সংস্কৃতই এ সকল ভাষার মূল-জননী।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহার লিখন পদ্ধতি
উর্দু—সংস্কৃত মূলক নহে। অক্ষর অনায়াসে
দেবনাগরী হইতে পারিত—সিদ্ধি ভাষায়
যতশক্তি আছে নাগরীতে তাহা সহজে লিপি-
বদ্ধ করা যাইতে পারে।—কতকগুলি অতি-
কঠোর শব্দ আছে তাহার মধ্যে কেবল
কোন রূপ রেখা কিম্বা বিন্দুর প্রয়োজন।
আমরা যেমন ডু ও ডর মধ্যে বিন্দু দিয়া
প্রভেদ নির্দেশ করি, কতকগুলি সিদ্ধি-অক্ষর
সদৃশে সেইরূপ কোন সঙ্কেত ব্যবহার
করিলেই হইল। তুমি জিজ্ঞাসা ক-
রিতে পার, দেবনাগরীর পরিবর্তে উর্দু
অক্ষর কেন চলিত হইল? ইহার উত্তর,
সরকারের হুকুম। যখন ইংরাজেরা সিদ্ধু-
দেশ অধিকার করে তখন সেখানে লেখা
পড়ার চর্চা ছিল না। বণিকদের হিসাব-
পত্রে এক প্রকার নাগরীর অপভ্রংশ ব্যবহৃত
হইত কিন্তু তা ছাড়া বর্ণাক্ষরের প্রচার ছিল
না। যখন ব্রিটিশ আদালত সকল স্থাপিত
হইল তখন কোর্টের একটা ভাষা ঠিক করা
ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরের সৃষ্টি করা
আবশ্যক হইল। এই সময়ে কোন্ এক
মহাপুরুষের মনে হইল যে উর্দুই উপযুক্ত
অক্ষর—ক্রমে তাহাই প্রচলিত হইল।
আমি যখন সিদ্ধি ভাষা শিখিতে আরম্ভ
করি তখন ভাষা শিখিতে যত না কষ্ট হউক
তাহার লেখা অক্ষর লইয়া তাহার সহস্রভাগ
মৌলযোগ উপস্থিত হইত। উর্দু হাতের
লেখা পড়িয়া উঠা সহজ নয়—দেবনাগরী
হইলে কেমন সহজে লিখিতে পড়িতে শিখি-
বাম। সিদ্ধি লিখিবার সময় এই অক্ষর

প্রণেতার উপর কতবার আমার মনের কাল কাড়িয়াছি তাহার ঠিক নেই—মনে করিয়াছি—আঃ এই আনাড়ীর হাতে না গিয়া যদি শর্ম্মার হাতে সিদ্ধি অক্ষর চালাইবার ভার থাকিত!

এখানে যত দেশ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সিদ্ধ দেশ আমার চক্ষে বিশেষ নতুন চোঁকি দাখিল। অন্যান্য স্থান হইতে উহার ভাবগতিক অনেক ভিন্ন। প্রথমতঃ বর্ষার অভাব। নদা, নালা, খালের জল হইতেই প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্বাহ হয়। ইন্দ্র বর্ষণ করেন না—পৃথিবীই স্বীয় নীর দিয়া তাহার অভাব পূরণ করেন। বৃষ্টি হয় না বলিয়া পাকা ঘর বাড়ি নির্মাণ করিবার আবশ্যক হয় না, যেমন তেমন খড় মাটির ঘর বাসযোগ্য করিয়া নিতে পারিলেই হইল। কালে ভদ্রে যদি কখন ইন্দ্রদেবের প্রসাদে বর্ষার আধিক্য হয় অমনি শুনা যায় সহরের অর্দ্ধেকবাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। সিদ্ধদেশের আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে, শীত-ফের আতিশয্য। যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে ছাতের উপর কিম্বা বাহিরে ধোলা জায়গায় শয়ন করিলেও পাখার আবশ্যক হয় ও জলসিঞ্চন করিয়া বিছানায় প্রবেশ করিতে হয়। শীতকালে তেমনি বিপরীত ঠাণ্ডা, ঘরের ভিতরেও অগ্নিসেবন ব্যতীত চলনা। সিদ্ধদেশে প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্য বিরল। ভাগ্যি সিদ্ধনদী আছে তাই রক্তা, নতুবা ওদেশ মাহুঘের বাস-যোগ্য হইত কিনা সন্দেহ। আমার বন্ধন হাইব্রাদকে ছিলার তখন সিদ্ধনদী

আমাদের একমাত্র বেড়াইবার স্থান ছিল। সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে গিয়া বামুদেবন করা আমাদের নিত্য নিয়মিত কার্য্য ছিল। মক্কাভূমির মধ্যে যেন সেই একমাত্র আরামের স্থান বোধ হইত আর মধ্যে মধ্যে নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়ান যাইত। সিদ্ধ নদীর ভাব অনেকটা গঙ্গার মত—গঙ্গানদীর ন্যায় প্রশস্ত। ইহা দেখিলে আমার দেশ মনে পড়িত, মনে হইত যেন গঙ্গার বুকের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছি। সিদ্ধ নদীতে পল্লা বলিয়া একরকম মাছ পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ইপ্স। ছেলেরা কলগী ভাসাইয়া মক্ষার রকমে এই মাছ ধরে। এ মৎস্য অতীব সুখাদ্য বলিয়া প্রখ্যাত। আমার একজন সিদ্ধি চাকর ছিল তাহার কাছে এক গৎ শুনতান মনে আছে—

পল্লা মচ্ছী খানা

সিদ্ধ-মুলুক ছোড়কে নহি যানা।

নদী ও খালের তট প্রদেশে ভিন্ন অন্যরে গাছ পালা প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দিকে বালুময় ক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়াই গতিবিধি ও এদেশে উট অনেক কাজে লাগে। জলের কল—তেলের ঘানি উট দিয়াই চালিত হয়। উটই মক্কাগরের জাহাজ। সমুদ্রের উপর যেমন জাহাজের দোলা খাইয়া আনাড়ী মারিকবাত্তীর ওঠাগত প্রাণ হয় তেমনি যাহার অনভাস উট্র-বাহকের কাকানিত্তে তাহার রক্ত-হৃৎ দ্বিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মাহুৎ, অভ্যস্ত

আরোহী এই ভিন একত্র হইলে উটে চড়ায় আরাম আছে সাহস করিয়া বলা যা-ইতে পারে। এক বিষয়ে মরুভূমির উপ-যোগিতা তোমার সহজে মনে হইবে না। তাহা বলি শুন। বালির উপর সহজে পায়ের দাগ বসে—ইহা চোর ধরিবার এক উৎকৃষ্ট উপায়। আমি যখন শীকারপুরে কাজ করিতাম তখন গরুচুরি মকদমা রাশি রাশি আমার কাছে আদিত। পশু হরণ সিদ্ধিদের এক রোগ। এমন দিন নাই যে ঘোড়া, গরু, উট, মেঘ, মহিষ প্রভৃতি লুণ্ঠের মকদমা উপস্থিত না হইত। কিন্তু তাও বলি 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর।' গ্রামে গ্রামে যে সব চৌকীদার আছে তাহাদের নাম 'পগী'। পদচিহ্ন দেখিয়া চোরামাল গ্রেপ্তার করা তাহাদের কাজ। মনে কর কোন এক গ্রাম হইতে একটা উট চুরী গিয়াছে। অমনি সেই গ্রামের পগী অপহৃত-উটের পদচিহ্ন ধরিয়া চোরের সন্ধানে বাহির হইল। সেই পদ-চিহ্ন যদি সে তাহার সমীপবর্তী গ্রামে দেখাইয়া দিতে পারে তাহা হইলেই তাহার দায়িত্ব হইতে সে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাব-দিহি পড়িল। এই গ্রামের লোকেরা পগী সঙ্গে করিয়া সেই চিহ্ন ধরিয়া বাহির হয়—এইরূপে চোরের আড়ডার গিয়া চোরা-মাল ধরিতে পারিলে তাহাদের পরিশ্রম সার্থক। আশ্চর্য্য এই যে অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধরা পড়ে—পগীরা এ কাজে এমন নিপুণ যে প্রায় তাহারা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসে না। তাহাদের দক্ষতার

প্রমাণ চোরামাল হস্তগত হওয়া—মাল ধরা না পড়িলে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। অনেক সময় পদ চিহ্ন দেখাইয়া তাহারা অন্য গ্রামের লোকদের উপর অপরাধ চাপাইয়া আপনারা দোষ মুক্ত হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বিজ্ঞ বিচার-কের কাছে ওরূপ প্রবত্ত সফল হয় না।

শীকারপুরের নামে মনে পড়িল যে সিদ্ধদেশ শীকারের এক প্রশস্ত স্থান। স্থানে-স্থানে যে বনজঙ্গল আছে সেখানে হরিণ, বরাহ, নেকড়েবাঘ প্রভৃতি বনজন্তু পা-ওয়া যায়। কোন কোন জলাভূমিতে নানা পক্ষী পাখালীও দৃষ্টিগোচর হয়। আমি মাঝে মাঝে শীকারে বাহির হইতাম কিন্তু বড় বাঘ কখন দেখি নাই—একবার আমার সামনে একটা হায়েনা আসিয়াছিল। সি-দ্ধিরা সকল রকম বাঘকেই 'সিংহ' বলে। কিন্তু আসল পশুরাজ সিংহ এ সকল বনে দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশের কেঁদো বাঘ Royal Tiger এখানে আছে কি না সন্দেহ। এই সকল শীকার করিতে গেলে অনেক কুলি সংগ্রহ করিতে হয়। শীকারাগণ বন্দুক-হস্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া ব-সেন, কুলিরা এক চক্র বঁধিয়া হাঁকাহাকি ডাকাডাকি আরম্ভ করে। সেই চীৎকার জনিতে বহু জীবজন্তু, শত্রুধারী শীকারীদের দিকে ধাবিত হয়—এই অবসরে যার যেমন সুবিধা বন্দুক ছুড়িয়া শীকার আদার ক-রিতে হয়। যে বনে ব্যাজ-সংকরণ করে, সেখানে হয় কোন বৃক্ষের উপর কিম্বা উচ্চ মন্ডলের উপর বসিয়া স্বয়ং যমোকে প্রতীক্ষা

করিতে হয়। সিদ্ধীরা অত্যন্ত শীকার-প্রিয়, শীকারপূরে থাকিতে মধ্যমধ্যে প্রায়ই আমার শাকারের সঙ্গী জুটত। একবার আমরা দলেবলে মঞ্চর নামে একটা বৃহৎ সরোবরে শীকার করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে বুনো হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী পাওয়া যাইত। আমরা এক একবার বোটের উপর হইতে শীকার করিতাম। মঞ্চরে একজন বুদ্ধ সিদ্ধী আমাদের যথোচিত আতিথ্য করিয়াছিল—আমরা বেস আমোদে ছিলাম। একবার মনে আছে আমরা একটা জায়গায় চকা-চকির ঝাঁকের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সংস্কৃত কাব্যে চকা চকির কথা পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে এমন সখ্যবন্ধন হইয়া গিয়াছে যে গুলি ছুঁড়িতে হাত উঠিল না। সে বেচারীদের মধ্যে গুলি চালাইতে গিয়া ‘মা নিষাধ প্রতিষ্ঠাং তং’ আকাশবাণী আমার কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার অন্তরায়াকে দগ্ধ করিল। সে যাহা হউক, আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করে চখা-চখির বিচ্ছেদ বর্ণনা কতদূর নত্যা। তাহা বাস্তবিক ঘটনা অথবা আমাদের সংস্কৃত কবিরের কল্পনা মাত্র। সত্যই কি বিধাতার এমনি কঠোর নির্বন্ধ যে সন্ধ্যা হইলেই চখা-চখী বিযুক্ত হইবে—চখা যদি এ পারে থাকে চখী ও পারে গিয়া বসিবে। চখা বলে—‘চখী মই আঁউ’ চখী উত্তরদেয় ‘নহী নহী চখা।’ আবার চখী বলে ‘চখা মই আঁউ?’ চখা উত্তরদেয় ‘নহী নহী চখী’ এটরূপে কি সমস্ত রাত্রি গত হয়?

আমি কি করিতেছি—শীকার হইতে

কবিতায় গিয়া পড়িলাম। আবার পক্ষ সংযত করিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করা যাক। ইংরাজেরা সিদ্ধুদেশ অধিকার করিবার পূর্বে তাহা আমীরদের রাজ্য ছিল। আমীরেরা বড়ই শীকাবভক্ত ছিল। তাহাদের হাতে রাজ্য থাকিলে এতদিনে সিদ্ধুর সমস্ত প্রদেশ ‘শীকার গাঁ’য়ে পরিণত হইত। কথিত আছে তাহাদের এমন কঠোর শাসন ছিল যে রক্ষিত-বনের কেহ একটা বরাহ বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এখন আর সে কাল নাই। এই আমীরদের রাজ্যের খয়েরপুর এখন অবশিষ্ট আছে—আলিমোরাদ তাহার রাজ্য। তদ্ব্যতীত আমীরদের আয়ুর্য় স্বজনের মধ্যে একগুণে কেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে কাজ করিতেছেন কেহ বা পেন্সন ভোগ করিতেছেন। এক জন মীর সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কখন কখন শীকারে যাইতাম। তিনি শীকারে বিলক্ষণ মজবুত—উৎসুকপক্ষী তাঁহার গুলি খাইয়া পড়িত। এই মীর একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একটা খুনী মকদ্দমাতে তিনি একবার এক কারখানা করিয়া বসিয়াছিলেন। মকদ্দমা সেসনে কমিট হইলে যে সকল জিনিশ প্রমাণ স্বরূপ নথির সঙ্গে পাঠাইতে হয়—যাহাদের এদেশের চলিত ভাষায় ‘মুদামাল’ বলে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান মাজিষ্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুণ্ড-ছেদ করিয়া সেসন কোর্টে কাটা-মুণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া সেসন-জজ ক্রোধাক্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই অতি বৃদ্ধর কাজ ক-

রিয়া বেচারী মীরসাহেব তারি বিপদে পড়িয়াছিলেন।

সিদ্ধুবাসী অধিকাংশ মুসলমান। এসব দেশে যেমন হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান ও দেশে তেমন মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু। হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণে গঠিত। তাহারা আমিষ-ভক্ষণ ও সুরাপানে পরাশ্রুণ-নহে। ‘আমিল’ নামে হিন্দুদের প্রধান জাতি কায়স্থ—তাহাদের বেশভূষা ও শ্রুঙ্খল মুখশ্রীতে মুসলমানদের সঙ্গে প্রভেদ বুঝা দুষ্কর। প্রথমে যখন সিদ্ধু-হাইদ্রাবাদে আমার কর্ম হয় তখন হিন্দুদের কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। আমরা এক সঙ্গে এক মেজে বসিয়া পানভোজন করি—তাহাতে আমার কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হইল। কেন না হিন্দুদের ওরূপ জাতেজাতে মেলামেশা সচরাচর দেখা যায় না। শেষে উহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। হাইদ্রাবাদে এক ব্রাহ্মসমাজ আছে, ন—রায় একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ও সমাজের এক প্রধান নেতা। তাঁহার যত্নে কতক জন সাহসী-বুঝা দলবদ্ধ হইয়া বুদ্ধ হিন্দুসমাজের কি পক্ষে গড়া-হস্ত হইয়াছেন—মাকে মাকে দুই দলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। বাহারা সাহস করিয়া আমার সঙ্গে একাসনে আহার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সামাজিক শাসন হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন তাহা নহে। কনিলাম তাহার জন্য তাঁহাদের নাকি শেষে অনেক আলা যত্না ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মুসলমানদের রাজত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অবরোধ প্রথার কড়া কড় নিয়ম দৃষ্ট হয়। সিদ্ধুদেশে তাহাই দেখিলাম। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরেই কক—স্বর্ঘ্য চলত তাহাদের রূপ দেখিতে পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হইল কি না জানি না কিন্তু ইহা সত্য যে অন্তঃপুরে স্বর্ঘ্যদেবের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি, কতমাস ওদেশে ছিলাম কোন ভদ্র সিদ্ধি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। ন—রায় মহাশয় ঘন ঘন আমাদের কাছে আসিতেন—আমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহারাদি করিতেন কিন্তু তাঁহার পরিবারের মধ্যে কখন আমাদের সঙ্গে আমন্ত্রণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে হইল। মণ্ডা মিশ কার্পেন্টার যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন আমরা সিদ্ধুদেশেই ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে আমাদের বাড়ীতে কতক দিন বাস করিয়াছিলেন। সিদ্ধুরা তাঁহার আতিথ্য সংকারের জন্য অনেক করিয়াছিল। স্কুলের ছাত্রেরা মিলিয়া এক নাটক অভিনয় করিল, তাহাতে এক কবিতা পাঠিত হয়—তার ধূয়া মিশ মেরি কার্পেন্টার—তাহা যেন এখনো আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। মিশ কার্পেন্টারের উপর সিদ্ধিদের এমন ভক্তি, এত আদর, এত যত্ন যে ন—রায় মহাশয় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার স্ত্রীসহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার সন্তানের বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। যে অন্তঃপুর এখন আটো আটে

বন্ধ যে আমার স্ত্রীও তাহাতে প্রবেশ ক-
বিত্তে পারেন না, তাহার মধ্যে একজন
ইংরাজ মহিলাকে ডাকিয়া অভ্যর্থনা করা

সামান্য সাহসের কর্তব্য নহে। আজ তবে
এইখানে শেষ করি—আর এক সময় বো-
ম্বাই সহরের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভালবাসা।

এ জগতে মনুষ্যের ভালবাসা অপেক্ষা
মূল্যবান আর কি আছে? ইহা দীন দরিদ্র
কাম্বালের নিকটও যন্ত্রণা মূল্যবান ও আ-
দরের সামগ্রী ধনমানশালী সমাগরা ভূখণ্ডের
অধিশ্বরের নিকটও সেইরূপ; ধনমানে ইহার
বিশেষ ভারতম্য হয় না, তবে ব্যক্তিভেদে
ও হৃদয়ভেদে কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে
মাত্র। ভালবাসার মূল্যাধিক্য হেতুই সাধা-
রণত লোকে ইহাকে অমূল্য বলিয়া থাকে।
ইহার মূল্য নিরূপণ করা নিতান্ত দুষ্কর।
এবিষয়ে যিনি যত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন
তিনি ততই দুর্গম অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া
পড়েন, তখন ভালবাসা স্বার্থপরতায় এমন
জড়াইয়া ঢাকা পড়িয়া যায় যে তাহার মা-
নব-চক্ষু আর কাচ হইতে হীরক চিনিয়া
লইতে পারে না, কাচকেই হীরক বলিয়া
ভ্রম করিয়া ফেলে। জল ভাগ করিতে
প্রয়াস পাইয়া ছুরিকা নিক্ষেপ করিলে
যে রূপ ছুরিকাটিই তরঙ্গে ডুবিয়া যায় জল
ভাগ করা হয় না, ভালবাসা ভাগ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেও সেইরূপ আমাদের মন ভা-
বের তরঙ্গে ভাসিয়া যায় আমরা তাহাকে
আর ধরিতে পারি না, সে আমাদের হাত
ছাড়িয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ভালবাসা বে-
দন-ভেদসহ্য থাকে তাহার কিছুই ভাগ করা

হয় না। তবে যেমন তড়িৎ দ্বারা জলের
উপাদান দুইটি প্রকাশ পায় সেইরূপ ভাল-
বাসার তড়িৎ ধাঁহাদের নিকট পরিচিত
আছে তাহাদের মনের মধ্যে ভালবাসার
উপাদানগুলিও সেইরূপ বিকাশ পায়।
কিন্তু ভালবাসার তড়িৎ আমাদের নিকট
পরিচিত নাই বলিয়া কি আমরা তাহার
মূল্য কিছু পরিমাণেও বুঝিতে সক্ষম হইব
না? এ সংসারে তাহার কার্য ও ক্ষমতা
দেখিয়া কি কিছুই বুঝিব না? হার অর্থের
মোহে কি চিরকালই নিমজ্জিত থাকিব?
আমরা সাধারণত কি প্রকারে দ্রব্যের
মূল্য নির্দ্ধার করিয়া থাকি? তাহার
কার্যকারিতা ও উপকারিতা দেখিয়াই আ-
মরা তাহার মূল্য নিরূপণ করি। তবে
ভালবাসার বিপুল মহিমা স্থাপন করিতে
হইলেও আমাদের কাছে তাহাই করিতে হ-
ইবে। যদিও আমরা ইহার উপকারিতা
সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে না পারি ত-
থাপি যে টুক পারি সেই টুক লইয়া দেখি-
লেও আমরা ইহার অতুল মূল্য ধারণা ক-
রিতে সক্ষম হইব। এ সংসারে ভালবাসার
ন্যায় প্রভাব কাহার? ইহার ন্যায় উপ-
কারক কে আছে? পৃথিবীতে অর্থের ক্ষমতা
বিপুল বটে, অর্থের বিনিময়ে পৃথিবীর সকল

সুখসচ্ছন্দতা উপভোগ করা যায় সভা, কিন্তু তাই বলিয়া ভালবাসার সহিত পার্থিব সুখের প্রতিকৃতি এই অর্থ কি তুলনাতেও আনিতে পারে? মান মর্যাদা ঐশ্বর্য যাহা দিতে পারে না ভালবাসা তাহা দিয়া হৃদয় পুরাইতে পারে; সুধু ভালবাসা থাকিলেই মনুষ্যের অন্তরে শান্তি বিরাজ করে, কারণ সুখ ত আর অর্থের নহে সুখ মনে। দেখাগিয়াছে রাজাধিরাজেরা এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর একাধীশ্বর হইয়াও যথার্থ সুপভোগ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। নহতনয় যথাতি সহস্র বর্ষকাল বিষয়সুখ ভোগ করিয়াও ভোগভৃগু নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি যে সুখের কল্পনায়-বিষয়ভোগে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন সে সুখের কণামাত্রও পান নাই, বরং উপভোগ-বর্জিত সুখস্বপ্নায় আকুল হইয়া দিন দিন অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। অবশেষে পুত্রগণকে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখের অসারত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্বক পুনর্ব্বার তিনি জরা গ্রহণ করিলেন। রাজা যদি প্রজাদিগের ভালবাসা না পায়েন কিংবা তাহাদিগকে যথার্থ সন্তানের ন্যায় স্নেহ না করেন তাহা হইলে কিছুতেই তিনি সুখী হয়েন না। তাঁহার-সেই-অর্থের মায়া তাঁহাকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না; মায়ায় ঘোর ভাসিবার পর তিনি “হা হতো হস্মি” বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়া দেন, কিছুতেই আর শান্তি আনন্দ উপভোগ করিতে পায়েন না। সেই নিমিত্তই আমাদের পূর্বকালের প্রোক্ত:-

অরণীয় প্রজাবৎসল নৃপতিগণ কখনও বিষয় সুখে মুগ্ধ থাকিতেন না। কর্তব্য মনে করিয়াই রাজকাৰ্য্য সমাধান করা ও প্রজাদিগকে যথার্থ সন্তানের ন্যায়, স্নেহের সহিত পালন করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, রাজত্বটী উপলক্ষ মাত্র। প্রজাবৎসল রামচন্দ্র কর্তব্যবোধে অহুরোধে প্রজা সন্ততির নিমিত্ত বিনা অপরাধে পতিব্রতা প্রিয়তমা জানকীকেও বিসর্জন দিয়াছিলেন।

এক জন নিতান্ত দরিদ্রকে যদি তুমি ভালবাস আর ভালবাসিয়া একমুষ্টি অন্ন দাও তাহাতে সে যত সন্তুষ্ট হইবে ও মনে শান্তি পাইবে তাহাকে তাম্বিল্য করিয়া অপরিপূর্ণ অর্থ দান করিলেও সে তত আশ্বাসিত হইবে না। অর্থপিশাচ, কঠোর মনুষ্যের অশান্তি-পূর্ণ হৃদয়ও ভালবাসার শান্তিবারি দিগ্ধনে মিলিত হইবে করে। একজন অভিমাত্র ব্যক্তি অপরের নিকট দয়ার পাত্র হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন কিন্তু ভালবাসা পাইলে তিনি তোমার চরণে লুটাইতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। যে কুপথে গমন করিতেছে সে কাহারও কথায় মন দিবে না; কিন্তু তাহাকে অযথা তিরস্কার না করিয়া তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া, ভালবাসিয়া কেহ কিছু বলিলে সে তাহা সলজ্জভাবে শুনিবে আর কিছুকাল তাহার সহিত থাকিয়া উপদেশ দিতে পারিলে কুপথ হইতে সুপথে আনিতেও অধিক বিলম্ব হইবে না। ভালবাসা পাইলে লোকে দ্রবল কষ্ট ভুলিয়া যায়। পৃথিবীর ক্রেশ যতই হৃদয় হইক না কেন

হৃদয়ের বন্ধু পাইলে তাহা মন হইতে মু-
ছিয়া যায়। ভালবাসা পাইলে মন এক-
বারে আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অপরে আ-
শ্রয় গ্রহণ করে, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া
গিয়া তাহার দুঃখেই তাহার দুঃখ তাহার
সুখের উপরই তাহার সুখ নির্ভর করে।

কেহ যদি ভালবাসা একজন কি কয়েক
জনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবেই
তাঁহার প্রিয়জনদিগের নিকট সে ভাল-
বাসা বড় আদরের, কিন্তু অংশস্তক্ষেত্র বি-
স্তৃত হইলেও ভালবাসার অনাদর হইবার
কারণ দেখি না।

ইহা হইেই অর্পের সহিত ভালবাসার
আর এক বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অ-
র্পের বিনিময়ে যাহা পাই তাহাই আমা-
দের থাকে, অর্থ আর আনন্দের থাকে
না, তাহা চলিয়া যায় আর ফিরে না। কিন্তু
ভালবাসার পক্ষে তাহা ঘটে না, ভালবাসা
ফুরায় না, তুমি যতই ভালবাস, তোমার
ভালবাসা ততই বাড়িয়া উঠে আর তাহার
সহিত ভালবাসিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।
লোকে বিদ্যার কথায় বলে “ইহা যতই
করিবে দান তত যাবে বেড়ে”। কিন্তু বি-
দ্যাপক্ষে ইহা ভালবাসাতেই অধিক খা-
টিয়া থাকে। একজন পাণ্ডতকে চিরজীবন
যাদ বালকদিগকে বর্ণপরিচয় করাইতে হয়,
তাহা হইলে কি আর তাহার বিদ্যা বৃদ্ধি
পায়, না ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু
ভালবাসায় তাহা হয় না। আমাদের ম-
নের মধ্যে ভালবাসার যে অনন্ত নির্বর
বহিয়াছে কিছুতেই তাহা নিঃশেষ হয় না,
তাহার দ্বার উন্মোচন করিতে পারিলেই
আর আমাদের কিছুই ভাবন, থাকে না।
আমরা দেই নির্বর হইতে ভালবাসার অ-
নন্ত প্রবাহ পাইতে থাকি, তাহা আমাদের
জীবন মস্তকে প্রাণিত করিয়া বিশ্বজগতে
উৎখলিয়া পড়ে। কেহকেই স্বীকার করি-
য়েন যে তাহার হৃদয়ে সুখ ও শান্তির স্রু-
ত

অতিশয় বলবতী তাহার নিকট হইতে সুখ
ও শান্তি অনেক দূরে পলায়ন করেন; যাঁ-
হারা ইহা স্বীকার করেন তাঁহারা কিছু-
কাল বিষয়-সুখভোগের পর বৃষ্টিতে পারি-
বেন যে ইহা কি মহৎ সত্য। এই মহৎ
সত্য এত অধিক লোকে ঠেকিয়া চিনি-
য়াছেন যে জ্ঞানীরা, শুদ্ধ জ্ঞানীরা কেন
অধিকাংশ লোকেই বোধ হয় আর ঠেকিয়া
শিক্ষা পাইতে চাহিবেন না। ইহাও আর
এক মহৎ সত্য যে যিনি সুখশান্তি পাইবার
আশায় কোনও কাব্য করিতে অগ্রসর হইয়-
েন তিনিই যথার্থ শাস্তি ও সুখলাভ করেন।
মহুযা বিনা ঐশ্বর্য্যে বিনা মান-মর্যাদায়,
বিনা যশে, কেবল মাত্র ভালবাসায় মন
পূর্ণ করিয়াই মনের সুখে ও মনের শান্তিতে
জীবনান্ধিপাত করিতে পারেন; কিন্তু
ধন মান মর্যাদা বশ এসকল পাইয়াও
ভালবাসার অনাটন পড়িলে, পরের দুঃখে
মন গলাইতে না পারিলে সুখ শান্তি বা
আনন্দ তাহার কিছুই থাকে না, আর এ
সকলের অভাব পড়িলে মহুযোর জীবন
মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠে। এই মহৎ স-
ত্যটি কাহারো নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে
কিন্তু ইহার অবশ্যাস্তাব্য ফল সকলেরই নিকট
পরিচিত আছে। সকলেই জানেন যে
ধনমানে সুখলাভ মহুযোর অদৃষ্টে ঘটে না
কিন্তু তাহা যথার্থ কি কারণে ঘটে না তাহা
হয়ত সকলে তলাইয়া বুঝেন না। তাহারা
যখন দেখেন এ সংসারে সুখ পাইলেননা
তখন তাঁহারা সুখস্পৃহা ত্যাগে যে যথার্থ
সুখ পাইবেন তাহা মনেও ভাবেন না;
তাঁহারা মনে করেন যে এ পৃথিবীতে সুখ
নাই তবে ষত কাল মায়ার ঘেরে থাকেন
তত দিনই সুখ, নিদ্রাভঙ্গের পর যে কষ্ট ও
অশান্তি ভোগ করেন সেইটা কেবল পৃথিবীর
নিত্য দুঃখ এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা যত
দিন পারেন আত্মীয় বন্ধুদিগকে মায়ার পিঞ্জর
মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে ব্যস্ত হইয়েন। তাঁহারা

যথার্থ স্নেহের পথ ছাড়িয়া হৃদয় মাঝে মাঝে পাঠিবাব জনা লালানিত হন; আর এই ঘোবের মধ্যে থাকিয়া জীবনের মহাদেশা ভুলিয়া যান। এই অসার পার্থক্য স্নেহে যখন আমাদিগকে যথার্থ স্নেহ কবিত্তে পাবে না, সে স্নেহ যখন মহাঘোবের ন্যায় আবেশনাব বশবত্তী নহে বরং আগন্তু সহকারে প্রতিষ্ঠিত মাতিয়া ছাড়াইয়া ফেলি, তখন এই মাঝখানী মরীচিকা ধরিবার জন্য দোড়িবার প্রয়োজন কি। এই মাঝখানী বাক্যকে ছাড়িয়া যাহতে মন যথার্থ স্নেহ শাস্ত্রানুভব কবিত্তে পারিবে সেই পথে ধাবমান হওয়া কি আনন্দেব উচিত নহে।

যে কখনও ভালবাসা পাথ্য নাই যে যথার্থ এ সংসারের—সংসারী, সে অপবকে শীঘ্র ভাল বাসিতে অগ্রসর হইবে না; তাহাব পাষাণের ন্যায় নিশ্চল সেই স্বার্থপর হৃদয় হইতে সে এক বিন্দু স্নেহানুভব কবে না, কেবল নিজেকে ভাল বাসিয়া বাসিয়া কাঁপাইয়া তুলে। কিন্তু ভালবাসাব অঘোষ ঐষধে পাষণও কোমল হয়, অসাড়ও জীবন্ত হয়। তাহাকেও ভালবাস, ভাল বাসিয়া, মহাদেশগণের নিঃস্বার্থকীর্তি জলন্তমহিমায় অবিলম্বে তাহাব কাছে কীর্তন কর, তাহাদেব পবিত্র মূর্তি বাব বার তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত কর, দেখ তাহাকেও স্বার্থের পথ হইতে ফিরাইতে পার কিনা? যে সংসারে ডুবিয়া রহিয়াছে তাহাকেও পার্থক্য স্নেহের অস্থায়িত্ব বুঝাইতে পারিলে সে অধিক দিন সংসারের ঘোবে থাকিবে না, সে কিছু দিন পরে অপবকে ভাল বাসিতে শিখিবেই শিখিবে। অপরকে ভাল বাসিতে গিয়া এক জনের প্রেমে আবদ্ধ হইলেই যে ভালবাসার উদ্দেশ্য সাধিত হইল, আমি তাহা বলি না, ইহাতে জীবনের মহাদেশা সাধন কবা হয় না। জীবনের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে একজন অপর একজনের প্রেমের ঘোরে নিম্ভিত থাকে। তোমার বিবেচনা করা

উচিত যে তুমি এ বিশ্বজগতের একটি কণা মাত্র, আর সেই কণাকে বিশ্বজগত হইতে অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে কবা কি অজ্ঞানতা নহে। বিবাহ কব আর নাই কব, জীবনেব এই মহাদেশা কখনও ভুলিও না, কখনও তোমার মন হইতে অপসৃত হইতে দিও না, তা হইলে আমরা পশু পক্ষীদের হইতে উচ্চ কিসে? জগত মণ্ডলের কর্তৃত্বের উপযুক্ত কি সে? ভালবাসাকে যখন কেবল তোমার জীব পূত্র পবিত্রাব মধ্যে সীমাবদ্ধ কর তখন সে ভালবাসাকে, ভালবাসা বলা যায় না তাহা তোমার সেই অসার পার্থক্য-স্নেহের সোপান মাত্র। এই অকিঞ্চিৎকর পার্থক্য-স্নেহ অধেষণ করিয়া অশান্তি ভোগ কবা অপেক্ষা এই জগৎ-মণ্ডলকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা কি অধিকতর গৌরবজনক নহে। তাই বলিয়া জীব পূত্র পবিত্রাবের প্রতি দৃষ্টি করি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কবিত্তে বলি না। তোমার কর্তব্য তাহাদের ভালবাসা ও সতত তাহাদেব স্নেহসচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখা, কিন্তু নিজপরিবাবকে ভাল বাসিতে গিয়া যেন এই বিশ্বপরিবাবকে মন হইতে অপসৃত কবিয়া দিও না। এইরূপ ভালবাসিতে পারিলে, মনকে স্পৃহাশূন্য করিতে পারিলেই পবিত্র স্নেহ বিনাঅধেষণে তোমার হৃদয়ধীন হইবে, শান্তি—অবিমিশ্র, পূর্ণ, স্বর্গীয়শান্তি তোমার অন্তরে সতত বিবাজ কবিত্তে থাকিবে। এই ভালবাসাই যথার্থ ভাল বাসা; ইহাই এই অনিত্য জগৎ মধ্যে একক স্থায়ী, স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানই ইহাব অনন্ত সোপান। এই সোপান দিয়া আবোহণ করিলেই মহাব্য যথার্থ মহাব্য নামের যোগ্য হয়, যথার্থ পৃথিবীকে জয় করে, যথার্থ ঈশ্বরের গুণগান ও প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া এই অস্থায়ী জগতেও ঈশ্বরের শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া যায়।

—সংগীত।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা।

পূর্বের অনুরতি।

সম্প্রতি আরবিং বিসপ ও ট্র্যাট কাম বারলাও নামে দুই ব্যক্তি ইয়োরপে মনের কথা বলার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। আজ কাল এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে ইয়োরপে এত ব্যস্তশীল যে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডে রাজমন্ত্রী গ্যাড-টোন, কামবরলাওওর, এবং জার্মানিতে সম্রাট স্বয়ং সপরিবারে, বিসপের, অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন।

ইহাদের দু জনের মনের কথা বুঝিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু ইহারা দু জনে মনের কথা বুঝিবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। বিসপ বলেন তিনি বিনা শরীর স্পর্শে, ইন্দ্রিয়ের বিন্যাস-হায্যে মনের কথা ধরিতে পারেন, মাংসপেশীর অবস্থান্তর (muscular movements) লক্ষ্য করিয়া তিনি মনের কথা বলেন না। কামবরলাও বলেন তিনি মাংসপেশীর সূক্ষ্ম অবস্থাবৈলক্ষ্য লক্ষ্য করিয়াই মনের কথা বলিতে পারেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি মাংসপেশী-পাঠ করেন, (reads muscle) মনের কথা পড়েন না, আর শরীরের সংস্পর্শে না আসিয়া অন্য উপায়ে মনের কথা বলিতে পারা তাঁহার মতে একেবারে অসম্ভব। (he denies that any one can read thought otherwise than by noting muscular movements.) কিন্তু কামবরলাও যে সকল ঘটনা সাধিত করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষরূপ পর্যালোচনা দ্বারা কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ও সকল ঘটনাকে মাংসপেশী-পাঠ বলা যায় না, মনের কথা পড়াই বলিতে হইবে।

তা বাই কেন বলা হউক না, ঘটনাগুলি যে খাটি তাঁহার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ

কিছুমান ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তের জন্য একটি ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি।

একবার একটি প্রকাশ্য সভায় কামবরলাও মন গুণিতেছিলেন। গ্রাণ্ট অ্যালেন (নলডের পাঠকগণ ইহার সহিত বিশেষ পরিচিত) এইরূপ ক্ষমতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতেন, তিনি পরীক্ষার জন্য একখানি রুট মনে করিয়া তাহা দূরে একটি বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিতে পাঠাইলেন, এখন অ্যালেনের এই মনের জিনিসটি কামবরলাওকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে তাঁর চোখ বন্ধ হইলে তিনি অ্যালেনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে রাস্তায় একটি বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অ্যালেন তখন ঠিক সেই বাড়ীর কথাই ভাবিতে ছিলেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন এই বাড়ীতেই রুট রাখা হইয়াছে, কিন্তু অ্যালেন সে বাড়ীতে রুট ছিল না, সে হিসাবে কামবরলাওর গণনা ঠিক হইল না। কিন্তু এই ভুলটি চিমন জ্ঞানার পক্ষে অধিক প্রমাণ দিতেছে না। কামবরলাও যদি কোন উপায়ে আগে হইতে ঠিক বাড়ীটি জানিতেন তাহা হইলে কি আর এই ভুলবাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেন, কামবরলাও যে কোন প্রত্যক্ষ অবলম্বন করেন নাই—ইহা হইতে তাহাও যেমন বোঝা গাইতেছে, তাঁহার মনের কথা পাঠের ক্ষমতারও তেমনি প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল ইহাই নহে, সেই বাড়ীর কাছে থামিবামাত্র অ্যালেনের মনে হইল—‘কামবরলাও এখন কি করিবে? ঘটনা বাড়াইয়া লোক ডাকিবে না দ্বারে আঘাত করিবে?’ আশ্চর্য্য এই কামবরলাও যেমন অ্যালেনের এই স্বপ্ন সন্দেহটি পর্যন্ত বু-

কিতে পারিলেন, তিনি দুইই করিলেন এক-বার ঘণ্টা বাজাইলেন, একবার দরজায় আঘাত করিলেন। কেবল হাতটি স্পর্শ করিয়া মাংসপেশীর অবস্থা-বৈলক্ষণ্য যদি এতদূর বুঝা যায় যাহাতে এই ক্ষুদ্র সন্ধেহটি পর্য্যন্ত অন্তঃকরণে থাকে, তাহা হইলে এই মাংসপেশী-পাঠ কি অল্প বিস্ময়জনক!

প্রকটকার বলিতেছেন কেবল হাতের স্পর্শে এইরূপ সূক্ষ্ম সন্ধেহ প্রকাশ করিবে ইহা মনে করা যায় না, যদি তাহা হয় ত মন জানা হইতে মাংসপেশীর কার্য জানা আরো অধিক আশ্চর্য্যের। তিনি বলেন যখন বিনা সংযোগে লক্ষ লক্ষ কোশ দূরে পদার্থের উপর পদার্থের কার্য চলিতেছে, তখন ইঞ্জিয়ার সাহায্য বিনা মনের কথা চালিত হইলেই বা তাহার অস্বাভাবিকত্ব কোথায়? তবে ইহা আমাদের নিকট রহস্যময় মাত্র, কিন্তু দূরদৃষ্টবস্তিত পদার্থের উপর পদার্থের কার্য ইহা হইতে সমধিক রহস্যময়।*

প্রকটকার বলেন যে বিসপ ও কামবর-

লাও দুজনেরই মনের কথা বুঝিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু তাহারা দুজনে উহার বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তবে আপনাদের পসারের জন্য গিনি যেরূপ বলা সুবিধাজনক ভাবিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। বিসপ বলেন ইঞ্জিয়ার বিনা-সাহায্যে তিনি মনের কথা বুঝিতে পারেন, কামবর লাও ভাবিলেন উহা না বলিয়া তিনি যদি বলেন যে ইঞ্জিয়ার সাহায্যে তিনি মনের কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে লোকে তাহার সরলতায় আরো দৃষ্ট হইবে, এবং ইহাতেই তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দীকে হারাইতে পারিবেন, ইহা ছাড়া বাস্তবিক যে কামবর লাও তাহার ক্ষমতার যথার্থ কারণ জানেন তাহা নহে।†

প্রবন্ধটির কায়া বড় বাড়িয়া পড়িতেছে, নহিলে উপরের মত আরো অনেক দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা নাই পারিলাম, তাহাতেও কিছু আসে যায় না, যে সকল ঘটনা উদ্ধৃত

• Whether thought-reading without contact would be supernatural, I may remark that it would only be mysterious, not supernatural nor would it be anything like so mysterious as the action of matter on matter without contact, instantaneously over distances of hundreds of millions of miles. No man who admits—as every man of science must—that law of attraction which is the most stupendous mystery known to science yet rejects the idea that this great law of nature is not a natural law, need regard the idea of thought transference as involving aught of the supernatural. The influence of matter on matter without contact is at least as great a mystery as would be the influence of mind on mind at a distance.

† I think neither Mr Bishop nor Mr Cumberland has the slightest idea how they do what they undoubtedly can do. Each possesses a remarkable power of interpreting the thoughts of others. Each knows the power to be fitful and variable. Neither can make sure of success in any given attempt; yet each has met with some successes which cannot reasonably be interpreted as due to mere chance. Each has formed a tolerable idea of the unscientific credulity and of the equally unscientific incredulity of the public. One has thought it well to play on the former quality, the other seems it better to play on the latter. But as to a real idea of the nature of the power each feels he possesses, neither one nor the other has any whatever.

হইয়াছে তাহাই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট, অধিক প্রমাণের আর আবশ্যকই বা কি? তবে ঐহ্যারা ইহাতেও মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কিছুই পাইবেন না, আর দুই একটি কেন আর শত সহস্রটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলেও তাঁহাদের মংশয় দূর হইবার নহে। এইখানে মিশ ফক্সের একটি গল্প মনে পড়িল—তিনি শুনিয়াছিলেন একবার সার উইলিয়ম হ্যামিলটন, একটি আশ্চর্যাজনক অঙ্ক-ফল বাহির করিয়া সে কথা সার জর্জ এয়ারিকে বলেন, এয়ারি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন “না তাহা হইতে পারে না”—উইলিয়ম বলিলেন, নিশ্চয়ই ইহা এইরূপ, আমি পাঁচ মাস ধরিয়া এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।” এয়ারি বলিলেন “কিন্তু আমি যে পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ বিষয়ে ভাবিতেছি” তবুও কিছুই দেখিতে পাইলাম না”।

এরূপ গল্প একটি আদর্শ নয় অনেক আছে। সূর্য্য কলঙ্ক দেখিয়া যখন গালিলিও সে কথা বলেন তখন সিনার বলিয়া ছিলেন তাহা গেলিলিওর চক্ষের কলঙ্ক সূর্য্যের কলঙ্ক নহে।

চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত কোন অজ্ঞাত শক্তি আছে, ইহাতে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনের কথা চালনা যে এই শক্তির ফল আমরা মেমটামোটি ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ শক্তির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা দ্বারা ইহার বৈজ্ঞানিক বিশেষ কোন কারণ নির্দেশ করেন কি না এইবার দেখা যাউক।

এ সম্বন্ধে এখনো যে তাঁহারা কোন বিশেষরূপ সিদ্ধান্তে পহুঁছিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, অনেকে অনেক প্রকার আত্ম-মানসিক কারণ মাত্র প্রবর্তন করিতেছেন। ১৩ বৎসর পূর্বে নাইনটিন্‌থ্‌ সেনচুরিঙ্‌ ল-

ম্পাদক মস্তিষ্ক রেণু তত্ত্বাঘাত (ব্রন ওয়েব থিয়রি) নামক যে মতটি এ সম্বন্ধে প্রবর্তন করেন তাহা এইখানে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এ মতে, যেমন বায়ুতরঙ্গে শব্দ উৎপত্তি, ইথারতরঙ্গে আলোক উৎপত্তি, তেমনি মস্তিষ্করেণুর কম্পনতরঙ্গে মনের কথা চানিত হইতে পারে এইরূপ অনুমিত। বিদ্যাস্ত্রটি এইরূপে গঠিত হইয়াছে—

প্রথম, ইহা ধরা কথা, মস্তিষ্কের কোন কার্য হইতে গেলেই ইহার মধ্যে রাসায়নিক কার্য ঘটে, অর্থাৎ যা একই কথা, একটি আণবিক কম্পন উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়, ইহা ধরা কথা, কঠিন তরল বাষ্পীয় সকল রূপ পদার্থের মধ্যে ইথার নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ অবস্থিত থাকিয়া উহাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করিতেছে।

এই দুইটি ধরা কথা হইলে, চিন্তার সময় মস্তিষ্কের আণবিক কম্পন দ্বারা ইথার তরঙ্গায়িত হইবে ইহাও ধরা কথা। এবং তাহা হইলেই একটি মাথার চিন্তাতরঙ্গ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র মস্তকে প্রবেশ করিবে।

প্রত্যেক চিন্তাশালী মস্তিষ্ক এইরূপে একটি চিন্তাতরঙ্গের কেন্দ্ররূপ হইয়া চারিদিকে চিন্তার তরঙ্গ বিক্ষেপ করিতেছে, এখন এই তরঙ্গ যখন এক অতি সূক্ষ্ম, ও বিশেষ রূপ অনুভূতি-শক্তি-বিশিষ্ট মস্তিষ্কে আসিয়া আঘাত করে, তখন তাহাতে সে চিন্তার চাঁচ উঠিবার আশ্চর্য্য কি?

যেমন সকল কাগজে ফোটোগ্রাফির ছাঁচ পড়ে না, একরূপ বিশেষ অবস্থাতে যখন সে কাগজ আলোকতরঙ্গ ধারণে সক্ষম হয়, তখন সেই ধারণশীল অবস্থায় মাত্র সে কাগজে অন্য জিনিসের ছায়া উঠে। শব্দতরঙ্গ কত শত জিনিসের মধ্য দিয়া নিস্তকে চলিয়া গিয়া একটি বিশেষ রূপ গঠনের জিনিসে মাত্র শব্দ উৎপাদন করে, তেমন কোন একটি ধারণশীল মস্তিষ্কেই মাত্র অন্য মস্তিষ্কের

চিন্তাতত্ত্বের ছাঁচ উঠিতে পারে। ইহাই মস্তিষ্করঞ্জনতত্ত্ব (brain wave theory)।

ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট তাঁহার অদৃশ্য-জগৎ নামক পুস্তকেও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন “আমরা যখন যাহা কিছু ভাবিনা কেন, ভাবিবার সময় আমাদের মস্তিষ্কের অণুর গতি হয়, এবং এইরূপ কল্পনা করিতে পারি, যে কোন না কোন প্রকারে এই অণুতরঙ্গ জগৎময় বাণ্য হয়।

ব্যাবেজও এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তিনি বলেন, “যদি প্রত্যেক কল্পনের সূক্ষ্ম-কণ দেখিবার আমাদের ক্ষমতা থাকিত ত প্রত্যেক অণুর ভিতর আমরা কত সংলিপ্ত ঘটনা দেখিতে পাইতাম।”

ইহা কল্পনা করিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, সেই ক্ষুদ্রতম আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতম চিত্তাটি পর্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে। যদি আমরা পড়িতে জানিতাম প্রতি অণুর পাতায় পাতায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ইতিহাস অলস্ত-অক্ষরে পড়িতে পারিতাম। এ পুস্তকের যিনি লেখক তাঁহার মহিমাকে ধন্য ! ! !

অজ্ঞাত-মানসিকশক্তির অস্তিত্বে বৈজ্ঞানিক কুশলের অকাটা বিশ্বাস। বিশেষ ধ্বংস ও পরিশ্রমের সহিত তিনি চিন্তাচালনার সত্যাসত্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ইহার সহায়তায় তিনি অজ্ঞাত মানসিক শক্তির প্রমাণ লাভ করেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন, যে “মাহুয়ের এমন একটি শক্তি আছে যাহার বলে বিনাম্পর্শে কঠিন বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা হইতে পারে, না ছুইয়া কোন জিনিস নড়ান যাইতে পারে, না ধরিয়া ভারী জিনিস শূন্য স্থান যাইতে পারে, এবং প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত শব্দ উৎপাদন করা হইতে পারে।”

স্পষ্ট আলোকে তিনি এই সকল পরীক্ষা

করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার জন্য অন্ধকার আবশ্যক হয় নাই। এ সম্বন্ধে একবার কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, “এই সকল ঘটনা যে সভা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; এবং ইহা গোপন করিয়া রাখিলে আমার কাপুরুষতা প্রকাশ হয়। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আমি নিজে দেখিয়াছি, এবং পুনঃপুনঃ পরীক্ষার দ্বারা তাহা আমার ক্লাছে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে।”

কুকশ বলেন—“এই যে ইন্দ্রিয়াগীত-শক্তি আমরা দেখিতে পাই, আত্মার অস্তিত্বই ইহার কারণ, এবং একমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হয়।”

ইহাতে জড়বাদের মূলে সঙ্কোরে আঘাত পড়িতেছে, আত্মা বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয় ইহাতে সত্ত্ব কিছু আছে তাহা পদার্থবাদীরা স্বীকার করিতে চান না, তাহার বল বলেন—মনই বল, আর আত্মাই বল, যাহা বল সকলি ইন্দ্রিয় সমুদ্রের একটি কার্য্যমাত্র, সূত্রং যাহা কার্য্য তাহা কারণের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই লোপ পাইবে।” এখন ইন্দ্রিয়ের নিয়মাতীত, জড় বিজ্ঞানের আয়ত্ত বহির্ভূত, যদি কোন মানসিক ঘটনা দেখা যায় তাহা হইলে ত একথা কড়ের মুখে তুণের নায় উড়িয়া যায়।

এখন স্রোত ফিরিয়াছে, কেবল আমাদের দেশে নহে, ইয়োরোপেও বুকি নূতন যুগের অভ্যুদয়। কিছু দিন পূর্বে ইন্দ্রিয়াগীত মানসিক শক্তির সম্ভাবনার পণ্ডিত কেহ বিশ্বাস করিলে ইয়োরোপে তিনি হাসির পাত্র হইয়া পড়িতেন, লোকে ভাবিত তিনি তবে বিজ্ঞানের ধার কিছুই ধারেন না। এখন সে কাল নাই অল্প দিনের মধ্যে সমাজে এ সম্বন্ধে একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ এখন নিজেই মানসিক শক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণে দৃষ্টশীল হইয়া

ছেন। এই খানে অধ্যাপক বারেটের বক্তৃতা হইতে একটু স্থূল অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধটি আঁপাততঃ শেষ করি। তিনি বলিতেছেন—৩০ বৎসর পূর্বে মেশমেরিজম, টেবিল নড়া, প্রভৃতিতে বিশ্বাস দেখিলে লোকে তাহা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব বলিয়াই স্থির করিত, তার পর যখন বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে এক এক জন করিয়া স্বকীয় পরীক্ষার ফললাভ করিয়া হঠাৎ পক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে লক্ষ্যগেলেন, তখন তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে হাস্যাত্মক যুক্তি বাহির হইতে লাগিল। তাঁহারা তখন, হাড়ুড়ে বৈজ্ঞানিক, অর্দ্ধশিক্ষিত, খাটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করিতে জানেন না, কিম্বা রথেল সোনাট্টির ফেলো নন, যদিই বা ফেলো হইয়া থাকেন ত

নেহাত দৈবকমে হইয়াছেন, ইত্যাদি রূপে সম্ভ্রান্ত হইতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ শুদ্ধ ধরিয়া টান পড়িতে লাগিল—যেমন কেবল আমেরিকা—তেই এ সকল ব্যাপার হয়, কিম্বা ইহা কেবল আমেরিকা বা ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কি ইটালি, কি রুসিয়া, কিম্বা এইরূপ কোন অর্দ্ধশিক্ষিত দেশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের দেশে অর্থাৎ জগ্মানিতে এরূপ হয় না।” (জগ্মানিতে ভ্রমণকালে একজন জগ্মণ্ডু আমাকে এইরূপ বলিয়া ছিলেন)।

যাহা হউক সময় পরিবর্তন হইয়াছে এইরূপ যুক্তি যে একেবারে লোপপাইয়াছে, তাহা যদিও মনে হয় না, তবে এখন, এইরূপ যুক্তির ফল হওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।”

ভগলির ইমাম বাড়ী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কর্মে উঠিয়া গেল, মসীম বাহিরে চলিয়া গেলেন। রোজ যেরূপ কাজ কর্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ার তেমনি হাসি মুখে তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্য অনামনক হইয়া বাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট পাট নিখাস কে-জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে মুগ্ধায়িত অন্ধ জল দেখিতে পাইলেন—

তিনিও অবাক ভাবে হৃদয়ে একটি যাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নির্বোধ সরলাবালা ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অস্থখ ধরিতে পারেন নাই,—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাইয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পরপারে গাছে রশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তমান হইয়াছে, রাশি রাশি খদ্যোতিকা মালা সেই অঁধার কায়ে জলিয়া উঠিয়াছে, গল্প স্বপ্নমোহে মহান আকাশ, অগণা নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বসিয়া, আছা-দের হাসি হাসিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহি

রে স্বপ্ন জগতে সভা বলিয়া ছড়াইয়া যুম ঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিকা মুন্না সেই নিশীথের ঘুমন্ত আঁখারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাজি গভীর হইল, দিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত ঢীংকার থামিয়া পড়িল, সলেউদ্দীনের বন্ধু বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাঁহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নীচে মসলন্দের উপর বিশ্রাম শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সন্মোচে পা ফেলিয়া একখানি ক্ষাণ ছায়ায় মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। সলেউদ্দীন অন্ধ নিম্নলিখিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন “কে এ ও—” মুন্নার মুখে কথা ফুটিল না, সেই যে ছপুর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া ক্রূপে, কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত বার্ষ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিতে লাগিল, চোখে কেমন জল আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন ঘষো ন তত্বো হইয়া মুন্না পাষাণ মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সলেউদ্দীন এ দিকে নেশার ঘোরে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন, তাহার মনে হইল স্বর্গের একটি ছবি বৃষ্টি তাহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে,—কি বলিয়া সন্তোষ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বৃষ্টি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাবা ভাবা অশ্লষ্ট কথায়

যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ এই “অগ্নি স্বর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলোক কর।”

মুন্না বৃষ্টির স্বামী ভুল বৃষ্টিমাছেন মুন্নার তখন কথা ফুটিল—ধারে ধীরে বলিল, “আগ্নি মুন্না”—সলেউদ্দীনের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দাক্ষ পতন হইল,—অন্ধচোখ খুলিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, “মুন্না—তুমি—ক্যা—আ ন” মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় মদীম গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সমুখে একবার দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সলেউদ্দীন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। মদীমকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ প্রাণে যেন বলে। সফার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বলিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে ছবয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, “একটি কথা আছে,” সলেউদ্দীন আগেকার ভাষায় বলিলেন, “কথা ঢের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেন।”

সকালে তিনি যত কথা শুনিবেন তা মুন্না জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহার পর অপরাহ্নে উঠিয়া বেশ বিন্যাস করিয়া আবার আসবে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্না ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি মুহূর্তের জন্য নিস্তক হইয়া পড়িল, তার পর স্বামীর নিকট আসিয়া একখান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এত শব্দর সকল টুটিয়া পড়িল। সলেউদ্দীন কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, তুলুতুলু নয়নে তাহার প্রান্ত চাহিয়া দেখিলেন, অমনি অধরের যত রাম তাহার ঘাড় আসিয়া ছপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া আশে-

কার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন, “কোথায় পাইলে?” মুন্না ধীরে ধীরে বলিল, “মসীম কিনিয়া আনিয়াছেন।” তিনি আরো জলিয়া গেলেন, তিনি জানিতেন সে ছবি একখানি মাত্র ভগতে ছিল তিনি পাইয়া গিয়াছেন, সেক্ষণ ছবি আর যে কোথাও কিনিতে মিলিবে ইহা কক্ষনোই হইতে পারে না, তাঁহার দেয়ালের ছবি যে কেউ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র তাঁহার সংশয় রহিল না, স্থলিত সূত্রাব্য নানারূপ ভাষায় সকালবেলায় সেই চোরের ঘাড় ভাঙ্গিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্না সাহস করিয়া অনেক বার লেখে “না তাঁহার ঘরের ছবি যাই নাই, সে যেখানকার সেই খানো চাহিয়া দেখিলেই সে ছবি দেখিবে।” কিন্তু মুন্নার কথা কে শোনে, কক্ষণ পর্যন্ত সে কথায় তাঁহার বিশ্বাস না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দেখে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই নৈই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাকচোরা কক্ষণ-স্বরে বলিলেন “তুমি কে? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও,—চাই না, দেখতে চাই না।”

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্নার কথা ফোটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্না থামিয়া পড়িতেছিল, স্বামীর নির্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া কক্ষউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্নার মুখ ফুটিল, মুন্নার সাহস বাড়িল, মুন্না ধীরে ধীরে বলিল ‘আমি

তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভুকে আজ মিনতি করিয়া; চরণ ধরিয়া যে কথা বলিতে আসিয়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না। একবার সংসার পানে চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন ‘আপনার সর্কনাশ ক্রুরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাই না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরত্নে আমি স্ত্রী হইব না। দৈবর জ্ঞানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিন্দুও ভাবি না। কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।’ এক নিঃশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্না শান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তক্ষে ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতাল অবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা মুন্না ভাবিল না, হয়ত বা মুন্না জীবনে স্বামীর সম্ভ্রান অবস্থা দেখে নাই, সুতরাং সম্ভ্রান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির ক্রুরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুদ্ধিত না, সেইজন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু সলেউদীনের মাথায় অতগুলি কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—“ধন আর রত্ন, ধন আর রত্ন” কিছু পরে ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, “জাহান্নব! ধন রত্ন যদি খোয়াইতাম অতরত্ন তোমার গায়ে কেন? তোমার ঐ অলঙ্কার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।”

অবসন্ন স্মিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে
সবল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে
আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট গভীর
স্বরে বলিল “আমিন্ এ অলঙ্কারে আমার
প্রয়োজন কি ? আমার মত দুখিনীর আবার
সাজ সজ্জা কি ? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে,
বাহির সাজাইয়া কি হইবে ? আমি
নিজের সুখের জন্য অলঙ্কার পরিনা,—
যদি ইহা দেখিতে তোমার কষ্ট হয়, সে
কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—
নাথ ! তোমার কষ্ট বুচাইতে আমি হৃদয়
পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য
অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ হইবে ? ইহা
তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও

সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বুখা
পড়িয়া আছে।”

মুন্না বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি আ-
মীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন।
সলেউদীনের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া
গেল, তিনি অবাক হইয়া সেই তেজস্বিনী
মৃতিপানে চাহিয়া রহিলেন, মুন্না যখন চলিয়া
গেল, তাহার মনে একটি অশান্তির ভাব,
আসিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয়
সলেউদীন মহম্মদ খাঁর সামান্য স্ত্রীলোকের
কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিষম দুর্বলতা,
তিনি তৃত্যাকে ডাকিয়া আর দু এক বোতল
মদ পানিতে বলিলেন।

ক্রমশঃ :

—•••

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী।
ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কেমিকাল অ্যাসি-
ষ্ট্যান্ট জীঅমূল্যনারায়ণ ঘোষ প্রণীত। ই-
হাতে বিবাহ, সম্ভান-উৎপাদন ইঞ্জিনিয়ারিং-
যখন, স্ত্রীলোকদিগের ব্যাধি প্রভৃতি কতক-
গুলি বিষয় পর্যালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের
ভাষা একটু অপরিচ্ছন্ন হইলেও গ্রন্থখানি
অতি উৎকৃষ্ট, বঙ্গীয় বৃক যুবতী মাত্রেয়ই ইহা
পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকার অনেক বিষয়
যেভাবে বুঝিয়া, যেভাবে ভাবে তাহা বুঝা-
ইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতিশয়

গৎসনীয়, পুস্তকখানি পড়িলে গ্রন্থকারের
প্রতি ভক্তি জন্মে। গ্রন্থকারের পরামর্শ
সকলে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল
করুন এই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

শরৎকুমারী, অথবা (আদর্শ বঙ্গ
মহিলা।)

শরৎকুমারী লেখকের নিকট আদর্শ-ম-
হিলা হইতে পারেন—কিন্তু আমরা অনেক
চেষ্টা করিয়াও ইহার আদর্শ-চরিত্র খুঁজিয়া
পাইলাম না।

ক্রমোথান—পুষ্প।

বর্তমান সংসার যে যুহুর্তের মধ্যে উদ্বিগ্ন স্বশুদ্ধ জগদাকারে সমুৎপন্ন হয় নাই—ধীরপদে অগণিতকাল অতিক্রম করিয়া বর্তমানের সমুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা এক্ষণে একটি অবিনাশী বৈজ্ঞানিক সত্য। স্থল বা স্থলভাবে সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ক্রমোথান যেরূপ অচল অখচ কঠোর সত্য, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেও ক্রমোথান একটি অমোঘ ও অনতিক্রমণীয় নিয়ম। দৃশ্যমান জগতের কোন একটি পদার্থ হইয়া সাদৃশ্যের শৃঙ্খলা যোজন্য করিতে করিতে আদিম কালের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, বর্তমানের পরিষ্কৃট, সমৃদ্ধাবয়ব, জটিলবিকাশ-সমম্বিত পদার্থটি ভূতকালের অপরিষ্কৃট, অসদৃশ ও সরলবিকাশ-বিশিষ্ট পদার্থটির সঙ্গে সম-স্থিত বদ্ধ। বর্তমানের এই দৃশ্যতঃ বিভিন্ন আকারের ও ধরণের বস্তুটি আদিমকালীন অযত-প্রসূত, আদিমকালোচিত শোভাশালী সত্ত্ব আকারের সেই জাতীয় বস্তুর সঙ্গে একই রক্তমাংসে বিচ্ছিন্নিত। কালের দূরত্ব, অবস্থার শাসন যদিও আকারগত ও স্বভাবগত পার্থক্য আনয়ন করিয়াছে, তথাপি স্বল্পদর্শীর সুভীক্ষ দৃষ্টি হইতে মূলগত সাদৃশ্য অপরিস্রব করিতে পারে নাই। অক্ষয় কীর্তিবান ডারউইন অভিব্যক্তিবাদ

প্রচার করিবার পূর্বেও তদীয় পূর্বতন বৈজ্ঞানিকেরা এই সাদৃশ্য শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াই জীবরাজ্য ও উদ্ভিদ রাজ্যের শ্রেণী-ভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা মহাত্মা ডারউইনের প্রদর্শিত প্রাকৃতিক-নির্বাচন বাদের আলোক প্রাপ্ত হইয়েন নাই, তথাপি রহস্যাকারজড়িত প্রকৃতির মধ্যে এই দৃশ্যতঃ সাদৃশ্য-শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াই অনেক বিষয়ে এতদূর অন্ত্রান্তভাবে শ্রেণী বিভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তজ্জনা বর্তমানে তাঁহাদের প্রথর দী-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

উদ্ভিদরাজ্যেই হউক বা প্রাণীরাজ্যেই হউক, এই শ্রেণীবিভাগ একটি অতি রমণীয় অপোতব্য বিষয়। এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি ও বংশের উন্নতি-মূলক অভ্যুদয়ের পরিবর্তন সম্ভূত সোপান পরম্পরার অল্পসন্ধান করা ইহার সর্বাপেক্ষা রমণীয়তম অংশ। সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই উভয় বিষয়েই কতক পরিমাণে অভিজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক্রমশ জ্ঞানের সীমাকে পরিবর্ধিত করিতেছে। এক্ষণে একজন প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ দিব্যচক্ষে দেখিতে পান কি কি পথ অবলম্বন করিয়া বর্তমানের প্রাণী-

রাজ্য বা উদ্ভিদরাজ্য সমুদ্ভূত হইল। কেমন একটি অগ্নীম শৃঙ্খলে অতি আদিম কাল হইতে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অদৃশ্য ভাবে উদ্ভিদ ও জীব শ্রেণী বর্ধমানের অ-ভাস্কর দিয়া অপ্রতিহত গতিতে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির সমুদায় পদার্থই ক্রমোৎপাদনের অধীন। ইহার অপরি-হার্য্য প্রভাবে অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা কিম্বা আগুদীক্ষণিক একটি ক্ষুদ্রতম কীটাপু পর্য্যন্ত জগতে অ-দিত্তে পারে নাই। তবে আমাদের চিত্তবিমোহন-কারী কোমল ফুল এ সাধারণ বন্ধনীর বহি-র্ভূত হইবে কেন? কোন অলৌকিক ক্রিয়া-বলে অথবা প্রকৃতির অতীত কোন অদ্ভূত শক্তি প্রভাবে পুষ্প বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া অমু-পম লাবণ্য-ছটায় সুবিস্মল সুগন্ধের বিস্তারে এবং অতুল্য কোমলতা ও স্নিগ্ধতার আধার হইয়া জন-মন-হরণ করিবার জন্য সমাপূর্ণ প্রকৃতির একটি অভ্যাশ্চর্য্য দৃশ্যবস্তুরূপে আনীত হয় নাই। যে অনতিক্রমণীয় “বিবর্তন-বিকাশ”-চক্র জীবরাজ্য এবং উ-দ্ভিদ রাজ্য শাসন করিতেছে সেই ক্রমো-ন্নয়ের নিয়ম-প্রণালী পুষ্পরাজ্যের মধ্যেও প্রচলিত। সেই বিবর্তন বিকাশ ইচ্ছাদেরও ব্যবস্থাপক। পুষ্পস্থ তরুলতার কোন একটি জাতি (genus) অবলম্বন করিয়া তদ-ন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বংশের (species) তরুলতার পুষ্পবিকাশ আলোচনা করিলে আমরা অনেকগুলি প্রাকৃতিক বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। এই বিশেষ নিয়মগুলি পুষ্প রাজ্যের মধ্যেই বদ্ধ। বর্তমান প্রস্তাবে

আমরা সেই নিয়মগুলির আলোচনা করিব।

ক্রম-বিকাশের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে আদৌ অতি সামান্য, সরল, অসংকট আকার হইতে উহা যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, ক্রমে ততই জটিলতাময়-বিকাশে পরিণত হয়। অশক্ত হইতে দৃঢ়; সূক্ষ্ম হইতে অসূক্ষ্ম; স্বাভাব্য হইতে সংযোগ; সম হইতে বিষম;—ইহাই ক্রমোৎপাদনের মূল নিয়ম। আরম্ভকালে, সকল বস্তুর গঠনই সাদাদিগে মোটামুটি ধরণের। যতই সময় যায়, যতই অবস্থার পর অবস্থান্তর আসিয়া পড়ে, ততই অবস্থানুসারে মঙ্গলকর-আকার-গত জটিল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। কৃন্তকার যেমন এককালেই সুরঞ্জিত, সুগঠিত, সুদৃশ্য প্রতিমা নির্মাণ করিতে পারে না;—প্র-থমে প্রতিমাকে ‘একমেটে’, তাহার পর দুমেটে, তদনন্তর কৌশলপূর্ণ তুলিকা বি-ন্যাসে সে প্রতিমাকে সুন্দর মোহিনী মূ-র্ত্তিতে পরিণত করে, প্রকৃতি কৃন্তকার তা-হার নিজের অগণিত প্রতিমা গড়িবার সময় ঠিক এই রূপ নিয়ম অবলম্বন করে। ক্রমো-ৎপাদনের অমোঘ ধর্ম্মই এই। উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ করিবার পূর্বে সকল প্রাকৃতিক পদার্থই একমেটে অবস্থায় ছিল। ঐদৃশ একমেটে অর্থাৎ আদিম পদার্থের প্রধান প্রধান অংশগুলি অতি স্পষ্ট ও পৃথকভাবে অবস্থান করে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি অসম্পূর্ণ বা ভৌল বিহীন হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক অংশটি অতি পরিকাররূপে অথচ সহজে সন্মুদ্র হইতে

বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। অংশ-স্বাতন্ত্র্য আদিমতার কারণ, অংশ-সংযোগ অগ্রগামী অবস্থার চিহ্ন। কোন জাতীয় উদ্ভিদ বা ক্ষুদ্র অধস্তন স্তর হইতে যতই উপরের দিকে অগ্রসর হই, ততই অংশ-স্বাতন্ত্র্যের অভাব পরিদর্শন করি। একটি অঙ্গ হয়ত অপরিষ্কার সহিত মিশিয়া যাইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। হয়ত একটি অঙ্গ বিকাশই পায় নাই। হয়ত একটি এমনি রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। ঈদৃশ আকার পরি-বর্তনে নানারূপ প্রকারভেদ (Varieties) সমুদ্ভূত হয়। এবং এই সমুদয় কালে আদিম বনিয়াদ হইতে এক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে যে সহজ দৃষ্টিতে বা সহজ বুদ্ধিতে আদিতম বংশ এবং দূরতম প্রকারভেদে যে কোন মূলগত সাদৃশ্য আছে ইহা বিশ্বাস হয় না। ক্রমোখানের এই মূল নিয়ম সম্মুখে রাখিয়া আমরা এক্ষণে পুষ্পরাজ্যের বিশেষ নিয়ম গুলির অল্পসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বীজের অন্তর্গত সাদৃশ্যানুসারে উদ্ভিদ-বেত্তারা সমুদয় পুষ্পই তরুলতাকে দুই প্রাধান্য শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকেন; এক-বীজ-পত্রক ও দ্বি-বীজ পত্রক * এক-বীজ-

যে সকল বীজের উপরস্থ কঠিন আবরণের অর্থাৎ খোসার অভ্যন্তরের শাঁস-টুকু খোসা ছাড়ান গমের মত অবিভক্ত থাকে তাহারাই এক বীজ-পত্রক। যে গুলির শাঁসটুকু ছোঁলা কলাইয়ের মত দুই অংশে বিভক্ত তাহারাই দ্বি-বীজ পত্রক। প্রথম অঙ্কুরণ কালে এই শাঁসই পত্ররূপে পরিণত হয়, এই জন্য ইহাকে বীজ-পত্র

পত্রক উদ্ভিদ শ্রেণীর পুষ্পের প্রত্যেক অঙ্গ তিন সংখ্যা বাচক, অর্থাৎ প্রত্যেক পুষ্পের তিনটি বৃতি, (ফুলের রঙ্গিন দলগুলির নীচে পাতার ন্যায় সবুজ কতকগুলি যে দল থাকে তাহাকেই বৃতি বলা হইল) তিনটি দল, তিন বা তিনের গুণনীয়ক কোন সংখ্যার পুং-কেশর ও স্ত্রীকেশর ক্রমাগতঃ আবর্ত্যাকারে অবস্থান করে। দ্বি-বীজ পত্রক পুষ্প পঞ্চম সংখ্যাবাচক, অর্থাৎ ইহার পাঁচটি বৃতি, পাঁচটি দল, পাঁচটি পুংকেশর পাঁচটি স্ত্রী-কেশর। উভয় শ্রেণীর পুষ্পসম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম, অন্ততঃ প্রত্যেক শ্রেণীর আদিমতম ধরণের পুষ্পে ইহাই পরিণীকৃত হয়। কোন একটি জাতির অন্তর্ভূত অগণ্য বংশ এবং প্রকারের মধ্যে কোনটি আদিম ইহা মোটামুটি জানিতে হইলে উপরিউক্ত সংখ্যার পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ যে বংশের ফুলে আবর্তগুলির সংখ্যা-সাদৃশ্য পরস্পরের সহিত মিলিয়া যায়, তাহার কোন অংশ লুপ্ত বা সংযুক্ত হয় নাই, তাহাই অনেকটা আদিম। একটি দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাক।

মনে কর দ্বি-বীজপত্রক ছোট ফুলের মধ্যে একটির সমায়তনের পাঁচটি হরিৎ বৃতি, উজ্জল বর্ণের পাঁচটি পাবড়ি, পাঁচটি ক-রিয়া দুই কি তিন বা ততোধিক থাক পুং-কেশর এবং উহাদের মধ্যে থাকে থাকে অনেকগুলি ঠিক পাঁচের গুণনীয়ক কোন স্বরূপ বিবেচনা করা হয়। গম এবং তৎ-সদৃশ সমুদয় বীজ এক-বীজ-পত্রক; আর ছোলার ন্যায় বিভক্ত শাঁস যুক্ত বীজ মাত্রই দ্বি-বীজ-পত্রক।

সংখ্যার না হইতেও পারে) জী-কেশর বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল আবর্তের সকল অংশগুলিই পৃথক রূপে ও অতি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কোন বিভাগের কোন অংশের অসম্পূর্ণ বিকাশ বা অবিকাশ, লোপ বা নখিলন হয় নাই। আর অপরটির হয়ত পাঁচটি হরিৎ পাবড়ি অসমান, কিম্বা হয়ত পাঁচটির স্থলে চারটি হইয়াছে, হয়ত বৃতি ও পাবড়ির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দুই একপ্রকারের হইয়া গিয়াছে। কিম্বা হয়ত পুংকেশর ও জী-কেশর সম্বন্ধে অপর কোন পরিবর্তন ঘটয়াছে। একপাশে শেযোক্ত পুষ্পটি প্রথমোক্তটি অপেক্ষা অনেকটা যে অগ্রগামী অবস্থার তাহাতে, আর বিলম্বিত সন্দেহ হইতে পারে না। কেননা অংশ-স্বাতন্ত্র্য আদিমত্বের একটি প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু কোন একটি ফুলের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিভাগ গুলি পৃথক, কিম্বা সমায়তনের হইলেই যে সে ফুলটি আদিমতম বলিয়া ঠিক করিয়া লইব, তাহা হইতে পারে না। 'পুষ্পের আরো অনেকগুলি বিষয় বিবেচ্য' আছে। একটি যেমন—বর্ণ। নানা বর্ণের ফুল আমাদের নয়ন মনকে দৌলধোর মোহনে মোহিত করে। আর আমরা জানি পুষ্পের বর্ণ বিন্যাস আমাদের জন্য নয়। পুষ্পের নিজের বিশেষ উপকারের জন্য। সে উপকার কি তাহাও আমরা জানি। শ্যামল ও হরিৎ উদ্ভিদবৃদ্ধির বংশরক্ষা। পাঠক, ফুলের উদ্দেশ্য ঐচ্ছামান্য নয়। পক, পরিপুষ্ট বীজোৎপাদন করিয়া প্রকৃ-

তির একাধিক সংরক্ষণ ও পরিবর্তন করিতে হইবে। আমরা ইহাও জানি পুষ্প কেশর সুন্দর উণ্ডায়ে সেই মহৎকর্ত্ত সাধন করিয়া যাইতেছে। যদি তোমার হাতের গোলাপটি অমন গোলাপি বর্ণের কোমলতা ও স্নিগ্ধতাময় মনমোহনকারী গোলাপ না হইত; তুমি কি অত আদর করিয়া গোলাপকে বুকের উপর রাখিতে ইচ্ছা করিতে। কৈ তুমি ত একটি যেমন তেমন ফুলকে ওরূপ আদর কর না। যখন তোমার আমার বংশের পৃথিবীতে শূভ্রপাত হয় নাই, তাহার হয়ত অনেক অগণিত কাল পূর্বে ফুল বর্ণ সুগন্ধ ও কোমলতা বিস্তার করিতে শিখিয়াছে। যে সকল অতিথিরা সেই প্রাচীন কালে পুষ্পদের দ্বারে আনিত এবং ঘাহারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইবার সময় অজ্ঞাতদারে একের রেণু লইয়া যাইয়া অপরকে দিয়া আনিত, * সেই উপকারী অতিথিদিগকে অধিকতর রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য পুষ্প অতুলনীয় নানাবিধ বর্ণের বিকাশ আরম্ভ করিয়াছে। তুমি হয়ত লাল রং ভালবাস; আমি সাদা রং ভালবাসি; তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত লবঙ্গ পীত বর্ণ পছন্দ করেন। এইরূপ হয়ত আমাদের প্রত্যেকেরই চক্ষের ক্রটি স্বতন্ত্র। সেইরূপ, যে-সম্পদ

* পুংকেশরের রেণু জীকেশরে পড়িলে ফুলের জগ জন্মে। কীট পতঙ্গগণ ফুলে ফুলে কেশরে কেশরে উড়িয়া উড়িয়া পুংকেশরের রেণু জীকেশরে আনিয়া কিরূপে পুষ্পের বংশবর্ধন করে তাহা কয়েক মাস পূর্বে ভারতীয় গোলাপ নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতিথি পতঙ্গ পুষ্পরাজ্যে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তাহাদেরও সকলের ক্রটি, সমান নয়। কেহ কেহ খুব গাঢ় লোহিত রংয়ের পক্ষপাতী, কেহবা পাটল রং খুব পসন্দ করে, কেহ বা ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ ভালবাসে, কেহ বা ধবধপে সাদা রংয়ের ফুল ভিন্ন অপর কোন বর্ণের দিকে ফিরিয়া চাহে না। সুতরাং বাধা হইয়াই পুষ্পকে নানারকমের বর্ণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। নতুবা বংশ রক্ষা হয় না। গুরুত্বত সাধন করা হয় না। কীট পতঙ্গের মনস্তৃষ্টি সম্পাদনের জন্যই পুষ্পরাজি বিচিত্র নানাবর্ণের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আছে। যে জাতীয় কীটপতঙ্গ দ্বারা যে বংশের ফুল নিষেকিত হয়, সেই কীট পতঙ্গের ক্ষুধার অনুসারে ফুল আপনাকে লাজাইয়া রাখিয়াছে। যদি ফুল অভ্যাগত উপকারী পতঙ্গের ক্রটি অনুসারে আপনার বেশ ভূষা সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই জাতীয় তরুলতা অচিরে লুপ্ত-চিহ্ন হইবে। ভয়ানক সর্বনাশের বিষয়! তাই ফুলেরা প্রাণপণ যত্নে কীট পতঙ্গের ক্রটি অনুসারে নানাবিধ বর্ণে আপনাদিগকে সজ্জিত করে। কেবল বর্ণ-বিন্যাস নয়, বংশ বর্ধনের সহায়তাকারীদিগের জন্য অনেক ফুল অনেক প্রকারের আকারগত পরিবর্তনও সহ্য করিয়াছে। প্রকৃতির অভ্যন্তরে এমনি জীবন ধারণার্থ মহা সংগ্রাম অবিরাম চলিতেছে।

আমরা এক্ষণে দেখিতেছি সময়ে পুষ্পের গঠন-গত বা আকারগত পরিবর্তন যেমন

সংঘটিত হয়, তেমনি পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্র্যও ঘটিয়া থাকে। পুষ্পের ক্রমোখান আলোচনা করিতে গেলে পুষ্পের বর্ণবিন্যাসও একটি বিচার্য্য বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিতগণের সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি কোন প্রকারের বর্ণ আদিমত্ব-পরিজ্ঞাপক। সে বর্ণ সোণালি পীত রং। এককালে সমুদয় পুষ্পই তরু, লতারূপেতঃ শাখায় সোণালি পীতবর্ণের ফুলই শোভা পাইত। এখন কোন উদ্যানে প্রবেশ করিলেই কত বিবিধ বর্ণের পুষ্প নয়ন-পথে পতিত হয়। কিন্তু তৎকালে এক পীত বর্ণ ভিন্ন অপর কোন বর্ণ নয়নকে ভুলাইবার ছিল না। পীতই যে কেন আদিমতম রং হইল, প্রকৃতির তুলি কেন যে তখন অপর কোন রং ফলাইতে পারে নাই সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। প্রকৃতির অনেক খেলাই রহস্যময়।

সোণালি-পীত যেমন আদিমতম রং, প্রাগাঢ়-নীল অতি অগ্রগামী অবস্থার রং। যদি কোন একটি জাতির গোড়ার বংশ অবলম্বন করিয়া তাহার অধুনাতন কোন বংশের বা প্রকারের ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখি, এমন অধুনাতন বংশ বা প্রকার যাহার ফুল নীল বর্ণ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে আদিম কালের সেই সোণালি পীত রং নিষেকসহায়ক কীট পতঙ্গদের অনুরোধে যথাক্রমে শুভ্র, পাটল, ও বেগুণে রঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে নীলবর্ণে

পরিণত হইয়াছে। উজ্জলপীত উদ্ভিদরাজ্যে ক্রমোথানের প্রথমাবস্থার লক্ষণ; উজ্জল-নীল ক্রমোথানের সমুন্নতাবস্থার লক্ষণ। কিন্তু এস্থলে আমাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে পুষ্পের বর্ণ-বৈচিত্র্য সমধিক পরিমাণে নিসেকসহায়ক কীট পতঙ্গদের রুচির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক বংশের অভাব নাই যাহারা হয়ত বর্ণ সম্বন্ধে সেই আদিমতম সোণালি পীত বর্ণই বর্তমান পর্যাস্ত সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু হয়ত অপরাপর বিষয়ে ক্রমোথানের সর্বোচ্চ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত সূনীল পুষ্প অপেক্ষাকৃত বিরল। অতি অল্পমাত্র পুষ্পই দ্রুত উচ্চতম অবস্থা পরিজ্ঞাপক নীলবর্ণ উদ্ভাবন করিয়া থাকে।

পুষ্পের বর্ণের মতন লিঙ্গভেদও আর একটি বিষয়। পুষ্প-ক্রমবিকাশে ইহাও একটি বিবেচ্য স্থল। কেন না আমরা দেখিতে পাই সকল ফুল এক লিঙ্গের নহে। কোনটি পুং কোনটি স্ত্রী কোনটি বা পুং স্ত্রী-ভেদে লিঙ্গ পরিজ্ঞাপক। যদি কোন একটি ফুলের সকল অঙ্গ অথবা অঙ্গের সকল বিভাগ অযুক্ত, স্বতন্ত্র, সমাকার ও সম-সংখ্যক হয় এবং যদি পুষ্পটি সোণালি পীত বর্ণেরও হয়, তাহা হইলেই সে ফুলটিকে আদিমতম বংশীয় বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারি না। ভিন্ন অঙ্গের অংশ নিচয়ের স্বাতন্ত্র্য যেমন আদিমবংশের একটি চিহ্ন, তেমনি লিঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ক্রমোথানের উচ্চতম অবস্থার লক্ষণ। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতন

সাদৃশ্যই একমাত্র পথ চিহ্ন, যাহা অবলম্বন করিয়া তথ্যস্বার্থীরা অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বের আকর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। জীবরাজ্যে আমরা দেখি স্বতন্ত্র লিঙ্গ স্বতন্ত্র আধারে। উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত প্রাণী-রাজ্যে লিঙ্গ-স্বাতন্ত্র্য প্রবলতম ও প্রধানতম অবস্থা। অল্পমাত্র জীবের উভয় লিঙ্গের একত্র সংঘটন একটি প্রধান লক্ষণ। আবার যাহারা আরো অল্পমাত্র তাহাদের মধ্যে লিঙ্গাদির ন্যায় জটিলতর ইন্দ্রিয়ের কোন চিহ্নই নাই। দ্রুত নিম্নতম শ্রেণীর জীবরাজ্যভুক্ত কীটগুরা, পুনরুৎপাদনের সময় হইলে আপনারা দ্বিধা হইয়া একটির স্থলে দুইটি জীবগু উদ্ভাবন করিয়া স্ব স্ব জীবন-লীলা সংরক্ষণ করে। ইহাদের বংশ বৃদ্ধি এইরূপেই হয়; জনন-ইন্দ্রিয়ের সহায়তার আবশ্যক করে না। কিন্তু জীব-রাজ্যের দ্রুত + নিম্নতম শ্রেণীর জীবের ন্যায় উদ্ভিদ আমরা দেখিতে পাই না। অন্ততঃ পুষ্পস্থ তরু, লতা, গুল্মের মধ্যে এমন কোন জাতি বা বংশ বা এমন কোন দূরতর একক প্রকার ভেদও নাই যাহাকে কোন প্রকারের জননোদ্ভিগ্ন বিহীন উল্লিখিত কী-টাগুদের সদৃশ উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে অপুষ্পস্থ উদ্ভিদের পুনরুৎপাদন আলোচনা করিলে যদি উহার সদৃশ কোন প্রকারের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

+ এরূপ উদ্ভিদ অনেক আছে ইহারা কীটগুর ন্যায় ক্ষুদ্র আকৃতির। যেমন, ভাড়ির মধ্যে যে উদ্ভিদ থাকে।

জীবরাজ্যের ন্যায় উদ্ভিদরাজ্যেও একাধারে উভয় লিঙ্গের একত্র সংঘটন নিম্নতর অবস্থা পরিজ্ঞাপক। আদৌ সমুদয় ফুলই উভয়লিঙ্গ ছিল। মূল বংশ হইতে যতই শাখাবংশের উদ্ভাবন হইতে লাগিল, ততই ক্রমে ক্রমে সাধারণ নিয়মের বাতায় আরম্ভ হইল। উভয়-লিঙ্গ হইতে প্রথম পরিবর্তিত অবস্থা—একশিষফুলের কতকগুলি পুং কতকগুলি স্ত্রী এবং কতকগুলি বা উভয়লিঙ্গ। তাহার পরবর্তী অবস্থায় এক-শাখাতেই কোথাও বা একসঙ্গে কতক-গুলি পুং ফুল স্বতন্ত্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়, কোথাও বা দু-চারটি স্ত্রী ফুল আলাদা ফোটে কোথাও বা কতকগুলি উভয়লিঙ্গ ফুল ফুটিয়া থাকে। ক্রমে যখন আরো উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন একই গাছের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ পরি-জ্ঞাপক ফুল পুষ্পিত হয়। ইহাদের উভয়-লিঙ্গ-ফুল অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়ে। ক্রমশ পার্থক্যের দিকে গতি এত প্রবল হয় যে স্বতন্ত্র গাছে স্বতন্ত্র লিঙ্গের পুষ্প উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ বৃক্ষ, লতা উদ্ভিদরাজ্যের অধিকতম উন্নত ও অগ্রগামী অবস্থাপরিচায়ক। আমাদের তাল, খেজুর এই শ্রেণীকৃত শ্রেণীর অর্থাৎ বৃক্ষ-লতার মধ্যে সমধিক উচ্চ শ্রেণীর; উদ্ভিদ রাজ্যে ইহারা একত্বের অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে ইহাদের একই বৃক্ষে আর দুইলিঙ্গের ফুল মুকলিত হয় না। কতকগুলি তালগাছে কেবল পুংফুলই উৎপন্ন হয়; আর কতকগুলিতে কেবল স্ত্রী ফুলই ফুটে। বোধ হয় আমাদের পাঠক পাঠিকদিগের অনেকে অবগত

নহেন যে, সচরাচর যাহাদিগকে চলিত কথায় বাঁকা তালগাছ বলে সেইগুলি কেবল পুংফুল উৎপন্ন করে। আর যেগুলি ফলবান বৃক্ষ সেগুলিতেই স্ত্রী ফুল হয়। বাঁকা গাছগুলিতে স্ত্রীফুল বা উভয়লিঙ্গ ফুল জন্মায় নাই বলিয়াই উহাদের ফল দেখা যায় না। এবং তজ্জনাই উহার বন্ধা। উদ্ভিদরাজ্যের অতি অল্পাংশই তাল বা খেজুরের সমান উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি কোন জাতীয় পুষ্প আদিমতম ইহা স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা চাই যে ইহার অঙ্গ-গুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গের কোন বিশেষ বিভাগ অপ্ৰকাশিত রহিয়াছে কি না; অথবা কোন অঙ্গ বা অঙ্গের কোন অংশ অপর কোন অঙ্গ বা কোন অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে কি না। যদি কোন অঙ্গের বা অঙ্গের কোন অংশের বিকাশ রুদ্ধ না হইয়া থাকে, যদি কোন অঙ্গ বা তাহার কোন অংশ অপর অঙ্গের সহিত অথবা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলেই আমরা স্থির করিব সেই ফুলটি অনেকটা আদিম বংশের। তারপর যদি দেখি সেই ফুলটি উজ্জল পীতবর্ণের অথবা অপর কোন রঙ্গের হইলেও যদি প্যাবড়ির কোন স্থানে এখনও পর্য্যাপ্ত পীতের আভা বিদ্যমান থাকে এবং ফুলটি উভয়লিঙ্গ পরিজ্ঞাপক কেসর সমন্বিত হয়; তাহা হইলে বুঝিব আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত অনেকটা ঠিক। কিন্তু এই সকল প্রমাণ হইতেই আমরা এফবাসে বলিতে

পারি না যে ইহাই আদিমতম বংশের ফুল। আরো একটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে।—পুষ্পের গর্ভাধারের (Carpels) সংখ্যা। প্রথমাবস্থায় সকল ফুলেই অনেকগুলি পুং-কেশরের মতন অনেকগুলি স্ত্রীকেশর স্ব স্ব গর্ভ-কোষোপরি সমুন্নত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে পুং কেশরাবর্ত মধ্যো বিরাজ করে। প্রত্যেক গর্ভকোষ এক একটি বীজের আধারস্থান হয়; একের অধিক বীজ কোন গর্ভকোষেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী অবস্থাপন্ন পুষ্পে আমরা দেখি যে এই স্বতন্ত্র, বহুল, গর্ভকোষগুলি একে একে মিলিয়া একটি যুক্ত গর্ভাধার হইয়াছে। এবং এই যুক্ত গর্ভাধারে অনেক গুলি বীজ একত্রে পরিপুষ্ট হয়। আদিম-কালে একক-বীজ-বিশিষ্ট বহুল অসংযুক্ত গর্ভাধার, আর অগ্রগামী অবস্থায় বহু-বীজ সমন্বিত একটি যুক্ত গর্ভকোষ। উভয় প্রকারের গর্ভকোষ একই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালের একক-বীজ বিশিষ্ট গর্ভকোষের সংখ্যার আধিক্য জন্য একটি ফুলেই অনেকগুলি বিচি জন্মাইত। আর অগ্রগামী অবস্থাপন্ন ফুলের যুক্ত গর্ভাধারে এককালে অনেকগুলি বীজই পরিপক হয়। সুতরাং ঈদৃশ পরিবর্তনে পুষ্প মূল উদ্দেশ্য হইতে দূরে রাইয়া পড়ে নাই। তবে এরূপ পরিবর্তন আনিবার পুষ্পের কি আবশ্যক ছিল জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিবার পূর্বেই আমরা প্রথমে মনে করিয়া লইতে পারি নিশ্চয়ই ঈদৃশ পরিবর্তন পু-

ষ্পের পক্ষে মঙ্গলকর। নতুবা কখনই এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইত না। বিবর্তন-বিকাশের নিয়মের আদি ও পরিণাম মঙ্গল উদ্দেশ্য-পূর্ণ। এক্ষণে দেখা যাক্ এই পরিবর্তনে পুষ্পের কি হিত সাধিত হইয়াছে। পাঠক, যদি একটি যুক্ত গর্ভকোষ বিশিষ্ট ফুল লইয়া দেখ, দেখিবে একদিকে যেমন উহার স্বতন্ত্র গর্ভকোষগুলি পরস্পর মিলিয়া যাইয়া একটি যুক্ত-গর্ভ-কোষ উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি বহুল স্ত্রী কেশরের স্থানে যুক্ত গর্ভ-কোষোপরি একটি মাত্র স্ত্রী-কেশর বিদ্যমান। এইরূপ পরিবর্তন যে বিশেষ সম্বিবেচনা মূলক তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন গর্ভকোষগুলি স্বতন্ত্র ও অসংলগ্ন ভাবে স্ব স্ব কেশর উন্নত করিয়া অন্তর-আবর্ত-পূর্ণ করিয়া থাকিত, তখন অনেক সময়ে সমুদয় কোষগুলি বীজোৎপাদক হইতে পারিত না। পুষ্প-রেণু বিজড়িত পতঙ্গ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিবার সময় প্রত্যেক ফুলের সমুদয় স্ত্রী-কেশরগুলিকে নিষেকিত করিতে পারিত না। যে ব্যস্ততার সহিত পতঙ্গেরা, মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ধাবিত হয়, তাহাতে কি কখন সুসাবধানে প্রত্যেক ফুলের অতগুলি স্ত্রীকেশরকে এককালে রেণুশ্ৰষ্ট করা সম্ভব? এই জন্য অনেক কোষস্থ বীজ অপূর্ণ অপক থাকিত। প্রয়োজনমত বীজ পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হইত না। কাজে কাজেই পুষ্প এমন উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল যদ্বারা নিষেক-সহায়ক কীটদিগের সামান্যতম সাহায্যেই বহুল বীজকে পরি-

পক্ষ ও পরিপুষ্ট অবস্থায় আনয়ন কর যায়। একটমাত্র স্ত্রীকেন্দ্রবৎ মর্দিত হইলেই যুক্ত-গর্ভ কোষস্থ বহুল বীজের পরিপক্ব হওন অনায়াসসিদ্ধ ও সম্ভবপর হয়, ইহা অপেক্ষা সহজতর অথচ প্রচুর বিচক্ষণতাপূর্ণ পত্নী আর কি সম্ভব? তবে দেখ এ পরিবর্তন পুষ্পের সহজে কতদূর মঙ্গলকর।

আলোচনা করিতে করিতে আমরা পুষ্পরাজ্যের বাবুপ্রাণালী, প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান অংশ শেষ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন আমরা পুষ্পের ক্রমোথানের সমুদয় সোপানগুলিই একে একে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। পুষ্পের ক্রমোথানের এখনও অনেক বিষয় জানিবার অবশিষ্ট আছে। হয়ত উত্থান-মার্গের এমন অনেক সোপান রহিয়াছে যাহা এখনও পর্যাস্ত অনাবিষ্কৃত। আমরা উপরে যে চারিটি নিয়মের উল্লেখ করিয়া আসিলাম সেগুলি কেবল সাধারণ নিয়ম। প্রধানতঃ ঐ চারিটি নিয়মই পরিদর্শন পাথে পতিত হয়। আমরা যখন আরো গভীরতর মনোযোগের সহিত এবং গভীরতর অন্বেষণ ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্রতম পদার্থ এই পুষ্পের—ক্রমোথান আলোচনা করিতে পারিব, তখন সম্ভবতঃ আরো অনেক নিয়মের বিকাশ দেখিতে পাইব। প্রাকৃতিক প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুই প্রাহেলিকাময়। এবং প্রাহেলিকা-রাজি পরিপূরিত বিশ্ব-রঙ্গভূমিতে ক্ষুদ্র, অসংখ্য, মানব-জ্ঞান-প্রকৃতির হস্তে একটি সামান্যতম ক্রীড়াবস্তুরূপ।

উপসংহার করিবার পূর্বে আমরা একবার প্রশস্ত ক্ষেত্রে আদিমতম ধরণের অসংযুক্ত অজপ্রভাস-বিশিষ্ট, অকল্ক ও পূর্ণ বিকাশময়, একক বীজধারী বহুল-গর্ভকোষ-সমন্বিত, উভয় লিঙ্গের উজ্জল পীতবর্ণের ফুলকে প্রথম স্তরে রাখি। আর সর্বোপরি স্তরে লুপ্ত বা কল্ক-অঙ্গ, ও যুক্ত-অংশ সমন্বিত, বহুবীজধারী যুক্ত-গর্ভকোষ বিশিষ্ট, সমুজ্জল নীল বর্ণের, স্বতন্ত্র লিঙ্গের পুষ্পকে স্থাপন করি, এবং মধ্যবর্তী অসংখ্য স্তর, নানা-বর্ণের বিচিত্র গঠনের বিবিধ অবস্থাপন্ন পুষ্পরাশি দ্বারা সজ্জিত করিয়া একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কল্পনা করি সেই প্রথম স্তর কত কত আদিম কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কত অসংখ্য অসংখ্য বৎসর, যুগ, শতাব্দী উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই স্তর উপর্যুপরি ক্রমোথানের অগণ্য সোপান উত্থান করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যাস্ত প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে! স্থান ও কালভেদে, অবস্থার তারতম্যানুসারে জল বায়ু ও শীতোত্তাপের অন্তকূলতা ও প্রতিকূলতা হেতু ক্রম-বিকাশের কঠোর শাসনে কত বৈলক্ষণ্য, কত পরিবর্তন কত বিপর্যায় সহ্য করিয়া উহা অলক্ষিত ভাবে এক সোপান হইতে পরবর্তী সোপানে পৌঁছিতেছে! উহাদের আকারগত ঋনগত গুণ ও ধর্মগত কত প্রকারের বিষয়-কর পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। আর সেই সমুদয় সোপান-রাশির মধ্যে পরিবর্তনের প্রত্যেক পতিতে, ক্রমবিকাশের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে বিবর্তার অপ-

রিসেয় জ্ঞানের বিচিত্র নীলা প্রতিভাসিত । অনন্তজ্ঞানের একটি সামান্যতম বিকাশ
অবর্ণনীয় শোভামৌল্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য- মাত্র । পাঠক ! বিশ্বব্যাপিত নেত্র
সম্পন্ন, এবং অসংখ্য নিত্য পরিবর্তন-সম্বৃত পুষ্পকরমণিকার এই কাল্পনিক রমণীয়-
প্রকৃতির এই সুবিশাল পুষ্পরাজ্য বিধাতার দৃশ্য একবার নিরীক্ষণ কর ।
অনন্ত বিশ্বভাণ্ডারের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ ;

শ্রীপতিচরণ রায় ।

হুগলীর ইমামবাড়ী ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

তীর্থ যাত্রা ।

মতাহার আগা হুগলী সহরের একজন
সজ্জাত মুসলমান । ইনি অতুল ঐশ্ব্যের অ-
মিষতি । ইঁহার আর কেহ নাই, একমাত্র
কন্যারত্ন মুম্বাই ইঁহার সংসারের বন্ধন, হৃদ-
য়ের সম্বল । অতি শৈশবে কন্যা মাতৃহীনা
হইয়াছে সেই অবধি মতাহার আর বিবাহ
করেন নাই, বিবাহ করিলে মুম্বা পাছে পর
হইয়া যায়—মুম্বা তাঁহার বড় আদরের রত্ন,
যতনের ধন । ক্রমে মুম্বা যতই বড় হইতে
লাগিল, তাহার শৈশবের রূপগুণ বয়সের
সহিত প্রফুল্লিত হইতে লাগিল, মেহময়
পিত্তার মন ততই মেহের গর্কে পুরিয়া উঠিতে
লাগিল, আনন্দের উচ্ছ্বাসে উথলিত হইতে
লাগিল । কিন্তু এই আল্লাদের মধ্যেও
এমন রূপগুণসম্পন্ন স্বর্গীর রত্ন কাহাকে
সমর্পণ করিবেন—কাহার কণ্ঠে ইহা শোভ-
মান হইবে, এই এক ভাবনা আসিয়া উপ-
স্থিত হইল । কত পাত্র আসিতে বাইতে
লাগিল—কোনটাই আর তাঁহার মনের যত

হয় না, হুগলীর নবাব খাঁজাঁহা খাঁ মুম্বার
হস্ত প্রার্থনা করিলেন তাঁহাকেও মতা-
হারের পসন্দ হইল না । মতাহার এক
আধারে সকল গুণ চান, তিনি চান তাঁ-
হার জামাতা রূপবান, গুণবান, রাজবংশীয়
সকল হইবে, কেবল তাহাই নহে, মতা-
হারের পুত্র নাই, তাহাকে পুত্র করিয়া সে
সাধও মিটাইবেন, তাঁহার জামাতা তাঁ-
হার ঘরে থাকিবে ।

খাঁজা খাঁর যদিও ধন মান বংশের অ-
ভাব নাই কিন্তু ইঁহার সহিত বিবাহ দিলেত
কন্যাকে গৃহে রাখা যায় না, তাহার পর
আবার খাঁজা খাঁর অনেকগুলি বিবাহ, নবাব
হইলে কি হয়—এরূপ স্থলে কোন্ প্রাণ
ধরিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন ।
তাঁহার ত ধনের অভাব নাই, তিনি তাহা
ছাড়া আর বাহা চাহেন, একটাই সমস্ত
পাইয়া উঠেন না ।

অবশেষে মুম্বার বিবাহ হইল, ধন লোভে

পারস্য রাজবংশীয় এক যুবক তাহার বংশ মতাহারকে দান করিল। মতাহার রাজ বংশের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্বস্ব সম্পত্তি জামাতার নামে লিখিয়া দিয়া তবে এই মান তাহার হস্তগত করিতে হইল। ইহাতে আর মতাহারের দুঃখ কি, তাঁহার ধন সম্পত্তি সকলি তাঁহার কন্যা জামাতার, কিছু দিন পরে ত উহারাই লইবে, না হয় আগেই উহাদের দিলেন, ইহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। মতাহার যেরূপ চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল, তবে তিক সেরূপ হইল না। জামাতা রূপবান—রাজবংশীয়, ঋতুরালয়বাসী সকলি হইল—কেবল যেরূপ গুণবান চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল না। কিন্তু বিবাহের সময় জামাতার অভাব বুদ্ধিতে পারেন নাই, তখন সকল বিষয়েই মনোমত হইবে আশা করিয়াছিলেন, জামাতার দোষগুলি ক্রমে ফুটে লাগিল।

পিতা এত কষ্ট করিলেন, তবু কন্যা সুখী হইল না, মুন্নারকে মতাহার বেগম করিলেন—কিন্তু সুখী করিতে পারিলেন না। জামাতা কন্যার গৌরব বৃদ্ধিল না, দস্তী-পদন্তলে রক্ত দলিত হইতে লাগিল।

নবাব মলেউদ্দীন দিনরাত বিলাস-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন, বিলাস ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, কিছু চাহেন না। সেই অপরিণীত বিলাস-ভূষণ আর তাঁহার কিছুতেই মেটে না। সে ভূষণ কুবেরের রক্ত শুষ্কণ্ডও যেন নিমেষে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে। মতাহার আগার ঐশ্বর্য্য হুই চারি বছরের মধ্যেই ফুরায় ফুরায় হুইয়া

আসিল। মতাহার দেখিলেন, একদিন তাঁহার কন্যার বুকি বা পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, যে কন্যা রাজ-যজ্ঞে পালিত হইয়াছে, তাকে একদিন সত্যি বুকি বা একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়। মতাহারের হৃদয়ে অসীম বেদনা, কন্যার মুখের দিকে তিনি আর চাহিতে পারেন না, দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। এক দণ্ড সে মুখ না দেখিলে মতাহার থাকিতে পারিতেন না, সেই মুখ দেখিলেই তাঁহার নয়ন যেন আপনা হইতেই অনাদিকে ফিরিতে চায়। মুন্না বড় বুদ্ধিমতী, মুন্না বড় মেহ-ময়ী, পিতার কষ্টের ভয়ে সে তাহার হৃদয়-বেদনা লুকাইয়া রাখে, হাসি দিয়া অশ্রুজল ঢাকিতে চায়। পিতাকে বিষয় দেখিলে হাসিয়া হাসিয়া কাছে যায়, হর্ষভরে কথা কহে, ছেলেবেলায় পিতার সহিত কোন দিন কি কথা হইয়াছিল সেই সকল স্মরণে কথা ফিরাইয়া ফিরাইয়া আনে, পিতাকে বুঝাইতে চাহে তাহার প্রাণে কোন কষ্ট নাই, কেন তবে তিনি অসুখী হইবেন।

মুন্নার সেই হাসিতে সেই হর্ষের কথায়, মতাহারের প্রাণ আরো কাঁদিয়া উঠে, সেই হাসির আলোকে মুন্নার প্রাণের আঁধার তিনি যেন আরো সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। মতাহার মনে ভাবেন—“মুন্না ধন আমার, আমি যে তোমার সব হাসি বুচাইয়াছি, তবে আবার এ হাসি কেন?” ভাবিতে ভাবিতে বিষয় নৈবে, কন্যার কাছে সরিয়া আসেন, মুখের দিকে চাহিয়া সম্মুখে পিঠে হাত রাখিয়া কি ভাবিয়া কে জানে

বলিয়া উঠেন “আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারিবি”—মুগা হাসিয়া হাসিয়া বলে—“পারিব না ? পারিব বটকি” মতাহারের চোখে জল পুরিয়া আসে—“মুগা ছদের বাছা ফুলের মেয়ে কত কষ্ট সহি-তেছে—আরো কি ইহা হইতে সহিবার কিছু আছে ভগবান।”

এইরূপে দিন যায়, মতাহারের মনের স্থিরতা নাই, কন্য়ার চাপ দেখিবেন না ভাবিয়া কখনো দূরে পলাইতে চান, আ-বাব কন্য়ার কাছে আসিয়া তাহার সেই মুখখানি দেখিলেই সে ভাব আর মনে ঠাঁই পায় না, তখন মনে করেন—“মাগো এ মুখখানি কি না দেখিয়া পাকা যায়, উষ্টাকে একাকী কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইব, যা অদৃষ্টে আছে দুঃখে ভোগ করিব, ভিক্ষা করিতে হয় দুঃখে হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিবা।”

কিন্তু এক্ষণ অবস্থায় দিন কাটিল না, যে রাত্রে ঘটনাটি পূর্ণপরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই তাহা ইতাহারের কাণে উঠিল, কেবল তাহা নহে, বাহা হয় নাই—এমন অনেক কথা পর্যন্ত তিনি শুনিতে পাইলেন, তিনি শুনিলেন জামাতা মুরাকে মারিয়া সমস্ত অলঙ্কার কা-ড়িয়া লইয়াছে। তাহারপর ঘটক্ষে বখন তিনি কন্য়ার সেই দীনহীন অলঙ্কারশূন্য বেশ দেখিতে পাইলেন তাহার বুক ফাটিয়া গেল। তিনি যে সলেউদীনের সহিত বিবাহ দিয়া কি জঘনা কাজ করিয়াছেন, নিম্নের নিকট, প্রাণের কন্য়ার নিকট,

তাহার দেবতার নিকট কি ঘোষণা পা-প করিয়াছেন তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলেন, এ পাপের শাস্তি কোথায় গিয়া অবদান বুঝিতে পারিলেন না। একদিন হয়ত বা জামাতা মুরাকে হত্যা করিবে, তাহার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া হত্যা ক-রিবে, আর তাহার তাহাই একটা রক্তমাংস-হীন শবের মত বসিয়া দেখিতে হইবে, এমন বল নাই, সামর্থ্য নাই, উপায় নাই, যে তাহা হইতে কন্য়াকে রক্ষা করিতে পারেন। মতা-হার শিহরিয়া উঠিলেন—আকুল ভাবে কাঁ-দিয়া উচ্চ নয়নে বালিলেন জগদীশ্বর আমার পাপের শাস্তিতে অনাথা বালিকাকে আর বাধণ না, যত কিছু তোমার দণ্ড আছে— তাহা পাপ তাপের এই বৃদ্ধ মাথায় নি-ক্ষেপ কর, আমি সহ্যে সহ্যে তাহা বহন করিব—” জন্মের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে দারুণবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি তাহার প্রাণের সমস্ত বল দিয়া অন্তর-দেবতাকে অতি আকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, সেই দিন তাহার মর্মে মর্মে বিগ্ৰহ জন্মিল যে দেবতার নিকট গিয়া তাহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আর অন্য উপায় নাই, মুরার মঙ্গলের আর আশা নাই, দেবতা ভিন্ন মহুষ্য জামাতার শুভমতি ফিরাইতে পারিবে না। সেই দিন প্রাণের সহিত সবলে ষোকাযুক্ত করিয়া, স্নেহের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূর তীর্থে পীরের নি-কট গিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। কাহাকে মনের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন না—কেবল সেদিন সন্ধ্যার

পর আহাৰান্তে উঠিয়া আলিবার সময় মুন্নাকে বলিলেন—“মুন্না আমি বুদ্ধ হইয়াছি—একবার তীর্থ করিয়া আসি। কবে মরিয়া যাইব, শীঘ্র যাইব ভাবিতেছি” মুন্না তখন পান লইয়া পিতাকে দিতে যাইতেছিল, হাতট কাঁপিয়া হঠাৎ পানটি পড়িয়া গেল, চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটিতে পড়িল, বুদ্ধ মতাহার সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন, বাহিরে শয়নক্ষেপে গিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রাতঃকালে একদিন মুন্নার চাঁপের জলের কুয়াসার উপর দিয়া একখানি নৌকা ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে কত দূরে চলিয়া গেল, ক্রমে দিগন্তের নীমায় মি গিয়া অদৃশ্য হইল, আর কিছুই দেখা গেল না, মুন্নার যথ্য কিছু ছিল সব দিগন্তের পর-পারে গিয়া হারাইয়া গেল। সত্যি পিতা মুন্না কে ফেলিয়া গেলেন। মুন্না তাহার পরেও কিছুক্ষণ সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল, এখনও যেন সেই নৌকাখানি দেখিবার প্র-ত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যখন দেখিল, সারারাত-দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও সে নৌকা আর ফিরিবে না,—যখন বুঝিল হয়ত বা এ জনমেই আর তাহা ফিরিবে না—তখন অশ্রুজলের সহিত তাহার হৃদয় যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল; কি করিবে কোথা যাইবে—ভাবিয়া না পাইয়া ছুটিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল—যে গৃহে তাহার স্বামী ঘুমাইতেছিল অজ্ঞাতভাবে সেই ঘরে আসিয়া শয়নকিয়া দাঁড়াইল—

তখন যেন তাহার চৈতন্য হইল, আস্তে আস্তে চোখের জল মুন্নিয়া নিঃশব্দ-নিঃক্ষেপে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত বাহির বাটতে স্তরাপানে মত্ত থাকিয়া সলেউদ্দীন শেষ রজনীতে নিতান্ত বিভোর হইয়া সেই কক্ষেই শয়ন কলেন, অন্তঃপুরে শুইতে আসা আর তাঁহার পোষাইয়া উঠে না। মুন্না প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার নির্দ্রুত স্বামীকে দেখিতে আসে, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া সাধ মিটিয়া একবার দেখিয়া লয়, স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই আবার চলিয়া যায়। আজও মুন্না সেই-রূপ আসিয়া দাঁড়াইল, আজ মুন্নার শূন্য প্রাণের ভিতর হৃৎকের উজ্জ্বল কি বেগে উগলিয়া উঠিয়াছে—আর সে নামলাইতে পারিল না, ধীরে ধীরে স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিল, স্বামীর পা দুইটি বুকের মধ্যে চাপিয়া মাথাটি নীচ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে বলিল “মুন্নার আর যে কেহ নাই, একমাত্র মেয়ের পিতা তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। স্বামা, প্রাণ বর্জন—তুমি এখনো কি একবার এই অভাগিনীর মুখের দিকে চাহিবে না?

সলেউদ্দীন ঘুমের ঘোরে পা টানিয়া লইলেন—মুন্নার মাথায় পায়ের আঘাত লা-গিল। মুন্না তখন অবনত মাথা উঠাইয়া ধীরে ধীরে সেই পদে চূষন করিল, ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত চরণ অঞ্চলে মুছিয়া একবার সমস্ত হৃদয়ভরে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া, একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর মনের ব্যথা যেন চা-

পিয়া, চখের জল চোখে রাখিয়া গৃহ কার্খো
নিযুক্ত হইল।

পক্ষম পরিচ্ছেদ।

জাগন্তু স্বপ্ন।

মহম্মদ মসীনের সকালে সন্ধ্যায় নিয়-
মিত দুইটি কাজ ছিল, সকালে কিছুক্ষণ
ধরিয়া বায়াম শিক্ষা করিতেন, সন্ধ্যায়
কিছুক্ষণ সমীত চর্চায় কাটাইতেন। কিন্তু
কয়দিন হইতে এসবে তাঁহার যেন ঢিলটান
পড়িয়াছে, ব্যায়াম করিতে ত প্রায়ই স্মৃতিশ্রী
হইয়া উঠে না, গানের মজলিসটা, নিয়মিত
বসে বসে, কিন্তু তাহাও তেমন আর জমাট
বঁধে না। গায়ক ভোলানাথ যে গান ক-
হিতে যান মসীন তাহাই অপসন্দ করিয়া
বসেন। “ভোলানাথ বাহারে আর তেমন
কড়ামিঠে লাগাইতে পারেন না,” “তাঁহার
বেহাগে কড়িমধ্যম ফুটে না,” “ইমনগুলি
কড়িমধ্যমের জালায় ঘ্যানর ঘ্যানর করে,”
এইরূপে কোন গানই মসীনের মনের মত
হয় না। তাঁহার জালায় ভোলানাথও
তিতবিরক্ত হইয়া, ক্রমে সত্যসত্যই গানের
বদলে কান্নার জ্বর ধরিয়া বসেন, রাগ জ্বলায়
বিরাগ করিয়া তুলেন, বেগতিক দেখিয়া
বজুরা একে একে উঠিয়া যায়, ভোলানাথও
তানপুরাটাকে আছড়াইতে আছড়াইতে
রাখিয়া চলিয়া যান, বত রাগ তাঁহার তান-
পুরার উপর আসিয়া পড়ে।

এরূপ করিয়া ত আর ভোলানাথের
প্রাণ বাঁচে না, ভোলানাথের বয়স কাঁচা

না হইলেও মনটা শুড় কাঁচা, প্রাণটা বড়
সখের, গায়কদিগের প্রাণের ধম্মই বুঝি
এরূপ। বনের পাখীর মত হাসিয়া গান
গাইয়াই এ প্রাণ কাটাইতে চাহে। মহ-
ম্মদের বেখোদ মেজাজ, তাঁহার বড়ই খারাপ
লাগে, মহম্মদ যে বিষয় আনমনে বসিয়া
বাহারকে বেহাগ বলিয়া খুৎ ধরিয়া বসেন,
গান না শুনিয়া গানের সমালোচনা করিতে
থাকেন, তাহাতে বৃদ্ধ ভোলানাথ বড়ই
বাতবাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যতক্ষণ না
ইহার প্রাতিবিধানের একটা উপায় দেখতে-
ছেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণটা স্থস্থ হইতেছে
না।

আজ আহারান্তে মসীন সন্ধ্যায় পর
মজলিসস্থলে আসিবামাত্র ভোলানাথ মা-
থায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হা-
সিয়া হাসিয়া বলিলেন—“বাতাসটা আজ
যেন দাক্ষিণাদিক থেকে বইতে শুরু করেছে,
একটা দূর-মাফিক গান গাইলে হয় না?”
মসীনও হাসিয়া বলিলেন—“ওস্তাদজি
দাক্ষিণে বাতাস কোথায় পেলো? মহা উত্তরে”
বাতাস, আনরাত মারা গেলেম” ওস্তাদজি
মুস্কলে পাড়রা চুখু দুইটা বক্ষারত কারয়া
বলিলেন—“আজ্ঞে বনেন কি? এখনো
উত্তরে বাতাস? এ বুড়ফড়ে সে বাতাস
লাগলে যে আর ডুবে পারব না”—
মসীন বলিলেন “তোমার প্রাণের ভিতর
যে সারাদিন বসন্ত বাতাস বইছে, উত্তরে
বাতাস কি তোমাকে ছুতে সাহস করে
ওস্তাদ জি” ভোলানাথ হঁ হঁ করিয়া
একটু হাসিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ

করিয়া বলিলেন—“বাতাস বইছে আর কষ্ট, প্রাণের ভিতর আটকা পড়ে গেছে” মসীন বলিলেন—“তা আটকা পড়বার আশা বশাক কি, বহুক না যত পারে বহুক, গান টান কি হবে চলুক”—ভোলানাথের প্রাণের মত কথা হইল, মহা আফ্লাদে একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “কিন্তু ছফুর আপনার আকাশ পানে চেয়ে থাকলে চলবে না, এই দখিনে বাতাসটা গায় লা গান চাই—” মসীন বলিলেন “যে আজ্ঞে ওস্তাদজি—তাঁই হবে”

ক্রমে মহম্মদের বন্ধু বাহুবগণ একে একে মজলিসে আসিয়া বসিলেন, ভোলানাথ তানপুরা লইয়া বসন্ত বাহারের রাগ ভাজিতে আরম্ভ করিলেন, ভোলানাথ আগে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে কিছুদিন আর গান ধরিবেন না।

সপ্তস্বরে ছুইয়া ছুইয়া, মধ্যম হইতে অকমে, পঞ্চম হইতে সপ্তমে, সপ্তম হইতে স-
মিমে সে তান উঠিতে পড়িতে লাগিল। প্রাণে
নামে উঠিয়া পড়িয়া, সুরে সুরে মিলিয়া
মিলিয়া, মধুর মধুভাবে সে তান চারিদিকে
ভরিয়া ভুগিল। সে তানে মলয়ের হিল্লোল
উঠিল, কোকিলের কুজনি ছুটিল, তানে
তানে, প্রাণে প্রাণে নব বসন্তের ফুল ফুটিয়া
উঠিতে লাগিল।

মহম্মদ কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত জগৎ
ভুলিয়া গেলেন, সুরের প্রবাহ ঢালিয়া অবি-
জ্ঞাত অবিরত সেই মধুর তান মাত্র তাহার
প্রাণে গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, ফুলের
রায়ে মত হৃদয়কে মস্ত করিয়া দিয়া

ক্রমে সে তান তাহার প্রাণের দিগন্তে গিয়া
মিলাইয়া পড়িল, সে তানের বন্ধারও আর
তিনি শুনিতে পাইলেন না। দেখার অতীত
শোনার অতীত ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত অস্পষ্ট
কি এক অপূর্ণভাবে শুধু হৃদয় পূরিয়া
গেল। সহসা শত শত আলোক ছটায় ফু-
টিয়া, চারিদিক আলোকে আলোকে ছাইয়া
জ্যোতির্ময় রূপে সে ভাব তাহার সমুখে
বিরাজ করিতে লাগিল, বন্ধদৃষ্টি হইয়া মসীন
সেই আলোক ছটার দিকে চাহিয়া রহি-
লেন, সেই জ্যোতির উচ্ছ্বাস মধ্যে যেন
একটু ছায়া ভাসিয়া উঠিল, ক্রমে সে ছায়া
একটু অস্পষ্ট ছবির আকার ধারণ করিল,
মসীন অনিমেষনেতে সেই ছবি দেখিতে
লাগিলেন, ছবি অতি অক্ষুট, অতি ভাঙ্গ
ভাঙ্গ, তাহাকে চেনা যায় না, তাহাকে
চোখে ধরা যায় না, দেখিতে দেখিতে তাহা
কিছু পরিষ্কৃত হইল, সে ছবি একটি রমণী
মূর্তি; সে মুগে পাপ তাপের মলিনতা
নাই, দুঃখ বিষাদের রেখা মাত্র নাই, স্বর্গীয়
শান্তিভাবের সে মূর্তি জীবন্ত প্রতীমা।
মহম্মদ তাহাকে চিনি চিনি করিয়া আকুল
হইলেন, সহসা চারিদিকের আলোকছটা
ছবির উপর নিক্ষিপ্ত হইল, সে আলোকে
মুহুর শাস্তিময়ী প্রতীমা জ্বলিতে লাগিল।
সে প্রতীমার কাছে আর একজনকে মসীন
দণ্ডায়মান দেখিলেন, তিনি সেই সন্ন্যাসী।

নিম্নে স্থির কটাক্ষে মহম্মদ সেই
দিকে চাহিয়া রহিলেন। লজ্জিত থামিল,
মসীনের যেন খুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি
চমকিয়া উঠিলেন, নিমেষে সেই আলোক

সেই ছবি মিলাইয়া গেল, তিনি বুঝি গানের মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল, মশীন মুন্নার লেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সেদিনের মত কাছে গেলেন।

বঙ্গালীর দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস।

শ্রীপুরের ভৌমিক চাঁদরায় ও কদার রায়।

সে ব্যক্তি পিতৃবোর প্রাণ বধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন,—বাহাব জুজ্বলে দক্ষিণাপথে সর্বপ্রথমে মুসলমান পতাকা সংরোপিত হইয়াছিল সেই খাত নামা তুর্দ্বি প্রকৃতি আলোউদ্দিন বাদশাহের সময়ে কায়স্থ জাতীয় নিমচাঁদ রায় ও রাজারাম রায় নামে দুই ভাই দিল্লীর রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের বংশীয় পদবী “দেব”। কোনও লেখক ইহাদিগকে কর্ণাট কায়স্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অশ্বষ্ট কায়স্থ।

আলোউদ্দিন বাদশাহের রাজশাসনের চরমাবস্থায় পূর্ব-বঙ্গ মুসলমানদিগের হস্ত-গত হয়। বাহাজুর খাঁ স্ববর্ণগ্রাম প্রদেশের সর্বপ্রথম মুসলমান শাসনকর্তা। সত্ত্বত তাহার নিয়োগ কালেই দিল্লীস্থরের অল্পমতি ক্রমে নিমচাঁদ ও রাজারাম পূর্ব-বঙ্গে উপস্থিত হন। ভ্রাতৃত্ব পারস্যা ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শাসন-কর্তার মুনসী খানার কার্য নিরীক্ষা করিতেন, “পত্ননবিস” তাহাদের কার্যের খেতাব-ছিল।

আড়াঙ্গলবাড়িয়া গ্রামে নিমাই রায় প্র-থমেই বাবস্থান নির্মাণ করেন। সে কয়েক খানার পল্লি গ্রাম করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কৌর্ত্তিনাশা আখা ধারণ করিয়াছেন, আড়াঙ্গলবাড়িয়া তাহার মধ্যে একখানি।

নিমাই ও রাজারামের বংশধরগণ সক-লেই যত্নসহকারে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া “পত্ননবিস” দপ্তরের কার্য নিরীক্ষা করিতে ছিলেন।

নিমাই রায়ের পৌত্র মুকুট রায়ের দুই পুত্র জন্মে যথা চাঁদরায় ও কদারায়। চাঁদ-রায় ঠেগণবকালে মৌলবি আমিরবক্সের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। আরব্য পারস্য ভাষায় তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া ছিল। পিতৃবিয়োগের পর তিনি নবাব দর-কারে নিযুক্ত হন। ঘটনা ক্রমে তাঁহা-বিদ্যায় খ্যাতি দিল্লীর রাজসভায়ও ঘোষিত হইতে লাগিল। গুণগ্রাহী যোগল সম্রাট হুমায়ুন চাঁদরায়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনমাস দিল্লীতে অবস্থানের পর হুমায়ুন তাহাকে কর্ণাট প্রদেশের খেওয়ারী আহেল-কারের (জজ) পদে নিযুক্ত করেন। তৎপর হুমায়ুনের চরমাবস্থায় কিঞ্চিৎ শো-স্থরের

সময়ে চাঁদরায় বিক্রমপুরের প্রথম “ভৌমিক” উপাধি লাভ করেন।

আধুনিক জমিদারদিগের ন্যায় কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করা ভৌমিকদিগের কার্য ছিল না। যুদ্ধ-বিধ্বংহস্তি, অশ্ব, পদাতি, গুরুতরী দ্বারা রাজার সহায়তা করিতে তাঁহারা বাধ্য ছিলেন। রাজচিহ্নোচিত আসা সোটা, নিশান ডঙ্কা প্রভৃতি তাঁহাদের অঙ্গে অঙ্গে ঘাইত। আধুনিক “রাজা বাবু” বা “মহারাজাধিরাজ”দিগের ন্যায় ভৌমিকগণ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের “বিদ্যাবূষণ” উপাধির ন্যায়, অকর্মণ্য রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন না। তাঁহাদিগের সহিত প্রাচীন কালের নামস্ত রাজগণের কোন প্রভেদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রবল পরাক্রান্ত ভৌমিক চাঁদরায়ের সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

সু। “——চাঁদ রায় নাম।

জমিদার অতি আতা দখা বৃদ্ধি কাম।

ভেনলক্ষ মুজা খায় কর নাহি দেয়।

খিবাব আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়।

সম্বর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।

নিবাব ভাঙ্গার সঙ্গে যুদ্ধে না পারয়।

শক্তি যস্ত্রে উপাসক দুর্গোৎসব করি।

প্রজা দণ্ড করি লয় পূজা ছল করি।

ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।

শো ব্রাহ্মণ আদি বধ করিতে না ডরে।”

চাঁদরায় গোড়া শক্ত ছিলেন, স্তম্ভরাজ ভক্তমাল-প্রণেতা তাহার কার্য্য-কলাপ সদা-শয়তায় সহিত লিপিবদ্ধ করেন নাই। চাঁদরায়ের ইষ্টদেবতা ব্রহ্মাণ্ডগিরির সম্বন্ধে

আমরা শৈশবাবধি নানা প্রকার প্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি। প্রবাদ আছে তিনি একদা মুগ্ধরী কালীর জন্ম বিদারণ করিয়া প্রচুর পরিমাণ কৃষির বাহির করিয়াছিলেন। এক দিবস অমাবস্যা রাত্রে ভ্রম বশত পূর্ণিমা বলিয়া পূর্ণচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। আর এক দিন অর্থাভাবে শৌচিকালয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া সার্কবিগ্রহর সূর্য্যদেবকে ঠিক গগনমণ্ডলের মধ্য ভাগে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, ইত্যাদি। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদিগকে লিপিয়াছেন যে রামভদ্রপুর নিবাসী গোস্বামীগণ পূর্ষ হইতে এই বংশের কুলগুরু ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরি কিছুকালের জন্য তাহার একজন উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু ভক্তমাল-প্রণেতা বলেন ইহঁদের পূর্বে শাক্ত ছিলেন পরে ঘটনা চক্রে কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করেন।

চাঁদরায়, বয়ু পরিবারে বিবাহ করেন। বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র কেদাররায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের নামানুসারে চাঁদ এক নূতন বাটী

ডাক্তার ওয়াইজ কেদারবায়কে চাঁদরায়ের জাতি লিপিয়াছেন। যাহারা কেবল ওয়াইজ সাহেবের লেখা অবলম্বন করিয়া ভৌমিকদিগের ইতিহাস লিখিতে যত্ন করিয়াছেন তাহারায় ওয়াইজের ন্যায় ভ্রমমার্গে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। ঘরানা বংশাবলীতে কেদারকে চাঁদের পুত্র লেখা হইয়াছে। ত্রিযুক্ত অধিকাচরণ ঘোষ প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাসেও বারংবার কেদারকে চাঁদের পুত্র বলা হইয়াছে। (ঐ ইতিহাসের ৮৬ ও ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

নিৰ্মাণ করত তাহাকে কেদার-বাটী নাম দিয়া সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজারাম রায়ের বংশধরগণ রাজাবাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। রাজারামের নাম অনুসারেই উক্ত স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেদার বাটীর চতুর্দিকে গড় কাটা হইয়াছিল।†

চাঁদরায় তারামত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তারাদেবীর মূর্তি স্থাপন জন্য চাঁদরায় এক অদৃশ্য ও বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন। চাঁদরায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাটীতেও এক বৃহৎ “চিল-ছত্র” নির্মিত হইয়াছিল।

সোনামণি নাম্নী কন্যা চাঁদ রায়ের শেষ সন্তান। নয় বৎসর বয়ঃক্রমে এই কন্যার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহের ৮ মাস পরে সোনামণি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। শিশু কন্যাকে দর্শন করিয়া চাঁদরায় একপ্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

হায়! হায়! এইরূপ শত শত বঙ্গগৃহে শিশু-বিধবাগিকে দর্শন করিয়াও বঙ্গবাসীদিগের চৈতন্য হইতেছে না। এইরূপ চির-শাস্তিময়-গৃহ বঙ্গদেশে অতি বিরল যেখানে

† বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক বলেন যে, গড়খাইর মধ্যস্থিত কেদার বাটীতে এক্ষণ ৪৫০ টাকা স্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ কোন একটি পল্লিতে কত পরিমাণ ভূমির রাজস্ব ৪৫০ টাকা হইতে পারে তাহা মকঃ-ফল বাসী পাঠকগণ অগ্রেই বুঝিতে পারিবেন।

বাল-বিধবার শোকাঙ্ক পতিত হয় নাই। এইরূপ শিশুকন্যার বৈধবা দর্শনে কত পিতা মাতার হৃদয় অবিরাম দগ্ধ হইতেছে। কৈ তাঁহারা ত অগ্রসর হইয়া জঘন্য দেশাচারকে কৰ্মনাশার জলে বিসর্জন করিতে বঙ্গপরিকর হইতেছেন না। ধন্য প্রমথভূষণ! প্রমথভূষণের ন্যায় ভূষামী কি বঙ্গদেশে নাই? তাঁহারা নিজ গৃহে, প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গের গৃহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের হৃদয় কি এমনই পাবাণ নির্মিত, যে বালবিধবাদিগের উত্তপ্ত শোকাঙ্কতেও তাহা গলিত হইবে না। শিশু হতভাগিনীদিগের প্রতি দয়া করিবার জন্য মানব যদি এদেশে না থাকে তবে এই দেশ রসাতলগামী হউক, বাঙ্গালার নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হউক, বাঙ্গালী বঙ্গোপসাগরের অন্তলম্পর্শে প্র-বিষ্ট হউক।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন যে হুব গ্রামের ভৌমিক দেশাখী একবার জীপু আক্রমণ করিয়া সেই বাল বিধবা সোণামণি কে অপহরণ পূর্বক লইয়া গিয়া তাহার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ‡ বঙ্গবাসি! অদ্যাপি কি বঙ্গদেশে এরূপ কাণ্ড হইতেছে না! বাল বিধবাগণ যে কত স্থানে যেচ্ছা-পূর্বক কুল পরিভাগ করিয়া কলঙ্ককালিমা দ্বারা আত্মীয় বর্গের মুখ নান করিতেছেন। কত প্রকার পাপ কার্য দ্বারা বঙ্গদেশ কলুষিত করিতেছেন। এই সকল

‡ J. A. S. Bengal Vol, XLIII part I. page 202.

দেখিয়া গুনিয়াও কি তোমরা কলির
ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি পরাশরের মতামু-
সরণ করিবে না? ধীশক্তিসম্পন্ন দ্বাদশী
মহাশক্তি পরাশর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়া-
ছেন।

নষ্টে মৃত প্রজ্ঞিতে ক্রীবেচ পতিতে পতৌ।
শঙ্করাপৎস নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

চতুর্থ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

বাল বিধবা কন্যার বৈধব্যা-শাকে অধীর
হইয়া চাঁদরায় বৈধবিক কার্য্য হইতে হস্তো-
ত্তোলন করিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র
কেদার রায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।
৮৩ বৎসর বয়সে শিশু কন্যার বৈধব্যশোক
হৃদয়ে লইয়া চাঁদ ইহলোক পরিভাগ ক-
বেন। তাহার শ্রাদ্ধ কার্য্যে দ্বাদশ ভৌমি-
কের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

সাঁ বীরচূড়ামণি কেদার রায় মোগল সম্রাট
জ্যাকবরের সমসাময়িক। যে কয়েক জন
ভৌমিকের বাহুবলে দীর্ঘকাল সম্রাট আক-
বরের বিজয় বৈজয়ন্তী বাংলায় সংরোপিত
হয় নাই, কেদার তাহার মধ্যে একজন। তাঁ-
হার শাসনকালে সুবিখ্যাত ইংরাজ ভ্রমণকারী
রলফ কিছ বাকলা হইতে জীপুরে উপনীত
হইয়াছিলেন। * তিনি লিখিয়াছেন।

From Bacola I went to Seereepore, which standeth upon the river Ganges, the king is called Choudery. They be all here about rebels against their king Zebaldin Echeber: * for

* জালালুদ্দিন আকবর।

here are so many rivers and islands, that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevail against them. Great store of cotton cloth is made here.

পর্ভুগিজ লেখক ডু'জারিক "দ্বাদশ ভৌ-
মিক রাজ্যের" বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া-
ছেন। তিনি বলেন "পাঠান রাজ এই
সকল ভৌমিকের সাহায্যে মোগলদিগকে
বাংলা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

ডি' আবিটি, জারিকের বাক্য পোষণ
করিয়া বলেন, এই দ্বাদশজন নবপতির মধ্যে
জীপুৰ পতি—(কেদার রায়,) চাঁদরায় ঈশ্বর
(প্রতাপাদিত্য) ও (গিজিরপুরের ঈশাণী)
মহনদেআলীই প্রধান। পোরচান লিখিয়া-
ছেন "১৬০২ খৃষ্টাব্দে সনদ্বীপের অধিকার
লইয়া মগ, মোগল, পর্ভুগিজ ও হিন্দু এই
চারি জাতিব মধ্যে একটি ভুলকাও হইয়া-
ছিল। এই দ্বীপ তৎকালীন কেদার রায়ের
অধিকারে ছিল। আকবরের সেনাপতিগণ
ইহা অধিকার করেন। তৎপর পর্ভুগিজ-
গণ মোগলদিগকে জয় করিয়া সনদ্বীপে
আধিপত্য গ্রহণ করিল। আরকাণরাজ
পর্ভুগিজদিগের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া
তাহাদের বিরুদ্ধে একবছর রণতরী প্রেরণ
করিলেন। এই যুদ্ধে আরাকানপতি কেদার
রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
তদনুসারে তিনি পর্ভুগিজদিগের প্রতিফুলে
১০০ এক শত রণতরী (কোষা) প্রেরণ
করেন। পর্ভুগিজ লেখক লিখিয়াছেন,
যদিও এই যুদ্ধে পর্ভুগিজেরাই জয়লাভ ক-

রিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কেদারবাসের সহিত সন্ধি করিয়া সনদ্বীপ উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সার্কি দ্বিষষ্ঠ বৎসর পূর্বে যে জাতি সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া লঙ্কা বিজয় করিতে ধাবিত হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দী পূর্বে যে জাতির জলরণপাণ্ডিত্যে খ্যাতি উজ্জয়িনী নগরনিবাসী কবিকুল তিলক কালিদাসের কণগোচর হইয়াছিল, ১৩১৩ শত বৎসর পূর্বে চীন পরিব্রাজকগণ যে জাতির অর্ধব পোত সকল মহাসমুদ্র বক্ষে ভাসমান দর্শন করিয়াছিলেন, ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সেই বাঙ্গালি জাতির—সই গোরব-সুখ্য বঙ্গোপসাগরে সনদ্বীপ সমক্ষে অন্তর্গত হইল। আর কি ভাহার উদয় হইবে না? আর কি বাঙ্গালী সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া দেশদেশান্তরে বিচরণ করিবে না? আর কি বাঙ্গালি জাতির অর্ধব-পোত সমুদ্রের উন্নত পতাকার প্রতিবিম্ব সৌরমণ্ডল উপকূলে, † সিংহল, যব, বালী দ্বীপে পতিত হইবে না। আর কি বঙ্গীয় নাবিক-জিগের স্মধুর ভাটিয়াল-গীত সামুদ্রিক হি-

স্রোলে নৃত্য করিয়া মহাসমুদ্রগামী ভিন্ন-দেশীয় মানবদিগের কণকুহরে অমৃতধারা সিকন করিবে না?

কেদার রায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজ পতি ছিলেন। বিক্রমপুরের কুলীন কায়স্থ-গণ “সাড়ে তিন মেলে” বিভক্ত, যথা মাল খাঁ নগরের বসু, পত্রল দিয়ার ঘোষ ও জীনগরের গুহ (মস্তফা)। এই তিনমেল ও কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্ধ কুলীন। রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন, প্রাচীন কালে বঙ্গজ কায়স্থগণ তিন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের সমাজ, বাকুলার (চন্দ্রদ্বীপের) সমাজ, ও যশোর বা প্রতাপাদিত্যের সমাজ।

রলফ ফিছ বলেন জীপুর, সুবর্ণগ্রাম হইতে ছয় লিগ দূরবর্তী। কিন্তু আমাদেব বিবেচনায় সুবর্ণগ্রাম হইতে জীপুরের দূরত্ব-গণনায় ফিছের ভ্রম হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে জীপুর গঙ্গা মেঘনাদ নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল ব্রোকের মানচিত্রে জীপুর Zerepoer প্রধা-নগরী রূপেই চিত্রিত রাখিয়াছে। ব্রোক Zerepoer এর নিকট Ceerpoer Fringe নামে একটি নগর অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রফেসর বুকমান ভ্রমক্রমে ইহাকেই জীপুর নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে উক্ত Ceerpoer Fringe আধুনিক রিকাবী বাজারের নিকটবর্তী ফেরিঙ্গী বাজার। বুদ্ধ মার্সমানও এই ফেরিঙ্গী বাজারের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে জীপুরের মধ্যেই উন্নতি ছিল।

† “সৌরমণ্ডল” অধুনা করমণ্ডল নামে পরিচিত। সৌরমণ্ডল কল্পে করমণ্ডল হইল তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তত্ত্বেরে আমরা বলিতে পারি যে, ‘সু’ এর উচ্চারণ “ছ”। তদনুসারে ইউরোপীয়গণ ইহাকে ছৌরমণ্ডল শ্রবণ করিয়া “C” অক্ষর নামের অগ্রে সন্নিবেশিত করেন। তৎপরেই আমাদের ও অজ্ঞ বিলাতী মানবদিগের কৃপায় “C” “ক” এ পরিণত হইয়াছে।

এস্থান হইতে কার্পাস বস্ত্র যুনানী-মণ্ডলে ও চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইত। পরি-ব্রাজক ফিছ আমাদের এক জন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বৃহৎ তোপু প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীপুরে উপযুক্ত কার্যকার ছিল।

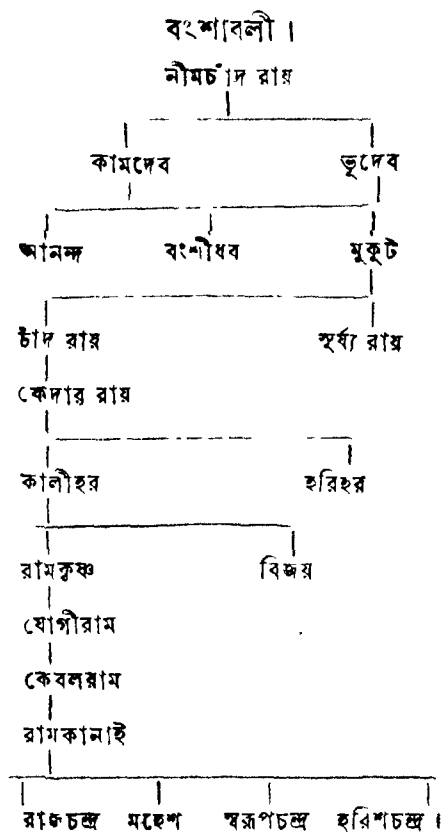
কেদার রায় কার্তিকপুরের নিকটবর্তী স্থানে একটি বাটী নিৰ্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি সেই স্থানটী কেদার বাটী নামে পরিচিত রহিয়াছে। তিনি কেদারপুর নামে আর একটি নগরী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বা-ণিজ্য দ্বারা কেদারপুরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ব্রাহ্মের মানচিত্রে Chedder-poer বৃহৎ নগরী রূপে চিত্রিত আছে। অ-দ্যাপি বিক্রমপুরের মধ্যে একটি স্থান কে-দারপুর নামে পরিচিত, কিন্তু তাহার প্রাচীন উন্নতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে চাঁদ ও কেদার পুরের কীর্তিসমূহ গ্রাস করিয়া বিক্রম-পুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছে। সেই করালকালরূপিনী কীর্তি-নাশার তীরভূমিতে প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন-সমূহ দর্শনের আশা হারাশা। বঙ্গ প্রান্ত-ভূমী প্রদেশ সমূহে (উড়িষ্যা, চুটীয়ানাগ-পুর, আসাম ও ত্রিপুরায়) প্রাচীন উন্নতির কীর্তি স্তম্ভ স্বরূপ রাশি রাশি উচ্চ-চূড় ম-ন্দির ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গে তাহার কোন চিহ্ন নাই, এক মাত্র গঙ্গাই ইহার কারণ।

কীর্তিনাশার উত্তর তীরে একটি মঠ ও দীর্ঘিকা অদ্যাপি কেদার নামের কীর্তি সমূ-হের চিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। এই মঠ

সাধারণত “রাজবাড়ীর মঠ” ও দীর্ঘি-কেশার মার দীর্ঘি” নামে পরিচিত রহি-য়াছে।

মোগল সম্রাটের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া কেদার রায় কিংকৎ হুর্দল হইয়া পড়েন। তথাপি তাহার অবশিষ্ট যে স-ম্পত্তি ছিল তাহা তাহার বৈদ্য বংশীয় দাস রঘুনন্দন দাস, তাহার মৃত্যুর পর অপহরণ করেন। এই রঘুনন্দন দাস নওপাড়ার চৌ-ধুরীদিগের আদি পুরুষ। ইহারা এক সময়ে বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজপতি ছিলেন। ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় যে দুই সময়ে পূর্ন-বঙ্গে দুই জন বৈদ্য অসমাদারণ উন্নতি করি-য়াছিলেন। ইহারা উভয়েই কায়স্থ জাতির পদসেবা করিয়া আপনাদের উন্নতির সূত্র-পাত করেন। একজন কেদার রায়ের ভৃত্য রঘুনন্দন দাস, অন্য ব্যক্তি মালখা নগরের বসুদিগের ভৃত্য খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ সেন।

শ্রীচন্দ্র নিম্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদেরকে চাঁদ-কে-দারের এক খানা ঘরানা বংশাবলী ও পরি-বার মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদাদি লি-খিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার স-হিত স্বীকার করিতেছি যে এই প্রবন্ধে তা-হার লিখিত বংশাবলী ও প্রবাদ সমূহ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তাহার লিখিত বংশাবলী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম কিন্তু ইহা আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে, যদি কোন পাঠক এই বংশের এক খণ্ড স-ম্পূর্ণ বংশাবলী আমাদেরকে প্রদান করেন, তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আপনাকে কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দি-য়াছেন তিনি আরও বলেন ‘যে ইহারা “যুতকৌষিক” গোত্রীয় “দে” বংশজ।



শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ

বিদায় ।

হেথা হতে বাও, পুরাতন !
 ছেদায় নুতন খেলা আরম্ভ হয়েছে ।
 আবার বাজিছে কীনি,
 আবার উঠেছে হাসি,
 রসভের বাতাস বয়েছে ।
 সুনীল আকাশ পড়ে
 শুভ্র মৈঘ থরে থরে
 স্রাস্ত্র যেন রবির আলোকে—

পানীরা কাড়িছে পাখা,
 কাঁপিছে তরুর শাখা,
 খেলাইছে বালিকা বালকে ।
 সমুখের সরোবরে
 আলো ঝিকিমিকি করে—
 ছায়া কাঁপিতেছে থর থর,—
 জলের পানেতে ঢেয়ে
 ঘাটে বসে আছে মেয়ে—
 শুনিছে পাতার সরসর ।

কি জানি কত-কি আশে
চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে !
সবাই ত তুলে আছে—
কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে !
বাতাস যেতেছে বহি
তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস !
সুদূরে বাজিছে বাঁশি,
তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস !
উঠেছে প্রভাত রবি,
আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া !
বারেক যে চলে যায়,
তারে ত কেহ না চায়,
সে তবু তার কেন এত মায়া !
ত তবু কেন সজ্জাকালে
সে জনদের অন্তরালে
লুকায়, ধরার পানে চায়—

নিশীথের অন্ধকারে
পুরাণোঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায় !
কি দেখিতে আসিয়াছ !
যাহা কিছু ফেলে গেছ
তাদের কে করিবে যতন !
অরণের চিহ্ন যত
ছিল পড়ে দিন-কত
ঝরে-পড়া পাতার মতন !
আজি বসন্তের বায়
একেকটি করে হায়
উড়ায় ফেলিছে প্রাতি দিন ;
ধূলিতে মাটিতে রহি
হাসির কিরণে দহি
ক্ষেণে ক্ষণে হতেছে মলিন ।
ঢাক তবে ঢাক মুখ
নিয়ে যাও সুখ দুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে ।
হেথায় আশ্রয় নাই ;
অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাল্যবিবাহ।

প্রতিবাদ।

কাজল মালের “ভারতীতে” বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমি এই প্রবন্ধটি আদ্যত পাঠ করিয়াছি। বাল্যবিবাহ দ্বারা যে আমাদের সমাজের অনেক উপকার হইতেছে তাহা দেখাইবার জন্য প্রবন্ধলেখক বাল্যবিবাহ-

হের বিরুদ্ধ-আপত্তি সকল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাঠিয়াছেন। কিন্তু আমার সেই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আছে।

১ম তর্ক। বালাবিবাহে পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির মনোমত হয় না ইত্যাদি।

লেখক বলেন যুবক যুবতীগণ আপন আপন স্ত্রী ও স্বামী প্রকৃতরূপে পসন্দ করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্য লেখকের মতে পিতা মাতা, পুত্র কন্যার স্ত্রী ও স্বামী নির্বাচন করিয়া দিলে পুত্র কন্যার মঙ্গল হয় ও দাম্পত্য প্রেমের বন্ধন চিরজীবনের জন্য স্থায়ী হয়। এই যুক্তি দ্বারা লেখক যৌবন-বিবাহ অপেক্ষা বালাবিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমি লেখককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। বিবাহটা কি স্বাভাবিক না কেবল একটা সর্ব্ববাদী সম্মত সামাজিক ব্যাপার? লেখক বার বার দুইটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন “বালাবিবাহ” ও “যৌবন বিবাহ।” আমি ত্ত বালাবিবাহের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারি না। “বালাবিবাহ” কথাটা যেন ঠিক “দোনার পাথর বাটির” মত। প্রকৃত বিবাহ বাহা তাহা কি কখন বালাকালে সম্ভবে? বিবাহ ত যৌবনের ধর্ম। যুবক যুবতী ভিন্ন কি কখন প্রকৃত বিবাহ হইতে পারে? প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বভাবের নিদ্দিষ্ট সময়ের আগে বৃদ্ধিমান মাহুষ বিবাহ কার্য্যটা সমাধা করিয়া কি কখন সুখী হইতে পারে? যুবক যুবতী অনেক সময় শরীরের সৌন্দর্য্য

দেখিয়া ভুলিয়া যায়, তাহাদের পরস্পরের গুণের ও রুচির প্রতি তত লক্ষ্য থাকে না, এই জন্য রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া অনেক যুবক ও যুবতী শেষে অসুখ্যাপ করিয়াছেন। লেখকের মতে সেই জন্য যৌবন বিবাহ দোষাবহ। বুদ্ধ পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের উপর বর ও কন্যা নির্বাচনের ভার থাকিলে এরূপ হয় না। কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিক সত্য? আমি বলি কখনই নয়। যুবক, যুবতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন বুদ্ধ পিতা মাতা হন না। লেখককে তাহা কে বলিল? আজকাল হিন্দু সমাজে বিবাহের সময় কন্যার রূপ ছাড়া যে আর কিছু দ্রষ্টব্য আছে তাহা কেহই মনে করেন না। “মেয়েটি ভাল” মানে কি “মেয়েটি দেখিতে ভাল” নয়? সুন্দর জামাই করিব ও সুন্দর বউ করিব অনেক পিতা মাতার কি কেবল এই উদ্দেশ্য নহে। লেখক যে যুক্তি দ্বারা যৌবন বিবাহের দে দেখাইয়াছেন আমি ঠিক সেই যুক্তি দ্বারা বালাবিবাহের দোষ দেখাইতেছি। পিতা মাতা অর্থলোভী হইয়া পুত্র কন্যার রূপ গুণ ও রুচির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের বিবাহ দেন এই জন্য পরে স্ত্রী ও স্বামীর সহিত মনের মিল হয় না, দিবারাত্র কলহ হইয়া থাকে। লেখক হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন পিতা মাতা শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ হইলে এ আশঙ্কা থাকে না। আমিও বলিব যুবক যুবতীগণ শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ হইলে লেখক যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা থাকে না। বাস্তবিক যৌবন

কালে স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিলে যদি কিছু অমঙ্গল হয়, যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ যুবক যুবতী কেবল পরস্পরের শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া ফেলেন ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় স্মৃতিচরিতার্থ হইলে আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকে তাহা হইলে সে দোষ যৌবন কালে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া হয় নাই, নীতি ও ধর্ম শিক্ষা করেন নাই বলিয়া হইয়াছে। লেখক বলিবেন পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার ভার পিতা মাতার। আমি বলি পুত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া পিতা মাতার কর্তব্য কর্ম। তবে পুত্র কন্যা বিবাহ করিবার সময় পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের মত ও পরামর্শ লইতে পারেন। শুদ্ধ পারেন কেন পিতা মাতার মত গ্রহণ করা তাহাদিগের উচিত। আজ কাল হিন্দু সমাজে যে প্রকার বিবাহ প্রথা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শিক্ষিত যুবক শিক্ষিতা যুবতীর বিশেষ সাবধান হইয়া চলা একান্ত আবশ্যক। পিতা পুত্রের বিবাহ দিবেন, কারণ পুত্র এট্রেস পাস দিয়াছেন। ঘটক উপস্থিত। পিতা ঘটককে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন "পাওনা গণ্ডা কেমন, কয় হাজার টাকা দেবে?" ঘটক যদি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে অনেক স্থলে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জিজ্ঞাসা আবশ্যক হয় না। কিছু দিয়া মেয়ের মুখ দেখা একটা রীতি আছে তাই পিতা মহাশয় একবার মেয়ে দেখতে যান। কিন্তু সে দেখার উপর বিবাহ দেওয়া না দেওয়া

নির্ভর করে না। বিবাহের একমুখ কুপ্রথা প্রচলিত থাকিতেও কি লেখক মহাশয় শিক্ষিত যুবকদিগকে পিতা মাতার উপর বিবাহের সম্পূর্ণ ভার দিতে বলেন? যদি বলেন, তাহা হইলে আমার মতে কোন শিক্ষিত যুবকের লেখকের কথা শুনা উচিত নহে। আর একটা কথা আছে, আমাদের হিন্দু সমাজের যেকোন অবস্থা তাহাতে পিতা মাতা কখন বিবাহ সম্বন্ধে পুত্র কন্যার মনোগত ভাব ও ক্রটি জানিতে পারেন না। কি প্রকারে জানিবেন? পুত্র বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছেন এমন সময় পিতা আসিয়া পড়িলেন, অমনি সকলে নিস্তক। পুত্র শুন্ করিয়া একটি জাতীয় সঙ্গীত অথবা ব্রহ্ম সঙ্গীত করিতেছেন, এমন সময়ে পিতা আসিয়া পড়িলেন, অমনি পুত্র জড় শব্দ হইয়া চূপ করিল। যে সমাজে পিতা পুত্রে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্তা কহিতে পারেন না সে সমাজে পিতা কি করিয়া পুত্র কন্যার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন। লেখক বলিতেছেন বাল্যকাল হইতে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বাস করিলে তাহাদের দাম্পত্য প্রেম দৃঢ় হয়। একথা কি সত্য? হুই এক স্থলে হইলেও হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে হয় না। বালক বালিকাদের পরস্পরের প্রতি যে ভালবাসা থাকে তাহা কি দাম্পত্য প্রেম না তাহা হইতে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত হয়? একটি বালক একটি বালিকাকে ও একটি বালককে বড় ভাল বাসিত। কিন্তু ঐ বালকটি যখন একজন

যুবক হইল তখন সে আর পূৰ্ব্বোক্ত বালক ও বালিকাটিকে ঠিক এক প্রকারে ভাল বাসিতে ও এক চক্ষে দেখিতে পারিল না।

বালিকা যুবতী হইলে, তখন সে তাহার বাল্যসখার মন আকর্ষণ করিতেও পারে নাও করিতে পারে। বাল্যকালের ভালবাসার উপর সৰ্ব্বস্থলে যৌবনের ভালবাসা নির্ভর করে না। দাম্পত্যপ্রেম যৌবনকালেই সঞ্চারিত হয় বাল্যকালের ভালবাসা ইহা জন্মাইয়া দেয় না। সেই জন্য বলি আগে হৃদয়ে দাম্পত্যপ্রেমের সঞ্চার হউক তবে তাহাকে দৃঢ় করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা যাইবে। লেখক একটা বড় পাকা কথা বলিয়াছেন “কিন্তু বালাবিবাহে বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে একপ্রকার শিক্ষা পাইতে পাইতে তাহাদের উভয়ের মন এক ভাবেই গঠিত হইতে থাকে। উভয়ের মধ্যে এক-জনের কোন দোষ থাকিলে অন্য জনে ছেলেবেলা হইতে উহা দেখিতে দেখিতে উহাতে একরূপ অভ্যাস হইয়া যায় এবং শেষে আর এইরূপ দোষের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে না। ইত্যাদি।” মোট কথা এই, বালিকা-গণকে বাল্যকাল হইতে একরূপ প্রকার শিক্ষা প্রদান কর বাহাতে ভবিষ্যতে স্বামীর পাপকে পাপ বলিয়া গণ্য না করে। কি ভয়ানক কথা! স্বামী যদি মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হয় তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতে স্ত্রীকে স্বামীর কাছে রাখ তাহাতে স্ত্রী মদ্যপান ও পরস্রীচরণকে দোষ বলিয়া

মনে না করিতে পারে। যদি এষ্ট প্রকারে স্ত্রীকে স্বামীর মতের সহিত এক হইতে না শিখাও, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মত-ভেদ ও ক্রটিভেদ উপস্থিত হইয়া পরিবারে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হইবে। লেখক বড় শাস্তিপ্ৰিয়। কিন্তু এপ্রকার শাস্তি-প্রিয়তা প্রশংসিত হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যেক শিক্ষিত ধার্মিক লোকের নিকট অতিশয় নিন্দিত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বার্থপর পুরুষ! তোমার সুখের বা-ঘাত হইবে বলিয়া তুমি স্ত্রীলোকের কর্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম বুদ্ধিকে মলিন করিতে চাহ, তুমি স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতে চাহ না, পাছে সে শিক্ষিতা হইয়া আপনার স্বাধীন মত দ্বারা পরিচালিতা হয়, পাছে সে তোমার মতে মত না দেয়। আজ যদি আমাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইত তাহা হইলে অনেক স্বামীকে স্ত্রীর সহিত সাবধানে কথাবার্তা ও বাবহার করিতে হইত যথেষ্টাচারী হইয়া স্ত্রীকে পদ দ্বারা দলন করা বড়কঠিন হইয়া পড়িত। হায়! আজ কত শত বঙ্গনারী পাষণ্ড পা পিষ্ট স্বামীর অত্যাচারে কাতর হইয় নির্জনে বসিয়া চক্ষের জলে আপনাদের বক্ষস্থলকে প্লাবিত করিতেছেন। কয়জন পুরুষ তাহাদিগের চক্ষের জল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন?

২য় তর্ক। বালা-বিবাহে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহাদিগের

মধ্যে অনিয়মিতের কারণ হইয়া উঠে—
ইত্যাদি।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কি কর্তব্য তাহা জানা আর পরস্পরের মন যোগাইয়া কাজ করা কি এক? স্বামী ও স্ত্রী জ্ঞানীতি, পরায়ণ হইলে উভয়ে পরস্পরের মন যোগাইয়া অনেক দুর্দ্বন্দ্ব করিতে পারেন। তাই বলি স্বামী ও স্ত্রী বালা-কাল হইতে এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাহাদিগের কর্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুট হইয়া না, উভয়ের এক প্রকার কুচি হইতে পারে। স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুট হইবার জন্য নীতি শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক। উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন কখন কর্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুট হইয়া না। ৯। ১০ বৎসরের বালিকা ও ১৬। ১৭ বৎসরের বালকের কি কখন স্ত্রী ও স্বামীর কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ হওয়া সম্ভব?

৩য় তর্ক। বালা-বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন ক্লম হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

লেখক বলিতেছেন অভিভাবকগণের দোষেই বালা-বিবাহ দ্বারা বালক বালিকা-গণের শরীর ও মন ক্লম হইয়া পড়ে।

লেখক যে প্রকার তর্ক অবলম্বন করিয়া বর্তমান হিন্দুসমাজে বালাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাহাতে ত আমি অভিভাবকগণের কিছু দোষ দেগিতে পাই না। কারণ লেখক পূর্বেই বলিয়াছেন বালক-স্বামী ও বালিকা স্ত্রীর ছেলেবেলা হইতে একত্রে থাকা আবশ্যিক। অভিভাবক বালক-স্বামী ও বালিকা-স্ত্রীকে একত্র কথা-বার্তা করিতে ও থাকিতে যেন তাহাতে

তাহাদিগের দোষ কি? একত্রে না থাকিলে ও কথাবার্তা না করিলে কি করিয়া তাহারা পরস্পরের মনের ভাব জানিতে পারিবে? লেখক মহাশয় যদি বলেন অভিভাবকগণ তাহাদিগকে রাত্রিতে একত্রে শয়ন করিতে দিবেন না ও সর্বদা তাহাদিগের উপর চক্ষু রাখিবেন তাহা হইলে আর কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি বলি বর্তমান হিন্দুসমাজে তাহা হওয়া অসম্ভব। হিন্দুসমাজে নব-দম্পতীর কথা কহিবার অধিকার নাই। ৮। ৯ বৎসরের বউ বালক স্বামীকে দিবা ভাগে কাহার সাক্ষাতে দেখিলে দুই হাত ঘোমটা দিয়া বসেন। সেই জন্য দিবাভাগে তাহাদিগের কথা কহিবার সুবিধা না থাকায় অভিভাবকগণ রাত্রিকালে তাহাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অধিকারের কি বিষময় ফল সমাজে প্রতিদিন ফলিতেছে লেখক কি তাহা অবগত আছেন? আমাদিগের দেশে বালিকাদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার যে কি মহানিষ্ট হইতেছে তাহা এখানে লিখিয়া উঠা অসম্ভব। জীলোকদিগের বিবাহের উপযুক্ত সময় স্বয়ং পরমেশ্বর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তবে কেন হিন্দুসমাজস্থ বিজ্ঞ মহাশয়েরা সে সময়ের পূর্বে বিবাহ ও রাত্রিতে স্বামীর সহিত একত্রে শয়ন করিবার অধিকার দিয়া বালক বালিকাগণের শরীর ও মন চিরদিনের জন্য নষ্ট করেন বুঝিতে পারি না। লেখক বলেন বালাবিবাহ প্রথা সমাজ হইতে দূর করিয়া দিলে স্কুল কালে-জের ছেলেদের চরিত্র কলুষিত হইয়া যা-

ইবে। আমি বলি চরিত্র ভাল হওয়া না হওয়া সঙ্গ ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে বালাবিবাহের উপর নির্ভর করে না। কারণ অনেক বয়সে বিবাহ করিয়াও অনেক ছেলে মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়াছে আর অল্প বয়সে বিবাহ না করিয়াও অনেক ছেলে ভাল আছে। তবে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগকে ২২২৩ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা ও পুরুষদিগকে ২৫২৬ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা রাখিলে অনেক স্থলে চরিত্র কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

৪ম তর্ক। বালাবিবাহে দম্পতী উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি।

দরিদ্র বাঙ্গালিদিগের অল্প বয়সে বিবাহ করিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই যে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় তাহা মিনি না মানিবেন তিনি একজন সুতর্কিক হইলেও আমাদের দেশের সমাজের অবস্থা জানিতে তাহার এখনও অনেক বাকি আছে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল লোকেরই যে প্রকার অর্থাভাব হইয়াছে যে প্রকার ভয়ানক জীবন সংগ্রাম উপস্থিত, তাহাতে বিবাহ করিয়া শিক্ষা করিবার অবসর পাওয়া দূরে থাকুক, সামান্য অল্প বস্ত্রের জন্য চক্ষিখ ঘণ্টা ভাবিতে হইতেছে। সাধারণ লোকের যখন এই প্রকার অবস্থা তখন অল্প বয়সে বিবাহ করিলে শিক্ষার কি প্রকার সুবিধা হয় তাহা একটু চিন্তা করিলেই

লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিতেন। বাহাদিগের অর্থসঙ্কতি নাই তাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াও সংসারের ভার লইয়া অর্থ চিন্তায় বিব্রত হইয়া লেখা পড়া শিখিতে পারেন না আর বাহাদিগের অর্থের জন্য ভাবিতে হয় না সেই সকল ধনীসন্তান অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া বিলাসপরাশর হইয়া পড়েন ও লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া অসার আমোদ প্রমোদে ও নানা প্রকার পাপ কার্যে সময় অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া স্বত্ত্বের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারেন বটে কিন্তু কয়জন লোকের এ সুবিধাটা ঘটিয়া উঠে? আর-এরূপ হইলে অনেক স্থলে আমাদের স্ত্রী পুত্র লইয়া স্বত্ত্বের গলগ্রহ হইয়া পড়েন আমাদের স্বয়ং অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করিয়া বাসিতে অলস ও আমোদপ্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন। লেখক মহাশয় কি এটা ভাল মনে করেন?

৫ম ও ৬ষ্ঠ তর্ক। বালাবিবাহে দন সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয়। বালাকালে বিবাহিত স্বামী অনেক সময় স্ত্রী পুত্রকে ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম হয় না ইত্যাদি। বাহাদিগের ধন সঞ্চিত নাই তাহাদিগেরই ধন সঞ্চয় করিতে হয় সুতরাং লেখক মহাশয়ের জানা উচিত যে এ তর্কটি ধনী লোকদিগের বিরুদ্ধে খাটে না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থলোকের সন্তানেরা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া ও বৎসর বৎসর এক একটি সন্তান-রত্ন লাভ করিয়া কি করিয়া বর্তমান সময়ে ধন সঞ্চয় করিতে পারেন তাহা লেখক মহা-

শয়ই জানেন। আমিত ইহাতে ধন সঞ্চয়ের কিছুমাত্র সুবিধা দেখি না।

৭ম তর্ক। বালাবিবাহে স্ত্রীদিগের মনের স্বাধীন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি। সকল দেশেই সবল সার্থপর পুরুষ অবলা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার ও তাহাদিগের দৈন্য প্রভৃতি অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ও অনেক হতভাগ্য পুরুষ রমণীকে একটি ভোগ্য বস্তু বলিয়া মনে করিতেন ও এখনও করেন। অনেক মুসলমান স্ত্রীলোকের আত্মা নাই বলিতেও ভীত ও কুণ্ঠিত হন না। যে স্বামী আপনার স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়াছেন তিনি কখন আপনার স্ত্রীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া সুখী হন না। আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকমাত্রেই স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই লেখক মহাশয়কে তাহা কে বলিল? আমাদের সমাজের হাড়িডোম প্রভৃতি গরিব লোকদিগের স্ত্রীগণ স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। অনেক ভদ্র মহিলাও আজ কাল শিক্ষয়িত্রী, খাজী প্রভৃতি কার্যোনিবৃত্ত হইয়াছেন। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই বটে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি গৃহকর্মে, ধর্ম-সাধনে স্বামীর অনাগ্য কার্য প্রদর্শনে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে?

স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিলে যদি একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অশান্তি উপ-

স্থিত হয় তাহা হইলে প্রজাদিগকে স্ব স্ব স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা ও সেই সেই মতানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুমতি দিলে কি একটি প্রকাণ্ড রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হইবে না। তবে আমরা উপশ্রুত হইলেও কোন কোন অধিকার হইতে রাজারা আমাদের বঞ্চিত করেন বলিয়া আমরা এত দুঃখিত হই কেন? যে পরিবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শাস্তি আছে তাহাই ব্যক্তিবিক আদর্শ পরিবার। আর যে পরিবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিয়া একটা লোক দেখানগোছ শাস্তি থাকে সে পরিবারে কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই সুখী হয় না। পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বাধীনতা হরণ করিলে কখনই প্রকৃত শাস্তি থাকিতে পারে না। বাহিরে ভয়ে লোকে চুপ করিয়া থাকে কিন্তু মনে মনে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়। আমার স্ত্রী যদি আমার সংসারযাত্রা নির্বাহের সহায় না হন যদি তিনি আমার হস্ত-পরিচালিত একটি বস্ত্রমাত্র হন তাহা হইলে বিবাহ করিয়া সুখ কোথায়? যে স্ত্রীর সহিত আমার এত নিকট সম্বন্ধ সেই স্ত্রী যদি আমার দরিদ্রতার সময় কিছু সাহায্য করিতে না পারেন যদি আমার পাপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইলে আপনার স্বাধীন মত ও ধর্মবুদ্ধি দ্বারা আমাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারেন, যদি আমি কোন ভ্রমে পড়িলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে না পারেন, যদি অনাগ্য কার্য্য করিলে আমাকে ভৎসনা না করেন তাহা

হইলে বিবাহ করিয়া লাভ কি? বিবাহ কি কেবল ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থতার জন্য? স্ত্রী যে প্রকার স্বামীর উপর নির্ভর করিবেন স্বামী ও সেই প্রকার স্ত্রীর উপর নির্ভর করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে আমরা শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিই নাই বলিয়াই আমরা, তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু পাই না। স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে গৃহে অশান্তি আসা দূরে থাক প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে। যেখানে প্রকৃত প্রেম সেখানে স্বাধীন ইচ্ছার বিসর্জন সীকার করি। যে কার্যা করিলে আমার প্রিয় কোন বন্ধুর মনে কষ্ট হয় আমরা ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় সে কার্যা করি না বটে, কিন্তু বিবেকের আদেশ হইলে সর্বস্বলে পিতা, মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কাহারও নিকট আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করা উচিত নয় তখন কাহারও ভালবাসার খাতির রাখা কর্তব্য নহে। কারণ প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমে যাহাব বিশ্বাস আছে সে কি কখন সংসারের ক্ষুদ্র, ভ্রান্ত, অজ্ঞান মানবের প্রেমে ভুলিয়া পরমেশ্বরের আস্থা অবহেলা করিতে পারে। যদি সম্পূর্ণরূপে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে চাহ তবে ঈশ্বরের কাছে কর আর কাহারও কাছে করিও না। লেখক মহাশয়ের আদর্শ-স্ত্রীকে আমি আদর্শ-স্ত্রী করিতে পারি না।

৮ম তর্ক। এথম সমাজে বালাবিবাহ রহিত করা সহজ না বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা সহজ? আমার বোধ হয় বালাবিবাহ রহিত করা সহজ। লেখক মহাশয় সমাজে

রোগের জন্ম দিবার বিধান করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে রোগের ঔষধও বিধান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লেখক মহাশয়ের রোগ জন্মাইবার বিধানটা নিশ্চিত আর রোগ শান্তির উপায়টা অনিশ্চিত। তাই বলি যতদিন না সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতেছে অন্ততঃ ততদিন কি বালাবিবাহ বন্ধ রাখা উচিত নয়?

৯ম তর্ক। বাল-স্ত্রী প্রসূত সন্তান ক্রম ও ক্ষীণকায় হয় ইত্যাদি।

১২। ১৩ বৎসরের বালিকারা সন্তান প্রসব করিয়া দুর্বল, অকর্ম্মণ্য ও নানা রোগ-গ্রস্ত হইতেছে ও সন্তানগণ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া জীবনমৃত অবস্থায় প্রাণধারণ করিতেছে তথাপি লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে “দোষের গুরুত্ব এত অধিক নয় যে তজ্জনা বালাবিবাহ একেবারে রহিত করা উচিত।” লেখক মহাশয়ের কি প্রকার গুরুত্ব জ্ঞান বলিতে পারি না কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা আর অধিক গুরুত্ব বুঝিতে পারে না।

১০ম তর্ক। বালাবিবাহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। লেখক এই তর্কের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অনায়াস যুক্তি দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন যদি কিছু দোষ থাকে তাহা হইলে যাহাতে অল্প বয়সে সন্তান না হয় এরূপ চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হইলে কি অধিকাংশ স্থলে সন্তান উৎপত্তির ব্যবধান অধিক হয়? আমরা একবার প্রশ্ন করি সমাজে দেখিতে পাই না। কি আশ্চর্য্য!

অল্প বয়সে সম্ভানগুলি উৎপন্ন হইয়া শৈশব কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া জন সংখ্যার হ্রাস করিলেও লেখক মহাশয়ের তাহাতে আপত্তি নাই। লেখক মহাশয় এ প্রকার নুশংস কথা কি করিয়া বলিলেন বুঝিতে পারি না। লেখক মহাশয় কি নিতান্তই

তর্কের জন্য তর্ক করিতেছেন? সাধারণ লোকের মতে মত দিলে কি অপমান বোধ হয়—না এ কথা সৃষ্টিছাড়া মত বলিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে বাহাদুরি প্রকাশ পায়?

আপনার একান্ত বশব্দ

শ্রীহরকালী সেন।

প্রবাস পত্র।

সিন্ধুদেশ আর বাংলাদেশ কি তফাৎ! বাংলাদেশ হাঙ্গামায়ী প্রকৃতির ফোড়ে বাস করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের কাছে সিদ্ধ কি নীরস কি শুষ্ক—যে দিকে চাও বালুময় ক্ষেত্র, চক্ষের আরাম আদবে নাই। কিন্তু মরুভূমির মধ্যেও সুভদ্র হরিভক্ষিত নেত্রগোচর হয়। সিন্ধুদেশেও স্থানে স্থানে ভূমি উর্বরা ও শস্য-শালিনী। শীকারপুরের জমি সারাল মন্দ নয়। এই মরুভূমিতে যে এত বড় বড় গাছ—ফলের গাছ, ছায়া তরু জন্মিতে পারে তা সহজে বিশ্বাস হয় না। এ সকল বৃক্ষের বয়স অধিক নয়, কুড়ি বৎসরের মধ্যে কর্তৃপক্ষবৃন্দের যত্নে এই টেনন গাছে গাছে ভরিয়া গিয়াছে। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তার কমপৌণ্ডের বাগানে আম খেজুর ও অন্যান্য ফল ফুলের গাছ ছিল। আজুর পর্যন্ত জন্মিত। জাফলতার জন্য চাল বাঁধিয়া দিতে হয়, আমরা তাহার নীচে চলিয়া বেড়াইতাম। চঃখের বিষয় যে

তাহার ফল ভক্ষণ করিতে পারিলাম না, আজুর পাকিবার আগেই আমার অনাজে বদলি হইল। অনেক সময় এইরূপ হয়, এক জায়গায় জিনিস পত্র কিনিয়া ঘরকন্যা গুছাইয়া বসিয়া নিয়াছি এমন সময় বদলির হুকুম; অমনি তল্লিতল্লা বাঁধিয়া দূরে যাইতে হইল। সর্ব্বিসের প্রারম্ভে এইরূপ অস্থির পঞ্চমে অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কলেজের কি জিলাজজ কি একরূপ একজন swell হইয়া দাঁড়াইলে আর কোন ভয় নাই, তখন একস্থানে স্থির হইয়া বসা যায়। কোন কোন জজ কিম্বা কলেজের এই রকম একটা জায়গা দখল করিয়া ঘরবাড়ী কাঁদিয়া বসেন আর সেখান হইতে নড়িতে চান না। তাই বলিয়া সিন্ধুদেশ ছাড়িতে আমার যে বড় কষ্ট হইয়াছিল তা নয়। ঐ সৃষ্টি ছাড়া বিজ্ঞান গহনে বাস করা নির্বাসন বলিলেই হইল, সিন্ধু হইতে গুজরাটে গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমরা যখন প্রথমে

সিদ্ধদেশে, যাই তখন বোম্বাই হইতে সমুদ্র পথে ব্রিটস-ইণ্ডিয়া ষ্টীমারে করিয়া করাচী-বন্দরে উপস্থিত হই, সিদ্ধু ছাড়িয়া যাইবার সময় রেলগাড়ি করিয়া উত্তরপূর্ব মুখে চলিলাম। মুলতান লাহোর হইয়া আখালা ষ্টেশন পর্যন্ত গেলাম, তথা হইতে কতক ডাকের গাড়ী কতক কাঁপানে করিয়া সিমলার পাহাড়ে চড়া গেল। সিমলা কি চমৎকাব জায়গা, তার আবহাওয়া কি চমৎকার! কিন্তু যাহা দেখিবার আশা ছিল তাহা হইল না। কাল্পনিক সিমলা ও বাস্তবিক সিমলায় অনেক তফাৎ। সিমলা হইতে হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত পর্বত-শ্রেণী দৃষ্টি গোচর হয় না। সেই দেবতাস্বা হিমায়—

পূর্বাপরো তোর্যনিধী বগাহা

স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ

কল্পনায় যথা মুদ্রিত আছে তাহার অনুরূপ ঠিক দেখিলাম না। বাড়ী ঘর দুয়ার—, মাছঘের কারিগিরিতে তাহার দেবত্ব যুচিয়া গিয়াছে। সিমলায় ৩৪ দিনের অধিক থাকিতে পারি নাই—আর বেশী সময় ছিল না। মনে কর আমি সেখানে সপরিবারে গিয়াছি—পরিবার রাখিয়া নিজখানে একাকী গমন করিতে হইবে। হাতে ঐ সময়—উহার মধ্যে বাড়ী ঠিক করা—ছুটি ফুল ঠিক করা—একটা ছেলেদের ফুল একটা বালিকাবিদ্যালয়—সব ওছাইয়া দিয়া যাইতে হইবে—ইহাতেই বৃত্তিতে পারিতেছি পাহাড়ের শোভা দর্শন করিবার আমার কত অল্প অবসর ছিল। তাড়াতাড়ি করিয়া দিল্লী চলিয়া আইলাম। দিল্লীতে

ছুই এক দিন থাকিয়া মোগল সম্রাটদের কীর্তিকলাপ যত পারিলাম দেখিয়া লইলাম, পরে রাজপুতানা লাইন দিয়া আমার গম্যস্থানে উপনীত হইলাম।

দিল্লী কুলকামিনীদের কথায় মনে করিও না যে বোম্বাইয়ের সর্বত্রই এই তুর্কিবহ অবরোধ প্রথা প্রচলিত। যে ভাগে মুসলমান আধিপত্য প্রবল অথবা মুসলমান আদর্শে সমাজ গঠিত সেই সকল প্রদেশে এই প্রথা বদ্ধমূল। যেখানে হিন্দুরা আধিপত্য প্রবল তাহা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিয়াছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ হয়। সে স্বাধীনতার দৌড় যে বড় বেশী তা নয়। ইংরাজ-সমাজে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেরূপ যেশামিশি তাহা ভূত দূর যাব না, আবার আগন্তুক দেখিয়া কুলস্ত্রী ঘোমট দিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইবে,—তেমন সঙ্কোচ, ভাবও দৃষ্ট হয় না। পর পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কথা কওয়া দূষ্য নহে। নিম্নস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলেও গৃহিণী অল্প পরিবেশন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পারসী স্ত্রীদের স্বাধীনতা ইহা অপেক্ষাও এক মাত্রা অধিক—তাহার কারণ তাহারা ইউরোপীয় সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে সমর্থক তৎপর। বিজাতীয় রীতি নীতি গ্রহণ করিতে তাহাদের বিশেষ কোন বাধা নাই। প্রথমত ভারতবাসীদের নিকট তাহারা নিজেই বিদেশী। তাহারা কয়েক শত বৎসর মাত্র এ দেশে আসিয়া বাস করিতেছে। এখানকার কোন জাতির সঙ্গে তাহারা বিবাহ হুজে মিলিত হয় নাই। এদেশের

উপর তাহাদের ততটা মমতা প্রত্যাশা করা যায় না। অতীতের বল তাহাদের উপর তত আক্রোশ করে নাই, দেশাচারের অভ্যাস-শুশ্রূষাবদ্ধন তাহাদের উপর নাই। আর এক কথা তাহাদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথা নাই সুতরাং ভিন্ন জাতিদের সঙ্গে মেলা মেলা তাহাদের পক্ষে সহজ। সাগর পার হইয়া ইংলও যাইতে হইলে জাতি যাইবার ভয়রূপ কোন দৈত্য আদিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায় না। আশ্চর্য্য এই, পারদীনের এই ক্ষুদ্র দল, ভারতবাসীদের মধ্যে এক হিন্দু বলিলেই হয়, আর জাতিভেদের নিয়ম-বহির্ভূত হইয়াও তাহারা আপনাদের স্বাভাবিক রক্ষা করিয়া চলিতেছে, বিবাহ বন্ধনে অন্য কোন জাতির সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজের তুলনায় তাহাদের সমাজ পরিবর্তন ও উন্নতিশীল বলিতে হইবে। আচার ব্যবহার, বিষয়ে ইংরাজ অহু করণে পারসীরা বিলক্ষণ মজ্জবুত। পারসীরা যখন প্রথমে ভারত-বর্ষে আসে তখন তাহারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মনোরক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। তাহাদের চালচলন দেশীয় অহু করণে ক্রমে অনেক পরিবর্তন হইল। হিন্দুদের অহুরোধে গোমাংস বর্জন করিতে হইল। মুসলমানদের যাহা 'হারাম' তাহাও তাহাদের বর্জনীয়। তাহাদের পরিচ্ছদেও ভিন্নি বদল—পুরুষদের পাগড়ী, স্ত্রীদের পাড়ী অনেকটা গুজরাটী ধরণের অন্তর্করণ। পারসীদের কথা (Motto) এই, যখন যেমন যখন তেমন। ইংরাজ-রাজ্য হইয়া অবধি তাহাদের সামাজিক নিয়ম ক্রমে ইউরোপীয় রূপে গঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। পাত্য নব্যতার বলে তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। প্রথমে বোম্বাই আদিয়া আমার চক্ষে যাহা এখন তৈরী হইয়া জীবন-স্বাধীনতা। এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বাই মধ্যে ভ্রম্যনক

প্রভেদ। কলিকাতায় ভিন্ন স্ত্রীগণ সকলেই অন্তঃপুরে রুদ্ধ, বাহিরে কোথাও একটা কুল-স্ত্রীর মুখ দেখিবার ঘো নাই। বোম্বায়ে পথে ঘাটে যেখানে যাও ভিন্ন মহিলা চ'খের সামনে পড়ে। গণ্ডার্মেন্ট-হোমের অভ্যাগতের মধ্যে—বিদ্যালয়ের ছাত্র পারিতোষিক বিতরণ-উপলক্ষে সমবেত-জনতা-সমূহে দেশীয় স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত দেখিবে। বাগান, বন্ধন, বাও বাজিবার স্থান প্রভৃতি নগরের প্রকাশ্য-স্থানে সন্ধা-বায়ু শেবনের জন্য দেশী ও ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ একত্রিত হয়, হিন্দু ও পারসী মহিলারা চিত্র বিচিত্র সাড়ীতে সজ্জিত হইয়া সেই সকল স্থানের শোভা সম্পাদন করে।

বলিতে কি, অন্তঃপুরপ্রথা আমার নিতান্ত অনিষ্টকারী-কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়, তাহাতে অবলাদের নিজের স্বধ-স্বাস্থ্যের হানি, সামাজিক হানি। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ অবরুদ্ধ ও বিকল হইলে অপারাদ্ধ কিরূপে সুশিক্ষিত, সুস্থ, দবল হইবে বল? সে দিন পুনর বালিকা বিদ্যালয়ের ইট-পত্তন কালে বঙ্গের গভর্ণর সার জেমস—তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এ সম্বন্ধে বেশ দু' এক কথা বলিয়াছিলেন—অহুবাদ না করিয়া নীচে তাহা তুলিয়া দিলাম*। যদি আমাদের দেশের স্ত্রী লোকের অবস্থা উন্নতি করিতে চাও তবে অপাতত বোম্বায়ে আদর্শ

* But the custom of secluding your women is not sanctioned by antiquity and it is a custom which not only degrades them, but reduces them to abject slavery. You cannot degrade your wives and the mothers of your children from their rightful position in this life, without degrading your race to a slavery, that is sure to act injuriously on yourselves.

গ্রহণ করিতে পার। আমাদের অনেকের ভয় হয় জীলোকেরা বাহিরে গেলে তাহাদের কোন বিপদ ঘটতে পারে, আমাদের দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হয়। তিনি বলেন আমাদের পুরুষেরাই আপনারা আপনাদেব রক্ষা করিতে অপারক, ঘবের মেয়েকে কি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে, যদি কেহ তাহাকে অপমান করে কিরূপে রক্ষা করিবে। তাহার উত্তর—এ ভয় কেবল কল্পনা মাত্র, কলে ওরূপ ঘটনা অতি বিরল। এ মুসলমান রাজা নয় যে অত্যাচার-ভয়ে কুলকামিনী-দিগকে খৃষ্ট রক্ত বাখা আবশ্যক, ইহা ইংরাজ-রাজ্য, জীলোকের সম্মাননা যাহার প্রধান ধর্ম। ওরূপ আশঙ্কা যে অমূলক তাহা আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেই দেখিতেছি। প্রথমে যখন আমি বোম্বায়ে আমার জীকে সঙ্গে করিয়া আমি তখন আমাকে কত লোকে কতপ্রকার বিভীষিকা দেখাইয়াছিল, কিন্তু কাজে দেখিতেছি সে সকল কিছুই নয়। আমবা স্বামী জীতে প্রকাশ্য ভাবে এতদিন বিদেশে ঘুরিলাম, কই আমাদের ভাগ্যে তখন কোন বিপদ ঘটে নাই। কেবল আমার উপদেশ এই যে, বাহিরে যাইতে হইলে রীতিমত ভদ্রবেশ পরিয়া যাওয়া আবশ্যক। ‘জ্ঞানানু’ পক্ষপাতীর প্রতি আমার আর একটা কথা বলিবার আছে। যদি বল আমরা আত্মরক্ষায় অক্ষম তবে নিদান-পক্ষে আমাদের কি তাহা শিক্ষা করা উচিত নহে। ইহা কি দেখিতেছ না যে জী-স্বাধীনতার প্রসাদে আমাদের সে শিক্ষা লাভ হইতে পারে? এ জাতীয় কলঙ্ক দূর হইতে পারে? ভারতমহিলা বল, বিদ্যা ও স্বাধীনতা উপার্জন করিলে তাহার আভা পুরুষ-সমাজে প্রতিকলিত হইবে ইহা ত ধরা কথা—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এ দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। শুদ্ধ তাহা নহে। আর এক দিক দিয়া দেখ, জীরক্ষণের ভার আমা-

দের হাতে পড়িলে আমাদের বল ও সাহস দায়ে পড়িয়া বৃদ্ধি হইবে কি না? আমরা নিজে অনেক সময় অকাতরে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাই—কেহ একগালে চড় মাঝিলে আর একগাল তাহাকে ফিরাইয়া দিই, কিন্তু জীর প্রতি অপমান সহ্য করে এমন কাপুরুষ অতি অল্প। জীকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে দুর্বল সেও সবল হয়—ভীকুও অভয় হয়। অবলাকে অস্ত্র-পুর-ক্লদ্ব নিতান্ত ‘অবলা’ কবিয়া রাখিলে কখনই আমাদের জাতীয়-ভীকুতা দূর হইবে না।

এদেশের হিন্দুদের আচার ব্যবহার বর্ণন করিতে গেলে সর্বাঙ্গে জাতিভেদ-প্রাধার উল্লেখ করিতে হয়। আমি যত দূর দেখিবে পাই এখানে জাতিভেদের নিয়ম কিছু কড়া কড়। এই হেতু এদেশে হিন্দুদের মধ্যে ইউরোপ-যাত্রীর দল অতি অল্প, কেহ সাহস করিয়া সাগর-পার হইলে শেষে জাত লইয়া তাহাকে মহা বিব্রত হইতে হয়। আমাদের দেশে হিন্দু-সমাজের ওদিকে অত ভীকু দৃষ্টি নাই—ইংলওফেরতা বাঙ্গালী তাহার জাতির মধ্যে সহজে প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কিন্তু কোন গুজরাটী কি মহারাষ্ট্রা-হিন্দু বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে জাতে উঠিবার জন্য মহা হাঙ্গাম বাধিয়া যায়—একটা প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়। সেদিন এইরূপ একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার নাম অবশ্য শুনিয়াছ। তিনি প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়মের সহিত বিলাত যাত্রা করিয়া অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃতে একজন কৃতবিদ্যা পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকের ক অক্ষর জানিতেন না। অথচ অল্পকাল মধ্যে ঐ দুই কঠিন ভাষার প্রথম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তাঁহার বিদ্যা বৃদ্ধি পাতিতে

ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে Oriental congress বসিয়াছিল তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি আইন শিক্ষা করেন ও বারিষ্টার হইয়া সম্মতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়াই তিনি রত্নলম্বের দেওয়ানের পদ পাইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলেই আশ্চর্য্যিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহার জন্য পণ্ডিতবরের কথা পাড়িলাম তাহা এই তিনি একটি ভীষণতার কার্য্য করিয়া অনেককে নিরুৎসাহ করিয়াছেন। তাঁহার জাতির লোকের অনুরোধে তিনি নানাদিকে গিয়া শিরোমুণ্ডণ ও পক্ষগব্য ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। পবিত্র গোদাবরীতে স্নান করিয়া ইউরোপ প্রবাসের গাপ প্রক্ষালন করিয়াছেন। ইহাতে নানাদিক হইতে নানান কথা উঠিয়াছে। তিনি যে এতদূর অবনতি স্বীকার করিবেন তাহা আমাদের মনে হয় নাই। দুই বৎসর পূর্বে তিনি ভারত প্রত্যগত হইয়া আপনার সহধর্ম্মিণীকে বিলাতে সঙ্গে লইয়া যান তাহাতে বোধ হইল জাতি ভয়ে তিনি বিচলিত হইবার পাত্র নন। এক্ষণে দেখা গেল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতভাষাদের কঠোর শাসনে নতশির হন না এমন সাহসী হিন্দু যুবা এদেশে কেহ আছে কি না সন্দেহ। প্রথমে যখন একজন গুজরাণী ব্রাহ্মণ এদেশ হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জাতিবর্গের মধ্যে মহা হলহল বাধিয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও শেষে তিনি পার পাইলেন না। তাঁর জাতি দুই দলে বিভক্ত হইল, এক দল তাঁহার পক্ষ এক দল বিপক্ষ। কিন্তু এ অনেক দিনের কথা। এক্ষণে দিখাস্য এই, ২০, ২৫ বৎসরের মধ্যে কি এ সবকিছুই উন্নতি হয় নাই? এখনো কি জাতিত্ব এমন

কঠোর শাসন যে তাহার ভয়ে আপনার মত ও বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিতে হইবে? কোন হিন্দুর কি এতটুকু সাহস নাই যে আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন, যাহা কর্তব্য জ্ঞান করেন, তাহা অকুতোভয়ে অবলম্বন করিতে পারেন—আপনার আন্তরিক বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারেন? বহুদূরপর্যন্ত একবার ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কার নৃত্য করা আপনার তাহা পাপ বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া এই কি সত্য-নিষ্ঠ সাহসী-পুরুষের কার্য্য।

জাতিভেদের ন্যায় বাল্যবিবাহ আর চিরবৈধব্য প্রথা হিন্দু সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু চিরবৈধব্য-প্রথা যে এখনকার সমস্ত হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহা নহে। এমন অনেক জাতি আছে যাহার মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্তে যাহার চলন সেই সকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা দৃষ্ট হয়। এই প্রথার আনুযায়িক এক ভয়ানক কুৎসিত নিয়ম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে—সে কি না বিধবার মস্তক মুণ্ডণ। আমাদের বিধবাদের অনেকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়—উপবাস, একসন্ধ্যা আহার, অলঙ্কার পরিহার, কিন্তু ভাগ্যক্রমে শিরোমুণ্ডণ-প্রথা তাহার উপর নাই। এদেশীয় বিধবাদিগের সে সব ত আছেই তাহার উপর এ অভ্যাসের সহ্য করিতে হয়। ভবিষ্যতে বিধবা-স্ত্রীর যে সকল জালা যন্ত্রণা অদৃষ্টে আছে পতি বিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশচ্ছেদন তাহার পূর্বাভাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা তাহা আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় এ অপেক্ষা সহমরণ অনেক গুণে ভাল ছিল, যুদ্ধের মধ্যে সতীর সকল কষ্টের অবসান হইত। শিরোমুণ্ডণ কিম্বা যুগচ্ছেদন যদি কোন রমণীর এ

জুয়ের একটা বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে বোধ করি সে বেচারী শেলোক দণ্ডই ঘাড় পাতিয়া লয়। স্ত্রীলোকের যা অমূল্য আভরণ—যে ‘রূপের নিগড় কি অমরে কিবা নরে না বাঁধে কাহারে’?—সেইটা হরণ করিতে পারিলেই নির্ভীক হওয়া গেল—আর তাহার রূপলাবনের কোন গৌরব রহিল না—তাহার সতীর প্রাতি অঘাতের কোন শঙ্কা রহিল না। এই উদ্দেশ্যেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম স্থাপিত হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিয়া আসিতেছে তাহারাও ব্রাহ্মণ-দের দেখাদেখি এই কঠোর রীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। কুদৃষ্টান্তের এমনি বল! যে দিন দেখিলাম আমার এক কায়স্থ বন্ধু, রায় বাহাদুর, আপনার পরিবারস্থ এক তরুণ-বয়স্কা বিধবা কন্যার শিরোনুওণে সজ্জন্দে অল্পমোদন করিলেন। ‘সজ্জন্দে’ বলাটাই ঠিক হইল না—জাতির অল্পরোধে বলা উচিত, কিন্তু তিনি এক জন শিক্ষিত নব্যদলের লোক হইয়া একপ স্থলে এ অল্পরোধ এড়াইতে না পারিলেন ত আর কি হইল? সমাজসংস্কার-আশা আর কোথায় রহিল!

বালা বিবাহ আর এক বিষম রীতি। শুধু বঙ্গদেশে নয় ভারতের সর্বত্রই ইহার গরলময় ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ হইতে বিদায় করিয়া যে কি স্বর্ণ সুখ লাভ করেন তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা তাহার প্রধান বৃত্তি উপার্জনের উপায় করিয়া দেওয়া—এ সকল গুরুতর কর্তব্য ছাড়িয়া দিয়া সর্বাগ্রে তাহার বিবাহ দিতেই গুরুজনরা ব্যস্ত। এদেশে বালক বালিকার বিবাহ পুত্রে পুত্রে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভাল বাসিতেন—তাঁহার সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ধুমধামে কপোত কপোতীর বিবা-

হোৎসব অনুষ্ঠান করিতেন—এইসব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। এ দেশে দশ বার বৎসরের বালক ও সাত আট বৎসরের বালিকা সচরাচর উদ্ধাঙ্গ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে দেখা যায়। এইরূপ বাল্যবিবাহ হইতে হিন্দুসমাজের যে কত অনর্থোৎপত্তি হইতেছে বলা যায় না। আমি বলিতেছি না যে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের উপযোগিতা আদর্শে নাই—কিন্তু দেখিতে গেলে অনর্থের ভাগই অধিক তাহার কোন সন্দেহ নাই। বালিকা প্র-হতি,—স্কুলের ছাত্রের উপর রহৎ পরিবার পোষণের ভার,—নিবীৰ্য্য ক্রম সম্ভান সন্ততি, শিক্ষার বাধাত, দারিদ্র্য, অকাল জন্ম, অকাল মরণ, অকাল পুরুতা, অকাল জীর্ণ দশা, এই সকল অনিষ্ট কাহার চ’খে আপুল দিয়া দেখাইয়া দিবার আবশ্যক করে না, তাহা আমাদের সমাজে জাজ্জল্যমান প্রকাশিত রহিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তি-সকল অকালে পরিপক হয় এই জন্য তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়াই আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার ত একটা সীমা প্রকৃ-তিতে নির্দিষ্ট আছে, হৃৎপোষা বালক বা-লিকার কখন বিবাহের উপযুক্ত হইতে পারে না। চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতেছি যে অমুক বয়সের পূর্বে আমা-দের শরীরের পূর্ণতা লাভ হয় না সেই পূর্ণ বয়সের পূর্বেই বিবাহ দেওয়া জী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টকারী—সে বিবাহের ফল অমঙ্গল একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

একণে কথা হইতেছে এ রোগের ঔষধ কি? এ সকল অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? মালা-বারি নামক প্রসিদ্ধ পারসী লেখক বাল-বিবাহ ও বলাৎকার-বৈধব্যা বিষয়ে এক প্যাম্ফ্লেট লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া সংবাদ-পত্রে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। এখন

প্রশ্ন এই যে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য কোন আইন করা বিধেয় কি না? অনেকে ইহার বিপক্ষে মত দিবেন সন্দেহ নাই, তাহার বলিবেন দেশাচার সংশোধনের জন্য গবর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হওয়া অনায়াস। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহার পক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। সমাজের সুখশান্তি-রক্ষণ—অনিষ্ট নিবারণ এই উদ্দেশ্যেই আইন প্রবর্তিত হয়—তাহাতে কখন যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্বতা হয় তাহার উপায়ান্তর নাই। এই স্বাধীনতা টুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই অনেক সময় আবশ্যিক হয়। আমাদের দেশের অনেক সামাজিক কুরীতির উপর আইনের হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে নহিলে তাহার উচ্ছেদসাধন কঠিন হইত। ক্রমহত্যা—নরবলি—সহমরণ প্রভৃতি এদেশের চিরন্তন প্রথা-সকল আইন দ্বারা নিবারণিত হইয়াছে, তবে এটা হয়না কেন? যে সকল বিষয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের হিতাহিত নির্ভর করে অনেক সময় আইন তাহার উপর হস্তপ্রসারণ করেন। যে রীতি অনুসারে বালক বালিকা চিরকালের জন্য অকাটা বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, যাহার উপর তাহাদের চিরজীবনের সুখদুঃখ নির্ভর, তাহাতে রাজার নিয়ম হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এমন কখনই হইতে পারে না। আইন দ্বারা বিবাহের একটা বয়স নির্দিষ্ট হওয়া কি ভুল নয়? পুরুষের ধর ১৮ বৎসর মেয়েদের ১৫ বৎসরের নীচে বিবাহ নিষেধ একরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া কি নিতান্ত অনায়াস? কেহ বলিতে পারেন একরূপ করিতে গেলে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আমাদের কোন শাস্ত্রে বাল্যবিবাহ অনুমোদন করে? পুরাতন আর্ধ্যদিগের যে চতুরাশ্রমের নিয়ম

ছিল—ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য—তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অধঃনের বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া কখন সংসারের ভার গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে পুরুষদের সম্বন্ধে তাহা কিছুই নাই। অতএব নিদান পুরুষের বিবাহের একটা বয়স সহজে ঠিক করা যাইতে পারে—মেয়েদের বয়স পবে আপনা হইতেই নিয়মিত হইবে। মালাবারি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইউনিবর্সিটি হইতে অবিবাহিত ছাত্রদের অঙ্কুলে কোন বিশেষ নিয়ম প্রচারিত হউক। তিনি আরো বলেন, যাহাদের হাতে চাকরি বিতরণের ক্ষমতা আছে তাহারা বিবাহিত পুরুষদের ছাড়িয়া অবিবাহিত কাম্যপ্রার্থীদিগকে বাছিয়া লইতে উদ্যত হউন তাহা হইলে ক্রমে বিবাহ করিবার নেশা ছুটিয়া যাইবে। এ সকল প্রস্তাব যুক্তি সম্মত বোধ হয় না। বিদ্যার চাবি, ধনের চাবি অবিবাহিতের হাতে—লক্ষী সরস্বতীর প্রসাদ আইবড়র প্রতিই মুক্তহস্তে বিতরিত হইবে আর বিদ্যার দ্বার বিবাহিত পুরুষের প্রতি বন্ধ হইবে, জী পুত্র কন্যা-ভারাক্রান্ত-পুরুষ কণ্ঠের অভাবে শুকইয়া মরিবে এ নিয়ম নিতান্ত অনায়াস। সে যাহা হউক আমাদের সমাজ সংস্কারকেরা চেষ্টা করিলে এক কুরীতি উৎপাটনে কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা মিলিয়া যদি এক সমাজ বন্ধন করিয়া অমুক বয়সের আগে বিবাহ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আপনা হইতেই ক্রমে বিবাহের নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়া আসিবে। এবিষয়ে জোয়ার কি বক্তব্য আনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেহেদি।

(পৃথিবী ধ্বংশ, সম্বন্ধে মুসলমানদের ভবিষ্যদ্বাণী)

হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই পৃথিবীর ধ্বংশ অথবা প্রলয়ের কথা বিশ্বাস করে, সকলেই বলিয়া থাকে যখন পৃথিবী পাপে ডুবু ডুবু হইবে, ধর্ম পাপের স্রোতে ভাদিয়া যাইবে, সভ্য ও ন্যায় ধরাধাম হইতে বিদূরিত হইবে, ধর্মের নামে শত শত অন্যায় কার্য অনুষ্ঠিত হইবে, মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কেবল সাময়িক উন্নতির দিকে ছুটিবে, যখন অন্যায়, অত্যাচার জন-সমাজের নিত্য-কার্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে, বিবাদ, বিসম্বাদ অরাজকতা উপস্থিত হইয়া সমাজ-বন্ধন মূলদেশ বিকলিত হইবে, তখন ভগবান এই পাপময় স্বার্থপরতাময়, বিবাদ বিসম্বাদময় পৃথিবী ধ্বংস করিয়া ধর্ম ও নীতি, ন্যায় ও ন্যায়, কৃষ্ণ ও শান্তির রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই বিশ্বাস হইতেই হিন্দুদের কল্কী অবতাব, মুসলমানদের মেহেদি, ইহুদিদের মেসোয়াহর আগমন, খৃষ্টানদের খৃষ্টের পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই জন্যই এই সকল ধর্ম সম্প্রদায় প্রলয়ের দিন গণনা করিয়া থাকে, প্রলয়ের নামে মাতিয়া উঠে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে একবার ইয়ুরোপখণ্ড এইরূপ প্রলয়ের ভয়ে আলোড়িত হইয়াছিল, নাইট ও বেরগগণ বিবাদ বিসম্বাদ পরিতাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইল, পাপাপক পাপ ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দান দক্ষিণা আরম্ভ করিল, সংসারী সংসার ছাড়িয়া উদাসীন সাজিল, উদাসীন গভীর ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইল, চারিদিকে চিন্তা, চারিদিকে বাস্তবতা, কৃষক আর হল চষে না, দৌর আর মাছ ধরে না, ব্যবসায়ী আর জবা-বচেনা, সকলের মুখেই

এক কথা, সকলের মনেই এক প্রার্থনা; চতুর্দিকে হলস্থল পড়িয়া গেল, প্রলয়, পৃথিবী ধ্বংস, এই কথা বসিয়া সকলেই শেষের সে দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, প্রেমিক প্রেমের চিন্তা ভুলিল, ভাবুক ভাবুকতা ছাড়িল, কবি ত্রাহার বীণা দূরে ফেলিয়া ভগবানের নাম ক্ষপিতে লাগিল। সেট বার্ণার্ড প্রত্যেকের হৃদয়ে চিন্তার তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া তৃতীয় ক্রেনেড ঘোষণা করিলেন, রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, উচ্চ, নীচ নির্বিশেষে সকলকেই সেরাসিনদের হস্ত হইতে জেকজেলেম নগর উদ্ধার করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কেবল খৃষ্টান সম্প্রদায়ই এই আন্দোলনবনার স্রোতে ভাসিয়াছিল, এমত নহে। মুসলমানগণও মেহেদির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারও তরবারির সাহায্যে অবিশ্বাসী-দিগকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীর রাজ্য সংস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সময় অনন্ত স্রোতে মিশিল, পৃথিবী ধ্বংস হইল না, তাহাদের হৃদয়ের ভয় বিভীষিকা হৃদয়েই মিলাইল। প্রায় দশ শত বৎসর কাল নীরবে নিস্তব্ধ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, এই দশ শত বৎসরের শেষ ভাগে আবার মুসলমানগণ ধূম ধরিয়াছে, তবে এইবার তাহার কল্লনার ছায়া দেখিয়া ভুলে নাই, মিশর দেশে মেহেদির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রথমতঃ মনুষ্যের হস্ত পরিমিত একখণ্ড মেদ মিশর গগণে দেখা দিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; মিশর-ভূমে তুমুল

সমরানল জলিয়া উঠিয়াছে, খৃষ্টান ও মুসলমান রক্তে নীল নদীর জল অছুরঞ্জিত হইতেছে। মেহেদি নামের মোহময় মন্ত্র-ধ্বনিতেই মিশরযুদ্ধ এই প্রকার ভয়ঙ্কর আ-কার ধারণ করিয়াছে, এই নামেই মুসলমান-গণ দলেদলে নমরক্কে প্রাণবিসর্জন করি-তেছে, ইরাজ সেনানী ষ্টুয়াটের মস্তক কাটিয়া বিজয়ভেরী বাজাইতেছে, বীরবর গর্ভকে হত্যা করিয়া সবলের হৃদয় শোকপূর্ণ করি-য়াছে। মেহেদি কে এবং তাহার এই গৌর-বান্বিত পদে অধিকার আছে কিনা বলিবার পূর্বে মুসলমানদের মতে পৃথিবী ধ্বংস সহস্রকে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। মুসলমান শাস্ত্রকারগণ বলেন যে বিনষ্ট পৃথিবী পুনঃ সংস্থাপিত হইবার পূর্বে অনেকগুলি চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে, তন্মধ্যে আটটি সামান্য চিহ্ন, সতেরটি বিশেষ চিহ্ন দেখা যাইবে। সামান্য চিহ্নগুলি এই—

১। মল্লবাদিগের মনে বিশ্বাস কমিয়া যাইবে।

২। ছোট লোক উচ্চপদ গ্রহণ ক-রিবে।

৩। দাসীগণ প্রভু করিবে, তাহারা তাহাদের প্রভুদিগের মাতৃস্থান অধিকার করিবে। সেইল বলেন ইহার অর্থ এই যে পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বকালে মাল্লব ইন্দ্রিয়ানজ হইবে।

৪। গোলমাল বিবাদ এবং প্রজা বি-ক্রোহ উপস্থিত হইবে।

৫। ভুরুদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবে।

৬। হুংস এবং বিবাদ এত হইবে যে মাল্লব কবরে যাইয়া শান্তিলাভ করিতে লালায়িত হইবে।

৭। ইরাক এবং সিরিয়া প্রদেশ কর-দিতে অস্বীকার করিবে।

৮। মদিনা নগরের অষ্টালিকা সমু-দায় আত্মা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

বিশেষ লক্ষণ গুলি এই—

১। পশ্চিমদিকে সূর্য্য উঠিবে।

২। ভূগর্ভ হইতে একটি অস্বাভাবিক জন্তু উৎপন্ন হইয়া মন্দির মন্দির অথবা নক্ষা পর্বতে আরোহণ করিবে, ঐ সকল স্থান হইতে ইহা দৃষ্ট হইবে না, কিন্তু অনাস্তান হইতে বেশ দেখা যাইবে, এই জন্তুর মূণ্ডের মস্তক, ববাহের চক্ষু, হস্তির কর্ণ, হরিণের শুল্ক, উষ্ট্র পক্ষীর গলা, সিংহের বক্ষ, বাঘের বিচিত্র চর্ম, বিড়া-লের পৃষ্ঠ মেঘের লেজ, উষ্ট্রের পা, গা-ধার শব্দ থাকিবে, কাহার কাহার মতে ইহা মাটি হাত উচ্চ হইবে, কেহ কেহ বলে ইহা মেঘ এবং আকাশ স্পর্শ করিবে, ইহার সঙ্গে মুষার ঐক্সজালিক যষ্টি এবং সলমানের মোহর থাকিবে। ইহার গতি শক্তি এত দ্রুত হইবে যে কেহই ইহাকে ধরিতে পা-রিবে না এবং কেহই ইহার হাত হইতে নিস্তান পাইবে না। হস্তস্তিত যষ্টি দ্বারা বিশ্বাসীদিগের মুগ স্পর্শ করিয়া তাহাদি-গকে “মুসেন” (বিশ্বাসী) বলিয়া চিহ্নিত করিবে, এবং মোহর দ্বারা “কাফের (অবিশ্বাসী) চিহ্নিত করিবে।

৩। গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবে, তাহাতে সত্তর লাখের আটলেকের বংশধর, সত্তা ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই, এবং ঈশ্বর মহান এই শব্দ ধ্বনিত করিয়া কনষ্টান্টিনোপল নগরের প্রাচীর ভগ্ন করিবে, কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য বিভাগ করিবার সময় খৃষ্টবিরোধী-দিগের আগমন সংবাদ পছছিবে সুতরাং তাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে।

৪। দম্মাল অর্থাৎ প্রধান খৃষ্ট-বিরোধী-গর্ভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সত্তর লাখের গ্রিহদি সমভিষাহারে ইম্পাহান হইতে আগমন করিবে; তাহার একটি মাত্র চক্ষু থাকিবে এবং ললাট দেশে ককর (কাফের) অক্ষর লিখিত থাকিবে, কাহারও মতে এই

অস্বাভাবিক অস্ত চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে, কাহারও মতে আরও অধিককাল থাকিবে। সেই সময় সে ধরাতল ছাড়খার করিবে। কিন্তু মক্কা অথবা মদিনা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। স্বর্গীয় দূত গণ ঐ নগর রক্ষা করিবে, অবশেষে খুই কর্তৃক ঐ অস্ত নিহত হইবে।

৫। ইহুদিগণ কনষ্টান্টিনোপল হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর, বিশ ডামস্কাস নগরের পূর্বাঙ্গিগণ উচ্চ পবল প্রাদেশের নিকটে অবতরণ করিবেন, তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবেন, বিবাহ করিবেন, তাঁহার সম্মান সম্বন্ধিত হইবে, দজালকে বধ করিবেন এবং পৃথিবীতে চল্লিশ বৎসর, কাহারও কাহারও মতে চল্লিশ বৎসর কাল থাকিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিবেন। তাঁহার অবস্থান কালে হিংসা, বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইবে, শ্রু-শাস্তি বিরাজ করিবে, মিঃ শাদুল মেঘ ভল্লুক, সখাভাবে একত্র বাস করিবে, সর্প তাহার ক্রর স্বভাব পরিভাগ করিয়া শিশুদের সহিত ক্রীড়া করিবে।

৬। ইহুদিদের সহিত মুসলমানদের সমরানল জলিয়া উঠিবে, মুসলমানগণ বৃক্ষ এবং প্রস্তরের সাহায্যে অসংখ্য ইহুদি বিনাশ করিবে, কেবল মাত্র যাহারা ঘরকন বৃক্ষের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার রক্ষা পাইবে।

৭। গোগ এবং মেগোগ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিবে, তাহারা যুদ্ধ যাত্রার সময় পান করিয়া টাইবিরিয়াস হ্রদের জল শুক করিবে, যিহু এবং তাহার সঙ্গীগণকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলিবে, অবশেষে যিহুখুষ্টের প্রার্থনায় ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের মৃত দেহে পৃথিবী পূর্ণ করিবেন, শবের দুর্গন্ধে বায়ু কলুষিত হইবে, যিহু এবং তাহার সঙ্গীদের প্রার্থনায় পক্ষী প্রেরিত হইবে, পক্ষীগণ সেই সকল মৃত দেহ লইয়া আহান করিবে,

মুসলমানগণ সাত বৎসর কাল মৃত শত্রু-গণের ধ্বংস, তীর ভুগীর সকল দগ্ধ করিতে ব্যাপৃত থাকিবে; পরিশেষে বৃষ্টির দ্বারা সমস্ত পরিষ্কারের কার্য সম্পাদিত হইবে, পৃথিবী শাস্যালিনী হইবে।

৮। ধূমে সমস্ত পৃথিবী আবৃত হইবে।

৯। চন্দ্রগ্রহণ হইবে।

১০। আরবগণ একশতাব্দীর জন্য পৌত্তলিকতা গ্রহণ করিবে এবং কেবল মাত্র অনলোকই উন্নতি লাভ করিবে।

১১। ইউফ্রেটিস নদীবক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তূপ আবিষ্কৃত হইবে, তাহার জল শুক হইবে, জলাভাবে বহুসংখ্যক লোক প্রাণ ত্যাগ করিবে।

১২। ইথিওপিয়া মক্কার মন্দির ভগ্ন করিবে।

১৩। পশু এবং অচেতন পদার্থের কথা কহিবার শক্তি জন্মিবে।

১৪। হেডজাজ অথবা কাহারও কাহারও মতে যেমেন প্রদেশে প্রকাণ্ড অগ্নি জলিয়া উঠিবে।

১৫। কাতানের একজন বংশধর তাহার গন্য দ্বারা সমুখস্থিত লোকগণু তাড়াইবে।

১৬। গিরিয়া, ডেমোমনিয়া হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রকৃত বিশ্বাসী এমন কি যাহাদের হৃদয়ে কণিকামাত্রও বিশ্বাস থাকিবে তাহাদিগকে কোরাণের সহিত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

১৭। অবশেষে মেহেদি অবতীর্ণ হইবেন।

মিশর দেশে সম্প্রতি মেহেদি অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার ইমাম মেহেদির পদে অধিকার আছে কি না জানিতে হইলে আমাদিগকে মহম্মদের পরবর্তী দ্বাদশ জন ইমামের ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচনা করিতে হইবে, কারণ কাহারও কাহারও মতে সর্বশেষ ইমাম দ্বারাই উক্ত পদ একত্রিত হইবে; মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ

ও তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে; ঐতিহাস পাঠক-
দিগের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে
মুসলমানদের মধ্যে দিয়া ও সুন্নি সম্প্র-
দায় অতীব ক্ষমতাশালী এই দুই সম্প্রদায়ের
বিবাদময়ী কাহিনীতে ভাবত ঐতিহাসের
অনেক পৃষ্ঠা-পূর্ণ। সুন্নি তুর্ক সম্প্র-
দায় ভুক্ত, তাহার মহম্মদেব জামাতা
আলির পূর্ববর্তী আবুবেকার, ওমার, ও
উসামকে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী
বলিয়া গণনা কবেন, কিন্তু শিখাবা মহম্মদ
ও আলিব মধাবর্তি তিন জন খলিফাকে
পঞ্চম খলিফা মোয়াইয়া এবং তদুত্তর জো-
ড়িদের সিংহাসনের অবৈধ অধিকারী বলিয়া
থাকেন। তাঁহাদের মতে আলি এবং তাঁহার
স্ত্রী, মহম্মদেব কন্যা ফতেমা হইতেই
ইমাম পদের প্রকৃত অধিকারী থকা যাইতে
পারে। আরব, বোগদাদ পারস্য দেশে
বিবিধ খলিফা বংশের অভ্যুদয় হইয়াছে,
তন্মধ্যে দিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত পাবসাবাদী-
গণের সহিতই আলিব নিকট সম্পর্ক। দিয়া-
সম্প্রদায়-ভুক্ত ষষ্ঠ ইমাম জাফের অতীব
পবিত্রাত্মা, জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিলেন, তা-
র গভীর জ্ঞানের জন্য বোকে তাঁহাকে
মনের সহিত তুলনা করিত। তাঁহার
ইচ্ছা “অদুই গ্রু” নামে একখানা গ্রন্থ
কর পর্যন্ত বর্জন আছে; তাহার সম্বন্ধে
কিছু কিছু জানা আছে, যে ইহুদিদিগের
সিংহাসন করিতেন—তিনি মরেন নাই, কিন্তু পুন-
রাগমন করিবেন; তাহার অবশ্যশেষেই,
তাঁহার পুত্র ইসাইল তাহার উত্তরাধিকারী
পদে বসিবেন, কিন্তু তাহার পিতার

পূর্বেই তিনি কয়েকটামাত্র শিশু সন্তান
বাপিয়া পালোক গম্ব করেন, সুতরাং
তাঁহার বৈমাত্র ভাতা মোবা কার্জম ইমাম-
পদে অভিযুক্ত হয়। মোবার পুত্র আলি
অষ্টম ইমাম, মহম্মদ বেন আলি নবম,
মহম্মদেব পুত্র আলি দশম, হাদিস, একা-
দশ, তাহার পুত্র মহম্মদ। মহম্মদ তাহার
পিতার মৃত্যুকালে কৈল শিশু ছিল; দ্বাদশ
বর্ষ বয়স্ক কালে কোথাব চলিয়া যায
কেহই বলিতে পারেনা, জনশ্রুতি এইরূপ
যে বাগদাদের নিকট সারমেনির একটি
গহবরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে
আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন, সেইস্থান হইতে
বহির্গত হইয়া পুনরায় ধার্মিক সিয়াদিগের
উপর অধিকার স্থাপন করিবেন। তিনি যে
গহবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার কোন
পরিবর্তন হয় নাই, কেবলমাত্র উপরিভাগে
একটি গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে মিলিত একটি পৌরা-
নিক গল্প আছে, যিনি হিজরা সকের ২৫৫
অব্দে সার মেনরি গরে জন্মগ্রহণ করেন,
তাঁহার জন্মের সময় তাঁহার পিতামহের
ভগিনী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নিকট
হইতে একটি কিশলয়ী শ্রুত হওয়া গিয়াছে,
তিনি বলেন যে তাঁহার জন্মের পূর্বে অ-
নেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইবার
মাতার ন্যায় তাঁহার মাতারও পূর্বে কোন
গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, জন্মের পরক্ষণেই গৃহ
স্বর্গীয় আলোকে জ্যোতির্ময় হইয়াছিল,
অনেকবার তিনি ভূনভজাহ হইয়া প্রা-
র্থনা করিতে বসিলেন, প্রার্থনার তাহার

স্বাক্ষরিত ফুটিল, তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন “দয়াময়, কৃপাময় ঈশ্বরের নামে যাহারা আপনাত্ত্ব কর্তৃত্ব স্বীকার করে তাহাদিগকে বল ও উত্তরাধিকারীত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।” নামল পক্ষীর আকারে দেহদত্তগণ আগিয়া তাহ পূর্ণ করিল। তাহার পিতা তাহাদের একজনকে বলিল “আপনারা ইহাকে লইয়া প্রতিপলন করুন, ভগবানের আদেশ হইলে সে এখানে আসিবে, ভগবানের অঙ্গুগেহে তাঁর আগমনের বাধা হইবে না।” তাহার দক্ষিণ বাহুতে এই কথাগুলি অঙ্কিত ছি। ‘সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা তাড়িত হইয়াছে, কারণ মিথ্যা অসার’। পাঁচবর্ষ বয়সে সময়ই তিনি পিতৃ-অঙ্কচ্যুত হন; কিন্তু তৎপান শৈশব কালেই তাহাকে জন দি বেপারীর মত অসাধারণ জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সময়েই তিনি ইমাম পদে বসিত হন। হিজ্রা শকের ২৬৫ আরা ২৬৬ অব্দে তিনি যে সারমেনরির গহবরে প্রবেশ করিলেন আর বাহির হইলেন না, তাহার মাতা তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিনের পর দিন গণিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি আর দেখা দিলেন না। অনেক সৌভাগ্য-শালী মুসলমান সেই নিহত স্থানে তাহার দেখা পাইয়াছে, একবার তাহার দেখার কথা এইরূপ বলিয়াছে, আমি হইজন সজিকে লইয়া একদিন সারমেনরির রাজ-প্রাসাদে গমন করিয়াছিলাম, সেখানে বাইরা একস্থানে একটি মসজিদ স্থাপন দেখিয়া পাইলাম, মসজিদ ভুলিয়াই গহবরের প্রবেশ-

দ্বার দৃষ্ট হইল, আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া একটা সমুদ্র দেখিতে পাইলাম। দেগিলাম সমুদ্র বক্ষ আবৃত করিয়া একখানা কার্পেট বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উপর একটা স্তম্ভের পুরুষ ধানে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রতি কিরিয় ও চাহিলেন না, আমার সঙ্গীত ইমামের দর্শন লাভের জন্য একে একে সমুদ্রে গমন করিল, কিন্তু তাহার ডুবিয়া গেল, আমি বহুকষ্টে তাহাদিগকে উঠাইলাম; অহুমতি না লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি ক্রক্ষেপ ও করিলেন না, আমরা নীরবে ফিরিয়া আসিলাম।” ইমামের নির্জনবাস দুই ভাগে বিভক্ত। হিজরা শকের ৩৬০ অব্দে প্রথম ভাগ শেষ হইয়াছে, সেই সময় তিনি অনেক অমাহু-বিক ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি মর্ত্যভূমিতে আগমন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিতেন, তাহাদিগের শেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আর মর্ত্য-ভূমির সহিত কোন সংঘ-রাখেন নাই, তখন হইতেই শেষ ভাগ আরম্ভ হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যখন তিনি আসিবেন তখনই এই ভাগ শেষ হইবে। প্রলয়ের সময় যে মেহেদি আসিবে সেই মেহেদি এই নির্জন গহবরে হইতেই উদ্ভিন্ন আসিবে। যখন মেহেদি আসিবে তখন যিহু আরাক হুজলে অবতীর্ণ হইবেন। মোক্কা কাসিম মলিকাপদ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের গৃহ নিরাকর করিয়া উদ্ভিন্ন হইবে।

বহিতে যেহ, প্রেম, ভালবাসা একবারে জনসমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তখন কুরেস-পরিবার প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া উঠে; তাহাদের অসুত কাহিনী লিখিবার ইহা সময় নহে, এখন বর্তমান মেহেদি সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিষ। মেহেদি সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা শুনা যায়, কেহ কেহ বলে তিনি একজন সুত্রধর, কেহ কেহ বলে তিনি বন্য-পশু-বাবসামী, এবং তজ্জন্মাই তাহার চরিত্রে অনেকটা পশু প্রকৃতি দৃষ্ট হয়; তিনি বন্য পশুদের ন্যায় দিনে নিদ্রা যান, রাত্রিতে কার্য্য করেন, এই প্রকার অনেক মত প্রচারিত আছে, রেভারেনট পিটারসন বলেন যে তিনি একজন ডো-জোলাবাসী, তাহার নাম মহম্মদ আসমত, আসমত বাল্যকালে তাহার পিতৃবোর নিকট শিক্ষানবিশি কার্য্যে নিযুক্ত হন, এক দিন তাহার পিতৃব্য তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করেন, সেই জন্য তিনি পলাইয়া খাটুমে চলিয়া যান, কিছু দিন পরে খাটুমের নিকট হুগহালি নামক গ্রামের অবৈজ-নিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তাহার ধর্ম্মের অনেক সুন্দর কথা শিক্ষা করেন, তারপর বারবরে গিয়া আর একটা বিদ্যালয়ে ছয়মাস কাল অধ্যয়ন করেন। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে তিনি কাকি সেক নরেল ডাইমের সহিত মিলিত হন, এবং তাহা দ্বারা তিনি কাকি অর্থাৎ দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রধান পদ লাভ করেন; তারপর তিনি কাকি নীল নদীর তীরবর্তী আব্দুল

দীপে গমন করেন, সেখানে তুগর্ভে একটা গর্ত খনন করিয়া অনেক দিন নির্জনবাস, উপবাস, ত্রত ও ধ্যান করেন, এই সংবাদ জন সমাজে প্রচারিত হইল, তাহার পবিত্রতার সৌরভ লোকের মন আকর্ষণ করিল। দলে দলে লোক আসিয়া শিষ্য গ্রহণ করিল, অল্পশ্রম তাহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল, দেশের প্রধান প্রধান লোক তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কুতর্থা হইল। মহম্মদ চারিজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্বের স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপায় অবলম্বন করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রীতিমত মেহেদি উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে কোরাণবর্ষিত মহাপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং বলেন-যে, তিনি জন-সমাজে, সাম্য, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি করিতে আগমন করিয়াছেন, যাহার কথায় সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস করিবে, দিগকে সমূলে বিনাশ করা তাঁর ত্রত। এই মহত্তর ত্রত সাধনে ত্যাগ করিবে অমনি তাহার করিবে। মেহেদি বলেন তাহার কার্য্য করিতে চলিশ বৎসর লাগিবে, চলিশ বৎসর তিনি কি করিবে না করিবে না বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে পর করা যে ইংরাজদের পক্ষে সহজ হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। বস্তুত এই সংস্কার যাহুর মন ধর্ম্মের নামে যেমন মাটি উঠে এমন আর কিছুতেই নয়; সুতরাং পরপারের সেই অন্ধকারময় প্রদেশের কথা

যে বলিবে তার দিকে মাছুষ মস্ত মুগ্ধের
ন্যায় ছুটিতে যায় সেই জনাই সামান্য
আস্মিত আঁধ পরাক্রান্ত, আজ মুসলমান
সমাজের নেতা। আর জগত মুসলমানদিগকে
আজ উন্নত বলুক, নির্বোধ বলুক আর

যাহাই বলুক, তাহার। সুখের ভবিষ্যৎ হইতে
আশার মোহন ধ্বনি শুনিয়াছে, তাই নাচি-
তেছে, সংসারের সুখ-বাসনা ছাড়িয়া ধর্মের
জন্য সমর-সাগরে কাঁপ দিয়াছে।

শ্রীরজনীনাত নন্দী।

সুখ দুঃখ ।

মহুযা স্বভাবত বালাকাল হইতেই সুখ-
ভোগের অভিলাস করে এবং সংসারে প্র-
বেশ না করা পর্য্যন্ত সুখের বিচিত্র কল্প-
নায় ভোর হইয়া থাকে। কিন্তু একবার
এই নিবিড় সংসারাগ্নে প্রবেশ করিয়া—
তখন চারিদিক হইতে অরণ্যকণ্টকের বিষ-
ময় আঘাত সহিতে হয় তখনি তার
সে মোহনিত্রা ভাঙ্গিয়া যায়—সে তখন
চৈতন্য পাইয়া সংসারের কণ্টক হইতে
নিজ চরণ নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত বহু-
খাণ উদ্ভাবন করিতে থাকে। কিন্তু
কুর ক্ষীণজ্যোতি ঘারা সকল
বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর
মাছুষ নিরাশ্রয় কাঁদিতে কাঁ-
পথে আসিয়া পড়ে, তবে
গমন করুক না কেন, সুখ
এ নিয়ন্তা। সকলেই চুখকের
আর ন্যায় সুখের দিকেই মুখ ফিরাইয়া
ছে। কেহ বিষয় সুখে, কেহ বা জ্ঞান-
সুখে, কেহ রণক্ষেত্রের কোলাহল ও অস্ত্রের
আর মধ্যে, কেহ বা মান মর্যাদা যশ ও
পতনের সমারোহের মধ্যে, সুখের
খানাদ কল্পনা করিয়া একই উদ্দেশ্যে অথচ
ভিন্ন ভিন্ন দিকে সকলে অগ্রসর হইতেছে।
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সুখকে ধ-
রিতে গিয়া সকলেই দুঃখের জালে জড়া-
ইয়া পড়েন—এই নাগ পাশ ছেদন করা
বড় কাহারও তাগো ঘটয়া উঠে না। যিনি

যাহাই বলুন এসংসারে সকলেরই দুঃখ হইতে
বিমুক্ত থাকিয়া সুখশান্তি লাভ করিবার
বাসনা মনোমধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সুখলাভ
করাই সকলের মনের গুট অভিপ্রায় ও জী-
বনৈব একমাত্র লক্ষ্য। লোকে যে পৃথিবীর
সকল সুখ ভাঙ্ছিল। করিয়া আত্মঘাতী হয়,
তাঁহাও সুখপরবশ হইয়া। সুখ এ জগ-
তের অধিপতি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজ-
দর্শনের বাসনা মনে আসিলেই দুঃখের
রাজত্ব ক্রেশভোগ করিতে আসিয়া পড়িতে
হয়, জ্ঞান বা বিজ্ঞানও আমাদের কাছে
ইহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না—
এমন কি উনবিংশ শতাব্দির “আধুনিক”
য়ুরোপীয় বিজ্ঞানও এবিষয়ে অলোক
দান করিয়া সুখকে আমাদের আয়ত্বাধীনে
আনিয়া দিতে পারিতেছে না। যাহা হউক
সুখ যখন সমগ্র মহুষ্যমণ্ডলীর নিয়ন্তা,
সকলেরই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন
ইহার বিষয় বুঝিবার প্রয়াস পাওয়া কোন
ক্রমেই অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।
এবিষয়ে তলাইয়া বৃষ্টিতে হইলে উঠা
কি সর্ব প্রথম তাহা জানাই কর্তব্য।
অবিচ্ছিন্ন স্বামী আনন্দের ভাবই সুখ;
আর কে না জানেন যে বাসনা-পরিভূপ্ত
করাই আনন্দ পাইবার সাধারণ উপায়।
সুখ পাওয়াই যখন জীবনের একমাত্র উ-
দ্দেশ্য, আর সেই সুখ যখন বাসনা পূর্ণ
হইলে লাভ করিতে পারিব এরূপ প্রত্যাশা

তখন আমাদের সমস্ত বাসনাগুলি পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইতে হয়। কিন্তু এদিকে আবার বাসনা নীতি-বিরুদ্ধ * হইলে তাহা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বড় অধিক থাকে না। কারণ একজন কি কয়েক জন ক্ষুদ্র মানব কি কখনও প্রকৃতির গাতর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া স্বরাজ্য স্থাপনা কারিতে পারে? প্রকৃতি অসীম বলের আধার, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইলে, আমরাই মহান বলের সংস্পর্শে মুহূর্তকালের মধ্যে পোষত হইয়া যাই। আমরা আপাতত হয়ত একটি কথা কথ্য কথিয়া নিজের স্বার্থ বন্ধন বা অপরের হিতসাধন কারিতে পারি কিন্তু তন্নিমিত্ত আমরা দিগকে এক সময়ে না এক সময়ে সহ্য কারিতে হইবে—কেহ তাহা নিবারণ কারিতে পারিবে না।

যদি কোন ব্যক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলের অবরোধ উলঙ্ঘন করিতে কৃতকায্য হয়, তাহাতে যে সে সুখী হয় একপাশে তখন দেখা যায় না। মনে করুন এক ব্যক্তি অর্থের লোভে পিতৃ হত্যা করিল, তাহাতে তাহার বাসনা তৃপ্ত জনিত কিছু সুখ পাইল বটে—কিন্তু সে সুখ, সে আনন্দ কতক্ষণের নিমিত্ত? সেই অস্বাভাবিক শোণিত ও অর্থতৃষ্ণা ক্রিষ্ণ উপশম হইবার পরই, আনন্দের পরিবর্তে দুঃখ ও অসুখতাপ আদিয়া তাহার হৃদয় আধ-কার করিবে, এবং সুখও তাহার নিকট

* “নীতি” অর্থে এখানে কোন ধর্ম পুস্তক প্রদত্ত নীতি নহে। প্রকৃতি যে পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাই নীতির পথ, প্রকৃতির যাহা নিয়ম নীতিরও তাহাই নিয়ম। আমরা এখানে সেই নীতির কথাই বলিতেছি। তবে আমরা প্রবৃত্তি থাকায় সকল সময় সদস্য ও ন্যায়তায় বৃষ্টিতে পারি না।

হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিধায় গ্রহণ করিবে। অতএব সুখের বাসনা থাকিলে আমাদেরই এক মনে জ্ঞান ও নীতির পথে বিচরণ করা আবশ্যিক, এমন কি মনের উপর একপ সতর্কতার সহিত কর্তৃত্ব করিতে হইবে, যেন কোন রূপ অনায়াস অযোগ্যতা বা বাসনা আমাদের মনের মধ্যে একেবারে আসিতে না পারে।

মনুষ্যের ক্ষমতা এত অল্প যে পরিপূর্ণ ধর্ম-নীতিসম্পন্ন বাসনা সুসিদ্ধ করাও সকল সময় সহজ নহে। কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অতি সহজেই যে বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন, একজন দরিদ্র কৃষিজীবীর সে বাসনা হয়ত কোন কালেই সিদ্ধ হইবে না। কেহ হয়ত বলিবেন ইচ্ছা থাকিলেই কার্য নিষ্পন্ন হইবে তাহার আবার কথা কি? ইংরাজীতে একটা ত কথাই রহিয়াছে যে—থানে ইচ্ছা সেইখানেই বাস্তবপথ (where there is a will there is a way)। ধর যেন কথাটি সত্য, কিন্তু ইচ্ছা বা ইচ্ছানিষ্কির পথটি যে সকল সময়ে অপকূট না হইয়া উৎকূট হইবে তুহা কে বলিল? আর পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, বাসনা বা উপায় গহিত অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ হইলে কাব্যনিক হইলেও সুখলাভ অদৃষ্টে ঘটে না। কিন্তু বাসনা উৎকূট হইলেও তাহা যে সকল সময় সফল হয় তাহাও ত নহে। মানবচক্ষু একপ দূরদর্শী নহে যে ফল লাভের বাসনায় কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া সকল সময়ে কৃতকার্য হইতে পারে। তবে যে যেক্রম লোক তাহার বাসনা গুলি সেই অমুখ্যায়ী হইলেই তাহা পূরিবার সম্যক সম্ভাবনা থাকে। একজন দরিদ্র কৃষিজীবী অবশ্য তাহার ধানাদির বিনিময়ে লুন তেল প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য সকল সহজেই পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা দিয়া আর সে কিছু অর্থেক রাজস্ব ও এক রাজকন্যা লাভ করিতে পারেন না। তবে কোন বাসনাটি পূর্ণ করা

ক্ষমতাধীন আর কোনটি বা নহে, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যের পক্ষে বড়ই কষ্টকঠিন। নেপোলিয়ান ফ্রান্সের অধিপতি হইয়া সমস্ত পৃথিবীর একাধিকর হইবার বাসনা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইলেন? আর তাহার স্থাপিত সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যই বা কত কাল স্থায়ী হইল? তাহার চক্ষের সম্মুখেই তাহার সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। সন্তোর ভিত্তির উপর যাহা নিৰ্ম্মাণ কর তাহাই স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, অসন্তোর উপর অধিত প্রাসাদ যতই দৃঢ় মনে হউক না কেন, অল্প বাতাসেই তাহা ভূমিশায়ী হইবে। অসন্তোর সকলই বিনাশ পাইয়া যাইবে কেবল সত্যই অনন্তকাল বিরাজ করিতে থাকিবে। সুতরাং সন্তোর সহিত আমাদের বাসনার কতটুকু যোগ তাহা দেখিয়াই তাহাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইতে হইবে। আর একটা কথা, বাসনা একবার মনের মধ্যে স্থান পাইলেই সেখানে তাহার সাম্রাজ্য স্থাপনে ও দৃঢ়ীকরণে বিশেষ যত্নশীল হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই মনের মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলে। একবার ভূমি একটি বাসনাকে মনোমধ্যে আশ্রয় দাও, সেটিকে হস্ত ভূমি পূর্ণ করিতে পারিলে, কিন্তু তাহার পক্ষাৎ সহস্র সহস্র উচ্চতর বাসনা আসিয়া তোমার হৃদয়ধিকার করিল—সন্তুলি হস্ত সকল হইল না, এইরূপে বাসনার তৃষ্ণা ক্রমশই তোমার বাড়িতে লাগিল, তৃষ্ণা আর কখন নিবৃত্তি হইল না। তাহাতে ভূমি সুখ না পাইয়া অনবরত দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলে। মনে কর একটি বালক এটোটা পরীক্ষায় বিশটাকা জলপানি পাওয়ার চেষ্টা করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য হইল। কৃত কার্য হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর তাহার বিশেষ বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল—সে ভাবিতে লাগিল, তাহার চেষ্টাভীত আর নাই—তাহার যাহা ইচ্ছা সে সকলই

করিতে পারে। এল, এ, পরীক্ষার সময় হস্ত প্রথম হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু হঠাৎ এমন কোন প্রতিবন্ধক ঘটিল—হস্ত তাহার শরীর অস্থ হইয়া ইচ্ছামত প্রস্তুত হইতে পারিল না—কিন্তু কোন একটা বিশেষ কারণ ঘটিল, সে এবারকার পরীক্ষা হয়ত প্রথম না হইয়া বিশেষ নীচে নামিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ইত এরূপ ঘটতে দেখা গিয়া থাকে। কেহ বলিতে পারেন যে তাহার পর বি, এ, পরীক্ষায় উচ্চ হইবার বাসনা তাহাকে কিছুকাল বল দিয়া সন্তোজ রাখিবে। আচ্ছা মনে কর বি, এ, পরীক্ষাতে সে সর্বোচ্চ আসন পাইয়া সকলের নিকট আদৃত হইয়া আপনার গৌরবে মত্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এইত গেল একটা দৃশ্য, অপর দৃশ্যটি দেখা যাউক। বি, এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া হস্ত যুবকটি মনে মনে নানা প্রকার উচ্চ আশা করিয়াছে। কিন্তু সংসারে কিছুতেই কৃতকার্য হইল না—তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে মূৰ্খ লোকেরও এ সংসারে তাহার অপেক্ষা উচ্চ আসন পাইতে লাগিল; সে পূর্বের ন্যায় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সকল বিষয়ে বিফল হইতে লাগিল। কেমন বিধির নিরীক্ষ, কৃতকার্য হইবার সমাক আশা ও সম্ভাবনা সবেও সে পদে পদে হুট খাইতে লাগিল। এরূপ হুট খাইয়া খাইয়া অকূল সংসারসমুদ্রে ব্যতীহত ভগতরীর ন্যায় কত নিরাশ হৃদয় অকূল তরঙ্গের কুপার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ইরাজীতে একটি উক্তি আছে, There is may a slip betwixt the cup and the slip (যাহার প্রলম্ব মুখে যাইবার আগে অনেক ব্যাঘাত ঘটিতে পারে)—ইহা যে ক্রিয়াক্ষমতা, তাহা বোধ হয় সকলেই ঠেকিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া

অবিচ্ছিন্ন নিশ্চিত সুখলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তবে বাসনা যাহার যত অল্প এবং সঙ্গীর্ণ তাহাকেই আমরা তত সুখী বলিয়া পরিচয় দিই। এইরূপে বর্তমানে সুখ না পাইয়া আমরা ভবিষ্যতের ক্রোড়ে শয়ান হইয়া আপনাদিগকে মায়ার জালে জড়াইতে থাকি; এবং এই উপায়ে একটির পর অপর একটি দুঃখ আসিয়া ক্রমশঃ আমাদিগকে চিরজীবনের জন্য অভিভূত করিয়া ফেলে। পাঁচ লক্ষ লোক এইরূপে ভগ্ন-স্থায় হইয়া মরিতেছে আর পাঁচটি হয়ত এসংসারে কৃতকার্য হইয়া বুক ফুলাইয়া চলিতেছে। তাহা ছাড়া যোগ্যই জীবিত থাকিবে (Fittest will survive) ফলবাদীদিগের এই যে মত—ইহাও যে নৈবনির্নয়কের (chapter of accidents) এর অন্তর্ভূত নহে তাহা কে বলিবেন? আমরা চেটীও যত্নবাহাই ষ্ট্রুতকার্য্য হই তাহা কি প্রকারে বলিতে পারি—? তাহা যে বিশ্বের কোন অজ্ঞাত নিয়মের অন্তর্ভূত নহে তাহা কে বলিবেন? আমরা যেমন হঠাৎ বলিয়া উঠি কপালে সবই হয়, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া লোকের দুঃখের মীমাংসা করি সে মীমাংসা অভাগাদের বিষয়েই খাটাইব, আর সৌভাগ্যশালীদের বিষয়ে কপাল বা অদৃষ্টের কথা না বলিয়া তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলের গৌরব করিব—এ কোন বিজ্ঞানের কথা? তাহাই যেন হইল হাজারের মধ্যে আমিই যেন সৌভাগ্যবান হইয়া জীবিতই রহিলাম কিন্তু সুখ পাইলাম একথা কে বলিবেন? এরূপত দেখা গিয়াছে, উচ্চ উচ্চ পদলাভ করিয়াও, এমন

কি রাম্যপদ লাভ করিয়াও মনুষ্যে স্তম্ভী হয় নাই। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতার দ্বারা বাসনা পূর্ণ করিয়া সুখ লাভ করা অসম্ভব; কারণ বাসনা অনন্ত কিন্তু মনুষ্যের ক্ষমতা নিত্য সঙ্গীর্ণ। যথাতি সহস্র বর্ষকাল বিময় সুখ ভোগ করিয়া পুত্রদিগকে এই কথা বলিলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত শস্য, স্বর্ণ, পদ্মপক্ষী ও রমনী এক ব্যক্তিরও তৃপ্তি সাধন করিতে সক্ষম নহে।

অনেকে হোমেন থা প্রভৃতি লোকের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া, অমনি মনে করিয়া বলেন, যে সেইরূপ ক্ষমতা পাইলেই, তাঁহার সকল বাসনা তৃপ্তি করিয়া সুখে থাকিতে পারিতেন। আমাদের দেশে এই প্রকারের অনেক প্রাচীন প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত* থাকিতে আমাদিগকে আরও সেইদিকে আকৃষ্ট করে। বিপুল ক্ষমতা পাইলেও আমাদিগকে প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে নতুন মনোকষ্ট ও অজ্ঞাতাপ আসিবেই আসিবে। মানুষ ত মানুষ বটে। ন্যায় অনার বিবেচনার জ্ঞান যখন আমাদের মনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তখন বিপুল ক্ষমতা থাকিলেও, রিপুদমন না

* প্রবাদ আছে, পূর্ব কালের আর্ঘ্য ধরিয়া অনেকে অসাধারণ ক্ষমতাবান হইলেন; এবং একালেও সেইরূপ মহাপুরুষ আছেন, এরূপও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। এরূপ অসামান্য ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা যে কোনরূপ অনায়াস করিতে পারেন এরূপত কোন ক্রমেই মনে হয় না। প্রকৃতির গতি সে নীতি বিরুদ্ধ তাহা নহে—তাঁহারা যে উপায়েই ক্ষমতা পাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক করিয়া বিশ্বজগতের বিশেষ কোন অমিষ্ট সাধন করিতে পারেন, এরূপ ত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

* তাঁহারা কতকল স্বীকার করেন তাঁহাদের নিরুপদ chapter of accidents বলিয়া কোন দৃষ্টান্ত দিতে পারি নাই, আর তাঁহাদের অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

করিলে ও ক্ষমারান না হইলে আমাদের আনন্দলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ক্ষমতাও আমাদের মনোমধ্যে একরূপ প্রবল হওয়া আবশ্যক যে কোনরূপ অন্যায় অসৎ বাসনা আসিয়া কোন উপায়ে আমাদেরকে অস্ত্রণী করিতে পারে না। মনুষ্য যত ক্ষমতা বান হইবে, ততই এই ক্ষমতা পরিচালনার পরিসর ক্ষেত্র বৃদ্ধিবে; এবং তাহা হইলেই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিবার পরিবর্তে তাহাকেই পৃথিবীর কৃতদাস হইয়া পড়িতে হইবে, সুতরাং ইহাতেও নিজে প্রথিত নাহি। বরং প্রথম প্রথম পাপ প্রবৃত্তিগুলির সহিত ধর্মের সংগ্রাম করিতে হয়, ও মনকে বিশেষ প্রকারে নিজের অধীনে আনিতে হয়, নচেৎ বাসনা আসিয়া সুখদুর্গকে একেবারে চুবমার করিয়া ভাসিয়া ফেলে। তাহাতেই বুঝা যায় যে পৃথিবীতে বাসনা থাকিলে আর কিছুতেই সুখ পাওয়ার উপায় নাই পদে পদে আমাদেরকে দুঃখই পাইতে হয়। তবে সুখভোগের বাসনা করিয়া মনুষ্যের অধিক দুঃখ পাইবার প্রয়োজন কি আছে? তবে এই মায়াবী আলোয়ার পশ্চাৎগামী হইয়া আমাদের কর্তব্য ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হই কেন? সুখ দুঃখ আমাদের নিকট একই হউক না কেন? কষ্ট বা দুঃখ যখন আমাদেরকে ধরিবেই ধরিবে, তখন অনর্থক উহাদের হইতে পলায়ন করা কিসের জন্য, আমরা প্রসন্ন চিত্তে উভয়কেই গ্ৰহণ করি না কেন? সুখেতেও বিমুগ্ধ থাকিব না, দুঃখেতেও নিরাশ বা কাতর হইব না—তাহা হইলেই আমরা উহাদের হইতে উদ্ধৃত্তি পাব। আমরা যে কার্যেই প্রবৃত্ত হই না কেন, কিছুতেই ফলের দিকে

দৃষ্টি না রাখিয়া একাগ্রচিত্তে কর্তব্য সাধনেই যত্নশীল হইব। যখন চেষ্টা ও যত্ন করিলেই ফললাভ হয় না, তখন প্রাণ পণে হিতসাধনের চেষ্টা করিয়াই সমুদ্রে থাকিব, ফল লাভ হইল কি না হইল কিছুতেই টলিব না, অটল অচলের ন্যায় কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহাকেই আমাদের জীবনের প্রবল মস্তক করিয়া উহার পদতলে সকল আশা বাসনা, অভিলাষ, গর্ব, অহঙ্কার-সমস্তই বিসর্জন দিব। বাসনা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর কিছুতেই দুঃখ দিতে পারিবে না। পৃথিবীর যাহাকে নিতা দুঃখ বল তাহা হইতে বিমুক্ত থাকিবে এবং বাসনা সুখ দুঃখ এককল কিছুই নাই বলিয়া তোমার মন একপ্রকার আনন্দে পূর্ণ থাকিবে। তাহাকে তুমি দুঃখ-মুক্ত (negative) সুখমাত্র বল, তাহাতে ক্ষতি নাই। উহা দুঃখের অভাবই হউক বা স্পষ্ট সুখই হউক আমাদের জীবনের উপর উহার পূর্ণ প্রভাব, মনুষ্য-জন্মে আনন্দ দিবার ক্ষমতা উহার অসীম। বাসনা বিনাশ করিতে পারিলে তুমি মায়া-ময় এই পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর নহ, এই পাপপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও সংসারী নহ; তখন তুমি নিজের প্রভু, সংসারের প্রভু, জগতের প্রভু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। তখন তুমি বাসনাধীনদিগের অপেক্ষাও যত্নের সহিত, হৃদয়ের সহিত তোমার সকল কর্তব্য পালন করিতে পারিবে। ইহজগতে জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া, ভবিষ্যতের সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি হৃদয়ে আশাবারি সিক্ত করিয়া, কর্তব্যের পথ দিয়া তুমি চলিয়া যাইবে। কাল তোমার পরভূতায়ুক এই ছার দেহকে অধিকার করিবে সত্য, কিন্তু তোমার অতুল-কীর্তি ও জলন্তমহিমা তোমাকে চিরকালেরই জন্যই এই পৃথিবীতে জীবন্ত রাখিবে।

শ্রী—শর্মা:।